বাংলার প্রবাদ

বাংলার প্রবাদ





পত্র ভারতী

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

প্রয়াতা কমলা রক্ষিত
—দিদা
ও
প্রয়াতা রিক্তা বসাক
—শাশুড়ি মায়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

"মানবের নৈতিক চরিত্র গঠনে, তাহাকে কর্তব্য পথে পরিচালিত করিতে সমাজ বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়াবলির সুশিক্ষা প্রদানে, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত অশন-শয়নাদি দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের নিয়ম নির্দেশে, ঝঞ্ঝা মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবের আরম্ভ ও সমাপ্তির ইঙ্গিতে, এইগুলি যে কীরূপ কার্যকরী অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আধুনিক বিদ্যামন্দিরে অধ্যয়ন না করিয়াও অতীতের তথাকথিত অশিক্ষিত, পল্লীবাসী জনসাধারণ, যে আপনাদের শান্তিপূর্ণ মধুময় জীবন প্রায় নিষ্কলঙ্কভাবে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এই সমস্ত প্রবচনমালাই তাহার একতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

—বাঙালি জীবন, মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ পল্লীবাসী মানুষের সার্বিক জীবনচর্যায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে কত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ড. সুশীলকুমার দে'র প্রবাদ সংগ্রহের অন্যতম পোষ্টা সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস, এমনকী লোকসমাজের উপাদানসমূহ সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান করেছিলেন ছাত্রসমাজকে। সংগ্রহের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর প্রস্তাব ছিল উদ্ধারকৃত সামগ্রী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে সেগুলির সংকলন করে প্রকাশ করা। আর সবশেষে তৃতীয় ধাপে সংগৃহীত উপাদানসমূহের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে দেশের আত্ম-আবিষ্কারের পথটি উন্মোচিত করে দেওয়ার ভাবনাও ছিল তাঁর মধ্যে। বাংলা প্রবাদ নিয়ে বক্ষ্যমাণ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কথিত অনুসন্ধানের এই তৃতীয় পর্যায়টিকেই গ্রহণ করেছি আমরা। কোনও সংগ্রহ-সংকলন নয়, সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে বাংলা প্রবাদের স্বরূপ ও বৈচিত্র্যের অন্বেষণই আমার আলোচনার লক্ষ্য।

ছড়া রূপকথা ব্রতকথা বিভিন্ন লোকসংগীতের সংগ্রহ-সংকলন ও আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবিষয়ে পথ নির্দেশকের কাজটি করে গিয়েছিলেন সন্তর্পণে। প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহ ও মূল্যায়নে তাঁর ভূমিকা না থাকলেও বাংলা বাগ্‌ধারা (Idioms) সংগ্রহে তিনি যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে প্রমাণ আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে রক্ষিত ১৫৯নং পাণ্ডুলিপির ৮৬-৮৯ পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে ৭৮টি বাগ্‌ধারা সেখানে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে উনিশ শতকেই বিদেশিদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহ। উইলিয়ম মর্টন, নীলরত্ন হালদার, জেমস্ লঙ্, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল ঘোষাল, দ্বারকানাথ বসু, মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুশীলকুমার দে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত যদি ধরা যায়, তা হলে বলতে হয় এঁদের উদ্যোগেই সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে শত-সহস্র বাংলা প্রবাদ। সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গেছে এমন কথা বলা যাবে না। চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, এমনকী আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যেও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার কম নয়। কোনও কোনও কবির রচনায় প্রবাদের ব্যবহার নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনাও হয়েছে। তবে বাংলা প্রবাদের স্বরূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনও অনুসন্ধান আজও হয়নি। প্রধানত সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়েই এই বই রচিত হয়েছে।

প্রবাদের আলোচনা করতে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে হয়েছে— সেখানকার লোকজনের কাছেও পেয়েছি অকুণ্ঠ সহযোগিতা। গ্রন্থটি রচনার জন্য যাঁদের সাহায্যের কথা প্রথমেই বলা প্রয়োজন তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক মানস মজুমদার. ড. দুলাল চৌধুরী ও সুনীলচন্দ্র বসাক। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিটি যত্নসহকারে দেখে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

সুমিতকুমার বসাক এই গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র।

বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, শিশু একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা,

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছি।

এছাড়া ইশতিয়াক হাসান ও ড. আসমা বেগম, পরিচয় (সানি) ও অভিনন্দন (অনি) বেঙ্গালুরুর শ্রীনিবাস ও বিন্দিয়া এবং আমার ছোট্ট দুই পুত্র শুভেচ্ছা (প্রিন্স) ও রেবন্ত (রাজ)— এদের অনুপ্রেরণা আমাকে গ্রন্থটি লিখতে সাহায্য করেছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করায় আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

বিষয়সূচি

প্রবাদ: সংজ্ঞা ও স্বরূপ

অভিধানে 'প্রবাদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে প্র√বদ্ (বিশেষ) √(বলা) + অ (ঘঞ্)—ভা। অর্থাৎ পরম্পরাগত বাক্য, জনরব, লোককথা, জনশ্রুতি।[১] যে সব প্রাজ্ঞ উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে, তা-ই প্রবাদ। প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত সরস প্রকাশ। প্রবাদ সম্পর্কে একটি মত হল:

"A proverb is a saying, usually short, that expresses a general truth about life."[২]

সাধারণত মানুষের বহুদর্শিতা বা অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই প্রবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। এক কথায় প্রবাদ হল প্রকৃষ্ট লোকবাদ। একটি জাতির আবিষ্কৃত সত্য, সামাজিক রসবোধ, ঐতিহ্যগত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধ দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত হয় যা প্রবাদের মধ্যে সর্বজনীনতা লাভ করে। বলা যায় যে, প্রবাদ হল একটি জাতির কৃষ্টির দর্পণস্বরূপ। এর মধ্যে দিয়ে স্থানীয় পরিবেশ, ধ্যানধারণা, সংস্কার, চিন্তাচেতনা, মানসিক রুচি ও ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, জীবিকা ইত্যাদি চিত্তাকর্ষকভাবে সকলের কাছে প্রকাশ পায়। তাই মানুষের জীবনে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কথায় কথায় প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়।

প্রবাদ গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি। প্রবাদ একদিকে যেমন প্রাচীন, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক। পণ্ডিত আর্চার টেলর প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন: "A proverb is a terse didactic statement that is current in tradition or, as an epigram says, the wisdom of many and the wit of one."[৩] অর্থাৎ প্রবাদ হল ঐতিহ্যাশ্রিত নীতিশিক্ষা-মূলক নিটোল

উক্তি। তিনি এও বলেন, প্রবাদে একের জ্ঞান ও বহুর বুদ্ধি নিহিত আছে। মার্কিন লোকবিজ্ঞানী অ্যালান ডান্ডেসের বিবেচনায়: "The Proverb appears to be a traditional prepositional statement consisting atleast on descriptive element, consisting of a topic and a comment."[8]

প্রবাদ হল ঐতিহ্যাশ্রিত প্রস্তাব সম্বলিত উক্তি, যার মধ্যে কমপক্ষে একটি বর্ণনামূলক উপাদান থাকবে। আর এই বর্ণনামূলক উপাদানের একটি বিষয় ও একটি মন্তব্য থাকবে। ব্যক্তিবিশেষ তাঁর জীবনের কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কোনও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য বলে থাকেন বা তাঁর মতামত প্রকাশ করে থাকেন যা দশজনে শুনে নিজেদের সমাজের মধ্যে প্রকাশ করে এবং ক্রমশ ওই বাক্য বা কথাটি প্রবাদবাক্য বলে সমাজে গৃহীত হয়। ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার ফসল হলেও কালক্রমে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে প্রবাদ সমষ্টির সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় প্রবাদের সত্য অভিজ্ঞতার ফসল।

মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলেই প্রবাদ মূলত বুদ্ধিপ্রধান সৃষ্টি। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম। প্রবাদের দুটি অর্থ— একটি আক্ষরিক, অপরটি ব্যঞ্জনার্থ। আক্ষরিক অর্থে প্রবাদের প্রয়োগ নেই বললেই চলে; ব্যঞ্জনার্থেই তার ব্যবহার সমধিক। প্রবাদের শিকড় ঐতিহ্যে প্রোথিত ও সম্প্রসারিত থাকার কারণে লোকের মুখে মুখেই এর প্রচার ও প্রসার। লোকস্মৃতি হল প্রবাদের বাহন।

প্রবাদে নারীমনের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটে। ড. সুশীলকুমার দে চমৎকার বলেছেন: "বাংলা প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব রূপ এই যে, আমাদের অধিকাংশ প্রবাদ বা চল্‌তি কথার ভাষা মেয়েদের ভাষা, যাহা এখন পুরুষদের ভাষাতেও নির্বিবাদে চলিয়া গিয়াছে। 'ফোড়ন দেওয়া', 'তেলে বেগুনে চটে [জ্বলে] ওঠা', 'মাছের তেলে মাছ ভাজা', 'মুখে খই ফোটা', 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো', 'কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো', 'শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া', 'বুকে ব'সে ভাত রান্না', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' প্রভৃতি নিতান্ত ঘরোয়া কথার মধ্যে রহিয়াছে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর অথবা ঢেঁকিশালের মেয়েলী অভিজ্ঞতার সরস প্রকাশ।... সহজ প্রকাশের ভঙ্গী ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সরসতা ইহাদিগকে লোকপ্রিয় করিয়া, ইহাদের ভাষা অন্তঃপুরের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ জনসমাজে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাই প্রবাদের শব্দগুলি বেশ জোরালো, বিশেষণগুলিও ঝাঁঝালো।"[৫]

প্রবাদ সংক্ষিপ্ত সরল সরস অভিজ্ঞতা প্রসূত উপদেশবাক্য। প্রবাদের সঙ্গে সমার্থক শব্দ হিসেবে 'প্রবচন' শব্দটি এসে যায়। প্র-বচ্ + অন (র্ম্ম) অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বচন। বহুপ্রচলিত উক্তি বা প্রবাদ বা জনশ্রুতিমূলক সুক্তি ভাষণ।* প্রবচন কিছুটা শিথিলবদ্ধ। প্রবাদবচনের সংক্ষিপ্ততম রূপ। প্রবাদ ঘন বুনোট ও জীবনসত্য প্রকাশক। খনার বচন বিশিষ্টার্থক বাক্য যা কৃষি, মানবজীবন, প্রকৃতি-নিসর্গ, ঋতু ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছিল। তাই খনা নামাঙ্কিত কোনও বিদুষী মহিলার জীবনদর্শন সম্পর্কিত মন্তব্য। বলা যায়, জনজীবনে ব্যবহৃত দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ খণ্ড অথচ সংক্ষিপ্ত ভাববাহী বাক্যগুলি প্রবাদ-প্রবচনরূপে স্বীকৃত। প্রবাদ প্রবচন একটি জাতির বা জনগোষ্ঠীর অমূল্য সম্পদ এবং তা সমাজ বা জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ রস ও লৌকিক অভিজ্ঞতার ফসল। বলা যায়, মনন ও অভিজ্ঞানের সহজ উক্তিই প্রবাদ। সহজবোধ্যতা, প্রকাশভঙ্গির সরলতা এবং অর্থবহ বক্তব্যের জন্যই দেশে দেশে প্রবাদের এত জনপ্রিয়তা।

সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদের প্রচলন দেখা যায়। প্রবাদ মূলত পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। এর সাহিত্যমূল্য কমবেশি হলেও লৌকিক মূল্য অপরিসীম। প্রবাদকে জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি বলা হয়ে থাকে। কোনও বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোকে সাধারণ একটি বা দুটি বাক্যের মাধ্যমে মোটামুটি চিরন্তন কোনও সত্যকে প্রকাশ করা হলে তাকে প্রবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। বাংলা প্রবাদগুলিতে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র রূপ দার্শনিকতায় ঋদ্ধ হয়ে প্রকাশ পায়।

যে কথা উৎকৃষ্ট এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তাই প্রবাদ। প্রবাদ বিজ্ঞজনদের মুখে মুখে তৈরি বাক্যরত্ন যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, দুঃখবেদনা, আশা-নিরাশা, ব্যঙ্গ-কটাক্ষের প্রকাশ সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় প্রবাদে বিধৃত। সেদিক থেকে প্রবাদগুলি সাহিত্যের প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় উপাদান। দৈনন্দিন জীবনধারায় প্রবাদ মানুষের উপকারী বন্ধু, সতর্ক-সংকেত। এর রসাবেদন কালজয়ী। কয়েকটি উদাহরণ:

ক. হাতি কাদায় পড়লে
মশা মাছিও লাথি মারে।

—প্রবাদটি শক্তিমানের অসহায়ত্ব অর্থে প্রচলিত।

খ. সাধলে জামাই কাঁঠাল খায় না
পগাড়ে গিয়ে কৈতি চাটে।

—পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়।

গ. যার কাজ তার চিন্তা নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।

—প্রবাদটিতে পরচর্চায় লেগে থাকা লোকেদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

ঘ. যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নয়জন।

—অর্থাৎ মিলেমিশে কাজ করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

ঙ. সবুরে মেওয়া ফলে।

—অর্থাৎ ধৈর্য ধরলে যথাসময়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবাদের পাশাপাশি কয়েকটি আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক প্রবাদের উদাহরণ তুলে ধরা হল:

ক. তামিল : অক্কাল্ ইরুক্কি বরাই তান মচ্চান উরবু।
বাংলা : মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

খ. কন্নড় : প্রমনিকাথায়েয়িআ মুখ ভাদা আনেকা দোসাগালেন মুচু থায়েদি।
বাংলা : নির্দোষ দৃষ্টি অনেক ত্রুটির আবরণ।

গ. গুজরাতি : সতি দীতায়নী মাঁ ঝাঁপে ফুটায়।
বাংলা : সকলের কাজ কারো একার কাজ নয়।

ঘ. কাশ্মীরি : Doyih attah cheh tsr wazan.
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

ঙ. ওড়িয়া : চালি ন জানি বাটর দোষ।
বাংলা : নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।

চ. English : After clouds comes fair weather.
বাংলা : দুঃখের পরে সুখ।

ছ. Italian : Absence is the enemy of love.

জ. Russian : You look for the horse you ride on.

ঝ. Latin : No one knows what he can do till he tries.

ঞ. French : Who acts not when he should, acts not when he would.

ট. German : Less advice and more hands.

ঠ. Spanish : When the rabbit has escaped comes advice.

ড. Danish : No answer is also an answer.

ঢ. Japanese: Applause is the root of abuse.

ণ. Greek : Old men are twice children.

ত Hebrew : Youth is a garland of roses, age is a crown of thrones.

থ Arabic : The barbar learns to shave on the orphan's face.

দ. Chinese : One word will not settle a bargain.

ধ. American: Big smoke, small fire.

বিভিন্নক্ষেত্রে এরকম অজস্র প্রবাদের প্রচলন দেখা যায়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা থেকে মানুষ যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা ছোট অথচ সুতীক্ষ্ণ কথার মাধ্যমে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে লোকউক্তিমূলক প্রবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার জ্ঞানী লোকদের নীতি-উপদেশমূলক কথাও প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রবাদবাক্যের ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তা লক্ষ করবার বিষয়। ছোটখাটো কোনও বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত মৌখিক বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রবাদবাক্যের অসীম কার্যকরী শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। বক্তব্য বিষয়কে

সহজেই স্পষ্ট ও পরিস্ফুট করে তোলার পক্ষে উপযুক্ত প্রবাদবাক্য মোক্ষম অস্ত্র। উপযুক্ত স্থানে প্রযুক্ত হলে প্রবাদ অনেক কথার অবতারণার হাত থেকে বক্তাকে রেহাই দেয়। শুধু তাই নয়, বক্তব্য বিষয়ও সহজেই শ্রোতার বোধ্য হয়ে ওঠে। পল্লীঅঞ্চলে অজ্ঞ নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে উপযুক্ত প্রবাদটি সঠিক প্রসঙ্গে ব্যবহার করে সুদক্ষ বক্তার মতো। যেমন:

মা নাই যার
না নাই তার।
('না' অর্থাৎ নৌকা)

প্রবাদটিতে মাতৃহীন সন্তানের দুরবস্থার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মায়ের স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে থেকে পরিবারে এবং সমাজে সন্তানের অবস্থিতি সুখাবহ। মাতৃহীন শিশুর প্রতি মায়ের মতো সুনজর কেউ-ই রাখতে পারে না—অনাদর উপেক্ষা অবহেলা তার জীবনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অমূল্য মাতৃস্নেহকে আশ্রয় করে সংসারে শিশু আপন সত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্যের চোখেও হেয় প্রতিপন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে মা যার নাই তার কোনও আশ্রয়ই নাই।

আসলে প্রবাদ-প্রবচনে কথা থাকে কম। কিন্তু ওজনে হয় অনেক ভারী। চিরন্তনত্ব গুণ সব প্রবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ব্যঞ্জনামাধুর্যের ক্ষেত্রে সব প্রবাদ-প্রবচনের মর্যাদা সমান নয়।

প্রবাদ জীবনের সত্যকে এক বা একাধিক বাক্যে প্রকাশ করে। অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় জীবনের দৈনন্দিন সত্যগুলিও প্রবাদে উঠে আসে। কারণ প্রবাদমাত্রেই মানবজীবনের অভিজ্ঞতাজাত। প্রবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে: "প্রবাদের মধ্যে যে সত্য বা তথ্য নিহিত থাকে তাহা অনেক সময়ে শুধু নিরতিশয় সহজ নয়, নিতান্ত সাধারণ ও সামান্য, যাহাকে ইংরেজিতে Platitude বলে। অনেকের ধারণা, এই বিষয়বস্তুর তুচ্ছতা বা দৈন্যের জন্যই প্রবাদে পটু ও কটু রসিকতা, ছড়ার ছন্দ, মিলের পারিপাট্য ও অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালংকারের ভঙ্গিমা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাহারা প্রবাদ বাক্যকে মস্করা, ভাঁড়ামি বা চাষাড়ে ইয়ারকির চটকদার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।... এখানে বাংলা প্রবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, এরূপ ধারণার মূলে রহিয়াছে বাঙালী জাতির ভাব, ভাষা ও রসিকতা সম্বন্ধে

জ্ঞানদৈন্য, মর্ম্মগ্রাহিতার অভাব অথবা উৎকট সূক্ষ্মাচার-বিলাসিতা। ইহা সত্য যে, প্রায় অনেক বাংলা প্রবাদেই স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক বা ঝাঁঝালো রসিকতার আমেজ আছে, কিন্তু সকল প্রবাদই যে, রঙদার হইবে এমন নয়; এবং অনুপ্রাস মিল প্রভৃতি ইহাকে লোকপ্রিয় করিলেও, এগুলি প্রবাদের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। একথাও ঠিক নয় যে, প্রবাদ-বাক্য গ্রাম্য ইতরতার সামিল। গ্রামের জীবন হইতে আসিয়াছে বলিয়া, যাহাকে bucolic wit বলে, তাহা বাংলা প্রবাদে সুস্পষ্ট; কিন্তু প্রায় সকল দেশের প্রবাদেই ইহা অল্পবিস্তর দেখা যায়, এবং যাহা গ্রামের তাহাই গ্রাম্য নয়। অবশ্য, প্রবাদের ভাষা প্রায়ই জোরালো, এবং অনেক সময় অনেক কথা খুব খোলাখুলিভাবেই বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহারের শক্তিশালী ভাষা, এবং জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। এই ধরনের ইংরেজি প্রবাদ সম্বন্ধে কোথাও লেখক বলিতেছেন 'Many of the coarsest proverbs are typically English'। বাংলা প্রবাদ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায়।'"[৭]

পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত না হলে প্রবাদের ব্যবহারিক অর্থ জানা দুষ্কর বা প্রবাদের গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়। এ প্রসঙ্গে ড. মযহারুল ইসলাম বলেছেন, "একই প্রবাদ যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহার হয় তখন তার অর্থ ভিন্নরূপ হতে পারে। সে-কারণেই পরিবেশ পরিস্থিতিগত ব্যবহারিক অর্থ না জেনে প্রবাদের প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করা একেবারেই নিরর্থক হতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রবাদটি এরকম:

ভাতারের নাই আদর
মুখে দেয় চাদর।

প্রবাদটির সাধারণ অর্থ এই যে, স্বামীর আদর না থাকলে একটি মেয়ের মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে বা ভাল পোশাক পরে লাভ নেই। এই প্রবাদটি যখন দুই ঝগড়াটে মহিলা ঝগড়ার সময় ব্যবহার করে, তখন তার অর্থ অন্যরকম দাঁড়ায়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য ঝগড়ারত এক বিবাহিত মহিলা অপর বিবাহিত মহিলাকে বলতে পারে, 'আ-হা কি আমার বড়লোকের বউরে, ভাতারের নেই আদর, মুখে দিসলো চাদর, লজ্জা করে না, জঙ্গলের বাইরে য্যান এক ঘুরে বেড়ান বাঁদর।' এখানে ব্যবহারের ফলে প্রবাদটির অর্থ, ব্যঞ্জনা

এবং গূঢ় অভিজ্ঞতা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। এখানেই প্রবাদের Contextual অর্থটি উপলব্ধি করা যায়। এর সঙ্গেই মেটাফোকলোরিক বা পরাফোকলোরগত অর্থ।'"[৯]

একই ধরনের প্রবাদবাক্য বিশ্বের অনেক জায়গায় শোনা যায় অথচ এমন কিছু প্রবাদবাক্য আছে যা নিতান্তই অঞ্চলভিত্তিক । সে সব প্রবাদ অন্য দেশ তো দূরে থাক নিজ দেশের ভিন্ন জেলাতেও খুব একটা শোনা যায় না। এ ধরনের প্রবাদকে মূলত আঞ্চলিক প্রবাদ বলে। আবার একই প্রবাদ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে প্রচলিত আছে এমনও দেখা যায়। তবে এর মধ্যে কতকগুলি একান্তভাবে আঞ্চলিক, আবার অনেক প্রবাদ আঞ্চলিক হয়েও অঞ্চলকে অতিক্রম করে গেছে। যেমন—

ক. হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙও লাথি মারে।

খ. যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না।

গ. যার শিল তারি নোড়া
তার ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

ঘ. ভাবে মজিল মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

ঙ. শকুন কাঁদে গরুর শোকে।

চ. যার বিয়ে তার খবর নেই
পাড়া-পড়শির ঘুম নেই।

ছ. মা পায় না খাতা সেলাই করার সুতো।
ছেলের পায়ে চোদ্দ সিকির জুতো।

জ. নেই কাজ তো খই ভাজ।

ঝ. যেমন বুনো ওল
তেমন বাঘা তেঁতুল।

ঞ. কি কথা বলবো সই
পান্তা ভাতে টক দই।

কোনও কোনও প্রবাদের ক্ষেত্রে একটি বক্তব্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় প্রচলিত আছে। যেমন—

চট্টগ্রাম : কুত্তার লেজ চুঁয়াত দিলে যেই ব্যাঁ য়েই ব্যাঁ।

সিলেট : কুত্তার লেঙ্গুর ঘি দিয়া মাঞ্জাইলেও সিদা হয় না।

রংপুর : কুকুরের ন্যাচত যত ত্যাল দ্যান না ক্যান ততয় ভ্যাকা হয়া থাকবে।

মানিকগঞ্জ : কুত্তার ল্যাজে ঘি মাখাইলেও সিদা অয় না।

[ভাবার্থ : জন্মগত (খারাপ) স্বভাব কিছুতেই দূর হয় না।]

সুতরাং বলা যায় যে প্রবাদ-প্রবচনগুলি আঞ্চলিকতা ও ভৌগোলিক সীমানা পার হয়েও এক ও অভিন্ন।

প্রবাদের প্রথম উৎস মানুষের মনে স্বতঃ-উৎসারিত হয়েছিল। মানুষের মনে এগুলি আপনি জন্মেছে বলেই মানুষের মুখে আপনিই প্রচলিত হয়েছে। সব প্রবাদেরই অর্থ এক হয় না, ব্যবহারিক ক্ষেত্র নিয়ে দু'রকমের অর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মযহারুল ইসলাম বলেছেন: "বিশ্বের সব দেশের প্রবাদে যেমন বাংলা প্রবাদেও তেমনই সাধারণত দু'রকমের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। একরকমের অর্থ প্রবাদটি পড়লে বা শুনলে সরাসরি উপলব্ধি করা যায়, অন্যরকমের অর্থ প্রবাদের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে। আসলে একটি যথার্থ প্রবাদকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এর কারণ এই যে, ফোকলোরের সমস্ত উপাদানের মধ্যে প্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য বোধকরি সর্বাধিক। সমাজে প্রবাদের ক্রিয়াশীলতা (Functions) প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। ক্রিয়াশীলতা বা প্রবাদের ব্যবহারিক দিকটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে পৃথকভাবে কাজ করে। এই কার্যকারিতা প্রবাদের পরিবেশ পরিস্থিতির (Contextual situation) ওপর নির্ভর করে।"[১]

মানুষের জীবনে মুখের ভাষা যেমন প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, প্রবাদও তেমনই মানুষের জীবনে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে আসছে। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, কাজ করতে করতে অজস্র প্রবাদের ব্যবহার হচ্ছে। প্রবাদের এই চিরন্তন জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "জাতির মনস্তত্ত্ব বা আচার-ব্যবহার হিসাবে প্রবাদের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে, কিন্তু নিছক

নীতি বা তত্ত্বকথা হিসাবে এই মূল্য চিরন্তন বা সর্বজনীন নয়। নীতি-বাক্যের সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য এইখানে যে, উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু চিরন্তন সত্যের নির্দ্দেশক বলিয়া ইহা চিরন্তনত্ব নয়। 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'— নৈতিক জগতের সত্য হইলেও ব্যবহারিক জগতের সত্য নয়; তেমনই 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা'— ব্যবহারিক জগতের তথ্য হইলেও, নৈতিক জগতের সত্য নয়। প্রবাদের প্রধান অনুপ্রেরক নৈতিক জ্ঞান নয়, সাংসারিক জ্ঞান; পরোক্ষ চিন্তা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যাহা নিত্য দৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত, তাহা ভূয়োদর্শন,— তাহাই যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে, এমন নয়; কিন্তু তাহাই অধিকাংশ প্রবাদের খোরাক জোগায়। প্রবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে, তাহা প্রায়ই আপেক্ষিক সত্য— তত্ত্বের সত্য নয়, তথ্যের সত্য। প্রবাদের অনেক দিক আছে, কিন্তু প্রবাদ মুখ্যত বাস্তবঘেঁষা— ইহা পথঘাটের প্রাজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।... সহজবোধ্যতা ও সহজপ্রয়োগ প্রবাদের লোকপ্রিয়তার ও লোকস্মৃতিতে লুপ্ত না হইবার একটি প্রধান কারণ।"[১০]

প্রবাদে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন:

১. জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধি, নিটোল নীতিবাক্য, লোকমনে প্রবাহিত সত্যকথন প্রকাশিত হয় প্রবাদের মধ্যে দিয়ে।
২. প্রবাদের অবয়ব হল একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, স্ফটিকীকৃত রূপ ও শব্দগুচ্ছের সমন্বয়।
৩. প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত।
৪. সাধারণত উপমা বক্রোক্তি বিরোধাভাস অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রকাশ দেখা যায় প্রবাদে।
৫. প্রবাদ লোকসাধারণের উক্তি।
৬. প্রবাদে বাক্যশৈথিল্য, অর্থবিচ্যুতি, বাক্যবিলাস বা অবান্তর কথা থাকে না।
৭. প্রবাদ সরল সরস অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশবাক্য।
৮. ভাষার চেয়ে ভাবের প্রাধান্য বেশি প্রবাদে।

প্রচলিত প্রবাদ সংকলনগুলিতে তিন ধরনের রচনা দেখা যায়: প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ। এগুলির মধ্যে কিন্তু

সংরূপগত পার্থক্য রয়েছে। **প্রবাদ** (Proverb) একটি সম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশক পূর্ণবাক্য বা পদ। প্রবাদ হচ্ছে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য বা বাক্যসমষ্টি এবং দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকথা। লোকের মুখে মুখে তৈরি, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কথা। সহজ সরল মিষ্ট ভাষায় এর প্রকাশ। জীবন গঠনে, জীবন যাপনে প্রবাদগুলির প্রয়োজন বড় বেশি উপলব্ধি হয়। যেমন:

ক. বোঝার উপর শাকের আঁটি।

খ. লেবু অনেক চটকালে তিতা হয়ে যায়।

গ. দেকা (দেখতে) না পারলে হাঁটন বেঁকা।

ঘ. যম জামাই জমিদার
তিন নয় আপনার।

ঙ. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

চ. ধর্মের জন্য দীনতা
প্রকাশ করে নম্রতা।

ছ. আসল ঘরে মশাল নাই
ঢেঁকির ঘরে বাতি।

জ. খাবার সময় মস্ত হাঁ
উলু দেবার সময় মুখে ঘা।

ঝ. শানবারের মড়া দোসর চায়।

ঞ. আয়েশ লুকোবি বয়েস লুকোবি
গাল ভাঙ্গা তোর কোথায় থুবি।

প্রবাদমূলক বাক্যাংশ (Proverbial phrase) প্রবাদের অংশমাত্র, সম্পূর্ণ বাক্য বা পদ নয়। প্রত্যেক ভাষায় এমন কতকগুলি বাগ্‌ভঙ্গি আছে যা অনেকাংশে প্রবাদেরই অনুরূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রবাদ নয়। কিন্তু বাক্যের মধ্যে যখন সেগুলি সম্পূর্ণ রূপ পায় তখন বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইংরেজিতে একে Proverbial phrase ও বাংলায় প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলা

হয়ে থাকে। প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সফলতা নির্ভর করে তার সহজ প্রকাশভঙ্গির ওপর, তার সাধারণ বুদ্ধির সরস চমৎকারিত্বের ওপর। শব্দের স্বল্পতা ও অর্থের আধিক্য প্রবাদমূলক বাক্যাংশের একটা সাধারণ লক্ষণ। এগুলি বাংলা ভাষার সনাতন বাগ্‌ধারা বা সরস বাক্যরীতির সঙ্গে মজ্জায় মজ্জায় জড়িত হয়ে গেছে। তাই তো বর্তমানে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের প্রচলন অধিকতর। প্রবাদের কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে—

কেবলমাত্র পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালির গৃহস্থালির বহু ক্ষেত্রেই প্রবাদমূলক বাক্যাংশের উপকরণ হিসেবে পাওয়া যায়— এগুলি হল বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ, যেমন—

ক. কানা-কড়ি

খ. ছাইয়ের গাদা।

গ. ছুঁচ-চালুনি।

ঘ. হাঁড়ি-সরা।

ঙ. ধান-চাল।

প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির অধিকাংশ চলতি ভাষা এবং তা মেয়েদের ভাষা, তবে এখন তা পুরুষদের ভাষাতেও নির্বিবাদে চলে গিয়েছে। প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির মধ্যে বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন দিক নেই, যা উল্লিখিত হয় না। প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির উপকরণগুলি কেবলমাত্র সেখান থেকেই সংগৃহীত হয়। যেমন—

ক পোয়াবারো।

খ. টেক্কা দেওয়া।

গ. হাতের পাঁচ।

ঘ. কিস্তিমাৎ।

তুচ্ছ নয় বা অল্প ও বৈশিষ্ট্য আছে এ সম্বন্ধে অনেক একই ধরনের প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

ক.	অগাধ জলের মাছ।

যার মনের ভাব বা অভিসন্ধি বোঝা যায় না।

খ.	অল্প জলের লঙ্কা।

ক্ষুদ্র প্রাণ, অল্প পুঁজির মানুষ।

রামায়ণ-মহাভারতের মতো বহু পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ গঠিত হয়েছে। যেমন—

ক.	কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

গভীর ঘুম, যে ঘুম সহজে ভাঙে না।

খ.	গোকুলের ষাঁড়।

স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি, অনিশ্চিতকারী ব্যক্তি, নিশ্চিত নিষ্কর্মা।

গ.	অগস্ত্যযাত্রা।

কেউ অগস্ত্যযাত্রা করেছে বললে বুঝতে হবে সে আর ফিরবে না অর্থাৎ অশুভ যাত্রা।

ঘ.	জড়ভরত।

জড়বৎ, জ্ঞানবুদ্ধিহীন।

ঙ.	হরিহর আত্মা।

অভিন্নহৃদয়, একপ্রাণ, অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

চ.	লঙ্কাকাণ্ড।

তুমুল ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি ব্যাপার।

ছ.	কুরুক্ষেত্র ব্যাপার।

কুরুক্ষেত্রের ন্যায় কলহ।

জ. ধনুকভাঙা পণ।

অতি কঠিন পণ, কঠিন প্রতিজ্ঞা।

ঝ. দাতাকর্ণ।

দানশীল ব্যক্তি, মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কর্ণের দানশীলতা থেকে এসেছে।

আবার অনেকগুলি প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের টুকরো আছে যেমন—

ক. মগের মুল্লুক।

খ. দিনে ডাকাতি।

গ. রাঘব রায়ের কাল।

ঘ. হুসেন শাহের আমল।

ঙ. ধান ভানতে মহীপালের গীত।

এ সকল ছাড়া স্থানীয় ঘটনা, প্রথা, ব্যক্তিবিশেষের কথাও অনেক প্রবাদমূলক বাক্যাংশে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। যেমন—

ক. কালীঘাটের কাঙালী।

খ. ধাপধাড়া গোবিন্দপুর।

গ বিক্রমপুরে পাঠানো।

ঘ. গৌরচন্দ্রিকা।

ঙ. হরিঘোষের গোয়াল।

চ. লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

সামাজিক ইতিহাস, সাময়িক আচার-ব্যবহার, লোকপ্রথা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেও বহু প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—

ক. কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে।

খ. ঘরমুখো বাঙালি।

গ. ভেতো বাঙালি।

ঘ. রণমুখো সেপাই।

ঙ. পুঁটি মাছের কাঙাল।

চ. গামলা চড়ে গঙ্গাপার।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বলতে বোঝায় দুই বা ততোধিক শব্দের গুচ্ছ। বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য যা বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। রূপকের ব্যবহার এগুলিতে অনেক সময় হয়ে থাকে। যেমন—

ক. অমাবস্যার চাঁদ।

খ. চিনির বলদ।

গ. আকাশ কুসুম।

ঘ. আদায় কাঁচকলা।

ঙ. আদাজল।

আবার এমন কতকগুলি উক্তি আছে যাদের **প্রবাদমূলক উপমা** বলা হয়। ইংরেজিতে একে Proverbial comparison বলা হয়। এই ধরনের প্রবাদগুলি ঐতিহ্যমূলক। যেমন—

ক. রক্তের মত লাল।

খ. কাকের মত ধূর্ত।

গ. নবদূর্বাদল শ্যাম।

ঘ. কোকিলের মত কণ্ঠ।

ঙ. দুধের মত সাদা।

খনার বচন, ডাকের বচন, ঘাঘের বচন ও প্রবাদ

বচন শব্দটির অর্থ ভাষণ, কথন, অনুশাসন, আদেশ। বচন শব্দটি দ্বারা একটি পূর্ণ বাক্যই বোঝায়। প্রবাদও প্রকৃতপক্ষে সমাজের কথন, ভাষণ বা উক্তি। প্রবাদও পূর্ণ একটি বাক্য। বাংলায় খনার বচন, ডাকের বচন, ঘাঘের বচন নামে কিছু বচন প্রচলিত আছে, তবে এগুলিকে প্রবাদ বলা যায় না, এগুলি কেবলমাত্র কারও বচন নামেই পরিচিত। কোনও কোনও লোকশ্রুতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন খনার বচন ও ডাকের বচনকে প্রবাদ বলা যায় কিনা। কারণ প্রবাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে।

সাধারণত কৃষিবিষয়ক বচনগুলি খনার বচন নামে এবং চরিত্রনীতি বিষয়ক বচনগুলি ডাকের নামে চলে। প্রবাদ যেমন ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, খনার ও ডাকের বচনও তাই। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এগুলিতে সরসতার অভাব আছে।

খনার বচন হল জলবায়ু, আবহাওয়া ও কৃষিবিষয়ক বচন। ইংরেজিতে এগুলিকে Weather Proverb বলে। অন্যান্য বচনের তুলনায় খনার বচন সবচাইতে প্রচলিত। কৃষিসংক্রান্ত খনার বচন সম্ভবত খনা নাম্নী কোনও এক বিদুষী মহিলা দ্বারা কৃত একটি সংকলন ছাড়া আর কিছু নয়। সমগ্র বাংলায় খনার বচনের এক উল্লেখযোগ্য অবদান লক্ষ করা যায়। খনার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। নিছক জনশ্রুতি নির্ভরতা। খনার বচন সম্ভবত ক্ষণের বচন। কোন ক্ষণে বা সময়ে কী চাষ করতে হয়, কোন ক্ষণে বা সময়ে জলবায়ুর অবস্থা কেমন হলে তার কী প্রভাব পড়বে এ সমস্ত বচনে তাই বলা হয়েছে।

বাস্তবে খনা বরাহের পুত্রবধূ এবং মিহিরের স্ত্রী হলে খনার বচনগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেই শোনা যেত। শুধু বাংলা, উড়িষ্যা বা অসমে শোনা যেত না। এ তিনটি অঞ্চলে জলবায়ুগত সাদৃশ্য হেতুই একই ধরনের বচন শোনা যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে ফসলের উৎপাদন, বীজবপন, ফসল কর্তন ইত্যাদি বিষয়ে খনার বচনে বিভিন্ন নির্দেশাবলী পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হলে আউশ ধানের ফলন বেশি হয়। খনার বচনে তাই বলা হয়েছে—

বৈশাখের প্রথম জলে
আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে।

খনার বচনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে। খনা গ্রহ-নক্ষত্রের শুভাশুভ গণনা করেছেন এবং তার উপর নির্ভর করে কৃষি সম্পর্কে নির্দেশাবলী দিয়েছেন। আবার আবহাওয়ার ফলাফল সম্পর্কে মাস ও ঋতুভিত্তিক বক্তব্য খনার বচনে পাওয়া যায়। যেমন—

কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা ॥
বলো চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল ॥

জমিতে ফসল ফলানোর সময়ও হিসেব করে চলতে হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাই খনার বচনে কৃষি সম্পর্কে শোনা যায়:

পটল বুনলে ফাল্গুনে
ফল বাড়ে দ্বিগুণে।
ফাল্গুনে না বুনলে ওল
শেষে হয় গণ্ডগোল।
খনা বলে চাষার পো
শরতের শেষে সরিষা রো।
সরিষা বুনে কলাই মুগ
বনে বেড়াও চাপড়ে বুক।
কার্তিকের উনো জলে
দুনো ধান খান বলে।
তামাক পোঁত গুঁড়িয়ে মাটি
বীজ পোঁত গুটি গুটি।
হাত বিশেক করি ফাঁক
আম কাঁঠাল পুতে রাখ।
গাছ গাছালি ঘন সবে না
ফল তাতে ফলবে না।
খনা বলে শুন শুন
শরতের শেষে মূলা বুন ॥

খনার বচনগুলি এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। গ্রামের লোকেরা খনার বচনকে মান্য করে চাষবাস শুরু করত। এরকম অজস্র খনার বচন প্রচলিত আছে। যেমন—

ক. ডেকে ডেকে খনা গান— রোদে ধান— ছায়ায় পান।

খ. শ্রাবণের পুরো— ভাদ্রের বারো— এর মধ্যে যত পারো।

গ. গাছ-গাছালি ঘন সবে না— গাছ হবে তো ফল হবে না।

ঘ. পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল— তার দুঃখ চিরকাল।

ঙ. হাত বিশ করি ফাঁক— আম কাঁঠাল পুতে রাখ।

চ. মঙ্গলে উষা বুধে পা— যথা ইচ্ছা তথা যা।

ছ. সাপ-শালা-জমিদার— এই তিন নয় আপনার।

জ. রান্ধি বাড়ি যেবা নারী— পুরুষের আগে খায়
ভরা কলসীর জল তার তরাসে শুকায়।

এই ধরনের অসংখ্য খনার বচন সমসাময়িক কালে অর্থাৎ আজও গ্রামাঞ্চলে শোনা যায়, এ ধরনের কিছু খনার বচন উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল। যেমন—

ক. গরু ছাগলের মুয়ে বিচ
চারা রুই রাঅন দিস।

খ. মাংসে মাংস বাড়ায়
ঘিয়ে বাড়ে বল।
দুধে লাবলা বাড়ে
শাগে বাড়ে মল ॥

গ. কেলা গাছ রুই না কাটল হাত
তাতেই কড়ি তাতেই ভাত।

ঘ. শোল চাষে মূলা,
তার অর্ধেক তুলা।

চার চাষে ধান
বিনা চাষে পান।

খনার বচনে বন্যা, মড়ক, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টির কথা যেমন আছে, তেমনই হালচালানো, গরু কেনা, বিভিন্ন ধরনের সবজি কোন মাসে কীভাবে বুনলে কীরকম ফসল হবে, ইত্যাদি বিষয়ক নানা বচন শোনা যায়। তাব কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল:

ক. পূর্ণ আষাঢ় দখিনা বয়
সেই বৎসর বন্যা হয়।

—পূর্ণ আষাঢ়ে দখিনা বাতাস বইলে সে বছর বন্যা হয়।

খ. বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

—ব্রাহ্মণ, দক্ষিণা এবং বর্ষা ও বন্যা দক্ষিণ বাতাস পেলে বন্ধ হয়।

গ. প্রথম বছরে ঈশানে বায়।
হবেই বর্ষা খনায় কয় ॥

—বর্ষার প্রারম্ভে ঈশান দিকে বাতাস বইলে বর্ষা হয়।

ঘ. চৈতে থর থর।
বৈশাখে ঝড়পাথর ॥
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে ॥

—চৈত্র মাসে গথমে পচে, বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি হয়। আর জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশে তারা দেখা গেলে বর্ষার প্রকোপ বোঝা যায়।

ঙ. মধুমাসে প্রথম দিনে হয় যেই বার।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার ॥
সোম শুক্র গুরু আর।
পৃথ্বী সয় না শস্যের ভার ॥
পাঁচ শনি পায় মীনে।
শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ॥

—চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার হলে বৃষ্টি, বুধবার হলে দুর্ভিক্ষ হয়, সোম, শুক্র, বৃহস্পতিবার হলে প্রচুর শস্য এবং চৈত্র মাসে পাঁচ শনিবার হলে মড়ক হয়।

চ. শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা।
পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা ॥
মাঠে গিয়ে আগে দিক্-নিরূপণ।
পূর্বদিক হতে হল-চালন ॥
যা কিছু আশা পূরবে সকল।
নাাই সংশয় হবে ফসল ॥

—হলচালনা প্রসঙ্গে খনার বচনে একথা বলা হয়েছে।

ছ. গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে।

—গরু কেনা প্রসঙ্গে খনার বচন।

বিভিন্ন সবজি বোনা প্রসঙ্গে খনার বচনে বলা হয়েছে:

জ. পটল বুনলে ফাল্গুনে, ফল বাড়ে দ্বিগুণে।

ঝ. খনা বলে— শুন শুন।
শরতের শেষে মূলা বুন ॥

ঞ. আখ, আদা, পুঁই, এ তিন চৈতে রুই।

ট. বৈশাখে জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রো। দাবা পাশা ফেলিয়া খো ॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। ভাদরে নিড়ায়ে করবে খাঁটি ॥
এব অন্যথা পুঁতলে হলদি। পৃথিবী বলে— তাতে ফল দি ॥

ঠ ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি। কলাই রোবি যত পারি ॥

ড. খনা বলে— চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো ॥

ঢ. খনা ডেকে বলে যান, রোদে ধান ছায়ায় পান।

ণ. খনা ডাক দিয়ে বলে। চিটা (ধানের আগড়া) দিলে নারিকেল মূলে ॥
গাছ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥

ত.   বাঁশের নাতি কলার পো। বছর বছর তুলে রো ॥

গাছের সার সম্পর্কে খনার বচনে বলা হয়েছে:

থ.   মানুষ মরে যা'তে। গাছ্না সারে তাতে ॥

খনার বচনে গৃহনির্মাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

ন.   পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে, ঘর করগে পোতা জুড়ে ॥

—-পূবদিকে হাঁস চরার পুকুব এবং উত্তর ও পশ্চিমে কলা ও বাঁশ লাগাতে হবে যাতে উত্তর দিক থেকে হাওয়া না আসে। তাতে গৃহনির্মাণ ভাল হবে। বাস্তু নির্মাণের এই চিরাচরিত নিয়ম অবশ্যই অভিজ্ঞতাপুষ্ট।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি পরামর্শ অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই পুষ্ট, খনাও এর ব্যতিক্রম নয়। আবার খনার বচনের মধ্যে দিয়ে মাস ও ঋতুভিত্তিক বক্তব্য পাওয়া যায়। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়:

ক.   পৌষে গরমি বোশেখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাঁরা ॥
খনা বলে শুন হে স্বামী।
শ্রাবণ ভাদরে হবে না পানি ॥

খ.   কি কর শ্বশুর লেখা জোকা।
আষাঢ়ে নবমী শুক্ল পখা ॥
যদি বর্ষে রিমিঝিমি।
শষ্যের ভার না সহে মেদিনী ॥

গ.   শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষো খোঁড়ো কেবলমাত্র ॥

ঘ.   মধুমাসে প্রথম দিনে হয় যেই বার।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার ॥
সোম শুক্র গুরু আব।

পৃথিবী সয় না শস্যের ভার ॥
পাঁচ শনি পায় মীনে।
শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ॥
পাঁচ রবি মাগে পায়।
ঝরায় কিংবা খরায় যায় ॥

গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার প্রথা গ্রামদেশে ভীষণভাবে প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে খনার পরামর্শ হল:

গ্রাম গর্ভিণী কুলে সুতা।
তিন দিয়ে হয় পুতা ॥
একে সুত দুয়ে সুতা ।
শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা ॥

এর অর্থ হল, যে গ্রামে রমণীর বাস সে-গ্রামের নামের সংখ্যা, গর্ভবতী-রমণীর নামের শব্দ সংখ্যা এবং প্রসবের সময় রমণী একটি ফুলের নাম করবে সে-নামের শব্দ সংখ্যা— এ তিনটি সংখ্যা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগফল ১ হয়, তা হলে সন্তান ছেলে হবে। ২ হলে সন্তান মেয়ে হবে, ০ হলে গর্ভপাত হবে। অবৈজ্ঞানিক এইসব কথা লোকাচার বলে গৃহীত হলেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তবু বাঙালি নির্দ্বিধায় তা মান্য করেছে এককালে।

ডাক কোনও মানুষের নাম নয়। ডাক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ হলেও ডাকের বচন কৃষিকর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। যেমন—

ক. যদি বর্ষে কার্তি
লইয়া যায় নাতি।
যদি বর্ষে আগনে
রাজা যায় মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষে
আগুন লাগে তুষে।
যদি বর্ষে মাঘে
আগুন লাগে বাগে।

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা জীবনচর্যা সম্পর্কিত কিছু ভাব "নির্দিষ্ট কতকগুলি বাচনভঙ্গি ও রূপচিত্রের মাধ্যমে অভিব্যাঞ্জিত করা একটি সাধারণ সংস্কার" থেকেই বচনগুলির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির গড়ে ওঠার সময়, প্রধানত প্রত্নবাংলা ভাষার যুগেই বচনগুলি স্পষ্ট কাঠামোর রূপ পায়।

খ. আমে ধান
তেঁতুলে বান।

গ. কাকের ছা, মাছের মা
ডাকে বলে— বেছে খা।

ঘ. ঘন জালা পাতলা গুছি।
লক্ষ্মী বলে আমি আছি।

ঙ. মিঠে রাঁধে, সরুয়া কাটে
সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে।

চ. উষাযোগে যেজন যায়
ডাক বলে সিদ্ধি সে পায়।

ছ. স্বামী সেবা সাঁঝের বাতি
ডাক বলে— লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

ডাক হচ্ছে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। ডাকের বচন একালে সমাজবিজ্ঞানের উপকরণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে। যেমন—

মূর্খ পুত নষ্ট স্ত্রী।
এর চাইতে কষ্ট কি ॥

আবার ডাকের বচন নীতিমূলক ভালমন্দ নির্দেশক—

পিঙ্গল আঁখি চপল মতি।
ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি ॥

— অর্থাৎ এরকম মেয়ে অলক্ষণে।

ডাকের বচন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং অনুমান নির্ভর কিছু সিদ্ধান্ত হল:

১. ডাক কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। ডাকের অর্থ হল 'বুদ্ধিবন্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ বা সূক্ত'।

২. ডাকের বচনের প্রথম শৃঙ্খলিত সংকলন 'ডাকার্ণবে' পাওয়া যায়।

৩. ডাকের বচন চারণ কবিদের দ্বারা গীত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়েছে এবং ক্রমে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এগুলির রূপান্তর ঘটেছে।

৪. ডাকের বচনের প্রধান বিষয় কৃষি হলেও বিবাহ, সামাজিক যে-কোনও অনুষ্ঠানের সময়কাল নির্ধারণ বিষয়ে বক্তব্য থাকে। এককথায় প্রাচীন বাংলা এবং অসমিয়া সমাজের সামাজিক, আর্থিক এবং বুদ্ধিগত উপলব্ধির চিত্রাঙ্কণ আছে।

৫. ডাকের বচনের মধ্যে কখনও কখনও বৌদ্ধ আচার এবং নৈতিকতার সিদ্ধান্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

৬. ডাকের বচনের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত যেমন এসেছে তেমনই আবার ইসলামের প্রভাবে আরবি ফারসি শব্দও এসেছে।

৭. সরহপা 'দোহাকোষে' তাঁর সময়কালের বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। এ-সমস্ত কুসংস্কারের সমর্থন ডাকের বচনে পাওয়া যায়।

৮. প্রবাদ অনেক বেশি যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর— জীবন-অভিজ্ঞতা পুষ্ট।

ডাকের বচন আধিভৌতিক নির্ভর— যুক্তি-বুদ্ধির ধার ধারে না।

ঊষাকালে যাত্রার শুভাশুভ প্রসঙ্গে খনা ও ডাকের বচনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়:

খনার বচন—

ক. ডাকে পাখী, না ছাড়ে বাসা।
উড়ে বসে খাবে হেন করি আশা ॥
ফিরে যায় বাসা না পায় দিশা।
খনা বলে সেই সে ঊষা ॥
উড়ে পাখী খায় না।
তখনি কেন যায় না ॥

খ মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

গ. রবি গুরু (সোম-শুক্র) মঙ্গলের ঊষা, আর সব ফাসাফুসা (তাতে না বিচারে কোন দিশা)।

ঘ. যদি পায় রাজাদেশ, তবু যায় না বৃহস্পতির শেষ।

—বৃহস্পতিবার বারবেলায় যাত্রা নিষেধ।

ঙ. আগিয়ে দিয়ে দখিন পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।
—যাত্রার সময় দক্ষিণ পা আগে বাড়ালে যাত্রা শুভ হয়।

ডাকের বচন—

ক. ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী
দহি লে' বলে গোয়ালী।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি।

খ. বাম-শেয়ালী যাত্রা।

এগুলি লোকসংস্কার-কেন্দ্রিক বচন। যুক্তি-বুদ্ধি এক্ষেত্রে হার মানে।

বাংলাদেশে ঘাঘের বচনের প্রচলন দেখা যায়। খনার মতো ঘাঘ সম্পর্কে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের সঙ্গে জড়িয়ে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। ঘাঘের রচনা বলে পরিচিত অসংখ্য কৃষিবিষয়ক প্রবাদ ভারতের হিন্দিভাষী অঞ্চলে যেমন উত্তর বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে শব্দগত সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রচলিত। ঘাঘের

বচনকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. কৃষি সংক্রান্ত প্রবাদ।

খ. কাল নির্দেশ সংক্রান্ত প্রবাদ।

গ. পরিমাপ সংক্রান্ত প্রবাদ।

ঘ. পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবাদ।

ঙ. বর্ষণ সংক্রান্ত প্রবাদ।

চ. সেচন সংক্রান্ত প্রবাদ।

ছ. উর্বরতা সংক্রান্ত প্রবাদ।

এইসব কৃষি সংক্রান্ত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মূল বক্তব্য বিষয় হল:

১. কৃষিই সর্বশ্রেষ্ঠ পেশা।

২. স্বহস্তে কৃষিকাজ করা শ্রেয়।

৩. ভাল চাষের জন্য গভীর চাষ ও সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

৪. কৃষিজমির অবস্থান কীরূপ হওয়া উচিত।

৫. শ্রেষ্ঠ কৃষকের লক্ষণ কী।

৬. কী বার বীজ বপন ও ফসল কাটার জন্য উত্তম।

৭. ফসল বোনার যথার্থ মৌসুম।

৮. অসময়ের ফসল বপনের ফলাফল।

৯. ধান চাষের মৌসুম।

১০. অসময়ে ধান চাষের ফলাফল।

১১. বৃষ্টিপাত ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও সময়, রংধনু, চন্দ্রমণ্ডল, মেঘ, ব্যাঙের ডাক।

১২. আবহাওয়া, জীবজন্তু ও ফসলের উপর শীত, উষ্ণ, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ফলাফল।

১৩. কোন ফসল কতদূরে রোপণ করতে হয়, কোন ফসল ঘন ভাল, কোন ফসল পাতলা ভাল।

১৪. কোন ফসল কখন কতদিনে পাকে।

১৫. কোন ফসলে কীরূপ বারিপাত, সেচ, রোদ, বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা।

১৬. ফসলে সারের গুরুত্ব— গোবর সার ও অন্যান্য সার, কোন ফসলে কীরূপ সারের প্রয়োজনীয়তা।

১৭. গবাদি পশুর খাদ্য।

১৮. গবাদি পশুর গুরুত্ব, লক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয়।

১৯. জমিতে চাষ, মই, নিড়ানি, সার ও সেচের প্রয়োজনীয়তা।"[১১]

খনা ও ঘাঘের বচনের মধ্যে কোথাও অনেকটাই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অংশবিশেষের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

ঘাঘ ও খনার বচনের মধ্যে বহু সাদৃশ্য থাকলেও ডাক, ঘাঘ ও খনার বচনকে প্রবাদ হিসেবে প্রবাদমালার অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেছে। তবু বলা যায় বিশেষ করে খনার বচনগুলি আজও প্রবাদের মতো সমাজের মধ্যে লোকের মুখেমুখে প্রচলিত আছে; তবে প্রবাদ না বলে বচন হিসেবেই এগুলি পরিচিতি লাভ করেছে। ডাক ও খনার বচনে বাঙালির 'আধিভৌতিক মঙ্গল বুদ্ধি'র পরিচয় শুধু নেই, সামাজিক শুভাশুভবোধ, মঙ্গল-অমঙ্গলের নির্দেশাবলী জীবন-অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। আর প্রবাদে মানবজীবনের অসংগতিগুলিই একটু তির্যক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। এদিক থেকে প্রবাদ হল মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার ন্যায়দণ্ড স্বরূপ।

আমাদের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে এখানে ভারতীয় প্রবাদচর্চার সংক্ষিপ্ত চিত্রপট তুলে ধরা অসংগত হবে না।

ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চা খুব প্রাচীন না হলেও, গুণগত দিক থেকে বিচার করলে খুব নগণ্যও নয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৭৮) প্রতিষ্ঠা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম মর্টন নামে একজন পাদরি এক প্রবাদমালা সংগ্রহ প্রকাশ করে প্রবাদ চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন বাংলাদেশে। তাঁর গ্রন্থের নাম: "দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ" (A collection of Proverbs, Bengali and Sanskrit, with their translation and application in English.) প্রকাশকাল ১৮৩২। অবশ্য নীলরত্ন শর্মা (হালদার) 'কবিতা রত্নাকর' নামে সংস্কৃত প্রবাদমালার একটি সংকলন মর্টনের আগেই প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলা প্রবাদ সংকলনের ক্ষেত্রে যাঁর নাম এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তিনি

হলেন রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্। তাঁর গ্রন্থের নাম: 'প্রবাদমালা' বা 'স্বদেশীয়দের জীবন ও অনুভূতি সম্পৃক্ত দুই হাজার প্রবাদ' (Prabadmala or Two thousand Bengali Proverbs illustrating native life and feelings)। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা থেকে। 'Bengali Proverb' (১৮৫১) নামে তিনি আরও পাঁচ হাজার মেয়েলি প্রবাদ বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। লঙের অন্যতম কালজয়ী সংগ্রহ হল 'Oriental Proverbs in relation to folklore and Sociology with suggestions for their collections, interpretation and publication.' এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে লঙের 'Eastern Proverbs and Emblems' প্রকাশিত হয়।

সমসাময়িককালে বাংলা প্রবাদ সংগ্রহে পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার ক্যাপ্টেন টি এইচ লেউইন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন "Hill Proverbs of the inhabitants of Chittagong Hill Tracts." কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জে ডি এন্ডারসন নামে একজন সিভিলিয়ান চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ৩৫২টি প্রবাদ সংকলন করে "Some Chittagong Proverbs" নামে প্রকাশ করেছিলেন।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে) উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা ১২৯৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে কানাইলাল ঘোষালের 'প্রবাদ সংগ্রহ' নামে প্রবাদের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এরপর প্রবোধচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্গীয় প্রবচনাবলী' নামে একটি সুলিখিত 'প্রবাদসংগ্রহ' 'উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে (২য় খণ্ড/৮ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ বসু লিখিত 'প্রবাদ পুস্তক'টি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'প্রবাদতত্ত্ব' ও 'প্রবাদমালা' এই দুই ভাগে প্রকাশিত হয়েছে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩০১ সালের 'প্রকৃতি' পত্রিকায় এবং ১৩০১-১০ বঙ্গাব্দের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামের বেশ কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে (১৫ আগস্ট ১৯০৯) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 'প্রবাদ

প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রচলিত বাংলা প্রবাদের কয়েকটি নির্বাচিত প্রবাদের ইতিহাস তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে কুমুদবন্ধু রায়গুপ্ত 'পল্লীপ্রবাদ' এবং শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী 'পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ঃপ্রবাদ প্রবচন' নামে দুটি প্রবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে একটি পত্রিকায় বিমলাচরণ লাহা 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় তারাশঙ্কর তর্করত্ন 'রংপুরের প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রজবআলী খাঁ চৌধুরী 'প্রবাদ রত্নাকর' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মোট ২৫১৬টি প্রবাদ এতে সংকলিত হয়েছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। ড. সুকুমার সেনও ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'বাঙলায় নারীর ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় লেখেন। প্রবন্ধটিতে সুকুমার সেন বাংলার প্রবাদের বিশ্লেষণ করে নারীর ভাষার মূল্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া সৌরভ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রবাদ সংকলন ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৫২ বঙ্গাব্দে বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশ করেছেন ড. সুশীলকুমার দে। তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' শীর্ষক গ্রন্থটিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সঙ্গে ৯১০০ প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। ১৩৬১ বঙ্গাব্দে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থটি এই ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) তিনি প্রবাদ সংকলন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে বাংলা প্রবাদ-চর্চাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। এই কালসীমার মধ্যে আরও কয়েকটি প্রবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে সত্যরঞ্জন সেনের 'প্রবাদ রত্নাকর' নামে গ্রন্থে ৬৪৩২টি প্রবাদ সংকলিত হয়। এই গ্রন্থে প্রবাদের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন 'প্রবাদবচন' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯৩৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে ড. এনামুল হক 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ' নামক গ্রন্থে চট্টগ্রামের কয়েকটি আঞ্চলিক প্রবাদ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা

করেছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত মোহম্মদ হানীফ পাঠান সংকলিত 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি' গ্রন্থটি বাংলাদেশের প্রবাদ-চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শশীমোহন চক্রবর্তী 'শ্রীহট্টিয় প্রবাদ-প্রবচন' নামে একটি প্রবাদ সংকলন কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ড. দুলাল চৌধুরী সংকলিত 'চাকমা প্রবাদ' গ্রন্থটি গোষ্ঠীগত আদিবাসী-প্রবাদ সংকলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থ।[১২]

বাংলা প্রবাদের উদ্ভব, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও প্রচলিত বচনগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের মধ্য দিয়েই তার সংজ্ঞা নির্ধারণ ও স্বরূপ উন্মোচন সম্ভব বলে আমাদের ধারণা।

তথ্যসূত্র

১. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন: বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৩৭, পৃ. ১৪১৪

২. Martin H. Manser. Proverbs, New Delhi, 2005, p v

৩. Taylor, Archer: SDFML, edited by Maria Leach, New York, 1984, p. 902

৪. Dundes, Alan 'On the Structure of the Proverb, 'The Wisdom of Many,' Edt by Mieder and Alan Dundes, New York, 1981, p. 601

৫. দে, সুশীলকুমার: বাংলা প্রবাদ ১৪০১, পৃ. ২৬

৬ দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন: বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৩৭, পৃ. ১৪১৩

৭. দে, সুশীলকুমার. বাংলা প্রবাদ, ১৯৮৫, পৃ. ১৮

৮ ইসলাম, মযহারুল· ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ৪৫০-৫১

৯ ঐ, পৃ ৪৫০

১০. দে, সুশীলকুমার: বাংলা প্রবাদ, ১৯৮৫ পৃ. ১৮

১১ হাফিজ, আবদুল সম্পাদিত: লৌকিক বাংলা, ঢাকা, পৃ ৭২-৭৩

১২ চৌধুরী, দুলাল. বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাস (প্রবন্ধ), তারাপদ সাঁতরা সম্পাদিত বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার বিকাশ, পৃ. ১-৭

বাংলা প্রবাদের বিষয়বৈচিত্র্য

ব্যক্তির নানান অভিলাষ বা ইচ্ছা, সংসার-পরিবার-পরিবেশ, দেশ-সমাজ-জগৎ, কাল-কৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে সবেরই এক অন্যতম প্রকাশমাধ্যম হল প্রবাদ। বিষয়বৈচিত্র্যে প্রবাদ অনন্য। প্রবাদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—সাহিত্যিক প্রবাদ ও লৌকিক প্রবাদ। লৌকিক প্রবাদই বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে নিয়েছে। অধিকাংশ সাহিত্যিক প্রবাদের উদ্ভব মৌখিকভাবে এবং প্রথম প্রচার লাভ করে মুখে মুখে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রবাদের বহমানতা বিদ্যমান। কয়েকটি সাহিত্যিক প্রবাদের উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

১. অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী।

—প্রবাদটি চর্যাপদ থেকে উদ্ধৃত। হরিণের মাংসের লোভেই লোক হরিণকে বধ করে। তাই বলা হয়েছে হরিণ নিজের মাংসের জন্য নিজের শত্রুস্বরূপ।

২. বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে উদ্ধৃত সাহিত্যিক প্রবাদের উদাহরণ। অর্থাৎ ছোট হয়ে বড় জিনিসের প্রতি লোভ। এই প্রবাদটিরই লৌকিক রূপ হল: *বামন হয়ে চাঁদে হাত*। লৌকিক প্রবাদটি একটু দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং শিল্পসম্মতভাষায় লৌকিক প্রবাদটি সাহিত্যিক প্রবাদের রূপ লাভ করেছে।

৩. আমি ত ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি।

—দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে প্রবাদটি ব্যবহৃত। প্রবাদটির অর্থ অপদার্থ ব্যক্তি যাকে হীন বা অপ্রীতিকর কাজে লাগানো হয়।

৪. মেয়ে ত নয়, আগুনের ফুলকি।

—অমৃতলাল বসুর 'নবযৌবন' নাটকে ব্যবহৃত। প্রবাদটি মুখরা বা দস্যি মেয়ে প্রসঙ্গে বলা হয়।

৫. ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না।

—শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' উপন্যাসে ব্যবহৃত।

কোনও বিরূপ কথা বা কুকথা একবার বলে ফেললে তাকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

৬. নেংটির আবার বখেয়া (সেলাইয়ের একপ্রকার ফোঁড়) সেলাই।

অর্থাৎ দরিদ্রের বিলাসিতা সাজে না। প্রবাদটি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ব্যবহৃত।

লৌকিক প্রবাদই সর্বত্র প্রচলিত। লৌকিক প্রবাদগুলিকে বিষয় অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। এ আলোচনায় অবশ্য প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের সাহায্যও নেওয়া হবে। কেননা, এগুলি প্রবাদসাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

১. দেবদেবী-বিষয়ক
২. পৌরাণিক চরিত্র-বিষয়ক
৩. ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারী চরিত্র-সম্পর্কিত
৪. সামাজিক চরিত্র বা সমাজজীবন-বিষয়ক
৫. পারিবারিক সম্পর্ক-আশ্রিত
৬. মানবদেহ সম্পর্কিত
৭. আচার-আচরণ-অভ্যাসমূলক
৮. গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সম্পর্কিত
৯. নিসর্গপ্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদ

ক. উদ্ভিদ ও লতাপাতা সংক্রান্ত

খ. আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত

১০. কৃষিকর্ম সংক্রান্ত

১১. খাদ্যবস্তু-বিষয়ক

১২. পশুপাখি-কীটপতঙ্গ-প্রাণী-বিষয়ক

১৩. বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক

১৪. বিলাসোপকরণসম্পর্কিত

১৫. প্রেম-বিষয়ক

১৬. স্থাননাম-বিষয়ক

১৭. লোককাহিনীমূলক

১৮. লোকশিক্ষা-উপদেশ ও প্রজ্ঞামূলক

১৯. লোকসিদ্ধান্তমূলক

২০. লোকসাংবাদিকতা-বিষয়ক

২১. বিবিধ বিষয়ক

॥ এক ॥

দেবদেবী-বিষয়ক

আরাধ্য দেবদেবী সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। আর তার ফলেই পৌরাণিক দেবদেবী চরিত্রের স্বভাব ও তাঁদের পরিচয়ের যে বিশেষত্বগুলি রয়েছে সে সম্পর্কে বহু প্রবাদ শোনা যায়। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে যেসব দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় কিংবা যেসব লৌকিক দেবদেবী অধিক পূজিত হন তাঁদের নিয়েই বেশির ভাগ প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত দেবদেবী বিষয়ক প্রবাদের মধ্যে পল্লীসমাজের মানুষের পৌরাণিক জ্ঞান যত না রয়েছে তার থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাদের কল্পনা। ফলে লোকমানসের ধারণাপ্রসূত এই শ্রেণীর প্রবাদগুলি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ, গুণ, পূজা-পদ্ধতি, পূজার ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ প্রবাদের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। দেবদেবী সম্পর্কিত এই ধরনের প্রবাদগুলি মানুষের

কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের পূজিত দেবদেবীর সংখ্যা সীমাহীন। তার মধ্যে কয়েকজন প্রবাদে উল্লিখিত। দেবদেবী বিষয়ক প্রবাদগুলি কখনও শ্রদ্ধামূলক, কখনও বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আশ্রয়ী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রবাদগুলি গড়ে উঠেছে, দেবতাকে উদ্দেশ করে নয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে:

ভগবান: ভগবান সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা তাকে কেন্দ্র করেই প্রবাদগুলি রচিত। করুণাময় দয়ালু ভগবানকে সবাই মানে। তিনি শক্তিমান ঈশ্বর। মানুষের কাছে ভগবান কীরকম তা বেশ কয়েকটি প্রবাদে বলা হয়েছে। ভগবানের ওপর মানুষ নির্ভর করে তিনি ভক্তের সহায় বলে। এ ধরনের ভগবান সম্পর্কিত প্রবাদ:

ক. ভক্তের ভগবান, অভক্তের অপমান।

বিশ্বাসীর কাছে ভগবান বিশ্বাসযোগ্য, আর যিনি বিশ্বাস করেন না তাঁর কাছে ভগবানের কোনও মূল্য নেই।

খ. ভোগের কর্তা ভগবান।

ভগবানই মানুষকে আহার জুগিয়ে দেন কিংবা ভগবানই সব মানুষের আহার্যের স্রষ্টা।

গ. যার কেউ নেই তার ভগবান আছে।

অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন ভগবান।

ঘ মানুষেব দেওয়া কুলায় না।
ভগবানের দেওয়া ফুরায় না।

মানুষের দানের শেষ আছে, কিন্তু ভগবানের দানের শেষ নেই।

শিব: মহাদেব ও শিব একই দেবতা, কিন্তু নাম আলাদা। শিব হলেন দেবাদিদেব। ব্রহ্মা বিষ্ণুর মতোই প্রধান দেবতা। ইনি সন্ন্যাসী, মহাযোগী ও নির্গুণ ধ্যানের প্রতীক। আবার সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়ামক। এই দেবতা সকলের মঙ্গল সাধন করেন। জটাধারী, সর্পভূষিত মহাদেব বা শিব প্রসঙ্গে প্রবাদগুলি বেশ কৌতূহলজনক:

ক. শিবের মাথায় নারকেল ফাটান।

শিবপূজা অত্যন্ত অনাড়ম্বর। শিবের পূজায় ডাব বা নারকেল লাগে। কারণ শিবকে ডাব বা নারকেলের জলে স্নান করানো হয়। প্রবাদটিতে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য নারকেল ফাটানোর কথা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে।

খ. সাপকে মারলে শিবকে লাগে।

শিবের অঙ্গের ভূষণ হল সাপ। তাই সাপকে মারলে শিবকে আঘাত করা হয়—একের জন্য অন্যকে আঘাত করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

গ. ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপও টের পায় না।

শিব চতুর্দশীর দিন নির্জলা উপবাসে থাকতে হয় ভক্তের। এখন যদি কেউ লুকিয়ে জল পান করে তা হলে শিব টের পান না—অর্থাৎ গোপনে ঘটা কাজের কথা কেউ-ই জানতে পারে না—এই সত্যটাই প্রবাদের মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে।

ঘ. বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর।

সমুদ্রমন্থন জাত হলাহল অর্থাৎ বিষ পান করেছিলেন বলে শিবের আর এক নাম নীলকণ্ঠ। সেই নীলকণ্ঠ শিবের কথাই প্রবাদটিতে বলা হয়েছে।

শিব ও পার্বতী: পার্বতী হলেন শিবের স্ত্রী। হরপার্বতীর মিলন বিচ্ছেদহীন। তাই শিব ও পার্বতীকে নিয়ে রচিত প্রবাদ:

শিব নাচে রঙ্গে পার্বতী নাচে সঙ্গে।

শিব ও পার্বতীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

শালগ্রাম শিলা: শালগ্রাম শিলা অর্থাৎ নারায়ণ সর্ব ঘরেই পূজিত হন এবং তিনিই নরনারীর আশ্রয়স্থল। শালগ্রাম শিলা হল নারায়ণের প্রতীকী রূপ। শালগ্রাম যেহেতু একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার প্রস্তরখণ্ড তাই তাঁকে নিয়ে পরিহাস মিশ্রিত প্রবাদ শোনা যায়:

ক. শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান।

খ. মানি ত শালগ্রাম না মানি ত পাথর।

মান্য করলে শালগ্রামের প্রাণ, না মানলে পাথর।

গ. সব নুড়ি শালগ্রাম হয় না।

যে কোনও পাথরই শালগ্রাম শিলা হতে পারে না।

ঘ. শালগ্রাম, নোড়াভজা।

শালগ্রাম আসলে পাথরের তৈরি। সেইজন্য নোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ঙ. শালগ্রামের ধান ভানা।

অর্থাৎ অসম্ভব ব্যাপার।

হরি: হরি যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সনাতন দেবতা, তাঁকে সেবা করলে বা তাঁর নাম স্মরণ করলে মানুষ ভবপারে উত্তীর্ণ হয়। হরি যার সহায় তাকে প্রবল শত্রুও কিছু করতে পারে না, হরিনাম করলে বৃন্দাবনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রবাদের মধ্যে হরির গুণাগুণের কথাই বলা হয়েছে:

ক. হরি যার সখা বল, দুশমন তার পায়ের তল।

হরি সহায় থাকলে দুশমনও পরাজিত হয়।

খ. বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলেও রইতে নারি।

ইচ্ছে থাকলেও হরির কাছে সবসময় থাকা যায় না।

গ. হরিপদে থাকে মন হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।

হরিকে আত্মসমর্পণ করলে হৃদয়ও বৃন্দাবন হয়।

ঘ. হরি বাঁচান প্রাণ বদ্যির বড় মান।

হরি সহায় থাকলে বদ্যির চিকিৎসা সফল হয়।

ঙ. পারের কর্তা হরি দেবেন চরণতরী।

ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র সহায় হরি।

চ. রাখে হরি মারে কে?

হরি সহায় থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না।

কৃষ্ণ: কৃষ্ণ হিন্দুদের উপাস্য দেবতা। ইনি বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে স্বীকৃত। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রেম-লীলা বর্ণিত। ইনি সকলেরই মঙ্গলকারী দেবতা। কৃষ্ণের দেবত্বকে ও সীমাহীন ক্ষমতাকে প্রবাদের মধ্যে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে।

ক. কৃষ্ণকথা মধুরবাণী, তুমি বল আমি শুনি।

কৃষ্ণের বচন অমৃত সমান।

খ. রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

কৃষ্ণ যদি রক্ষা করেন, তবে কেউ মারতে পারে না।

গ. কৃষ্ণকথা কয় না বকে, মধু হয় না বোলতার চাকে।

কৃষ্ণকথার অধিকারী ভেদ আছে।

ঘ. গাছের ফুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

যে ফুল বাগানের বাইরে সে ফুল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে শুদ্ধ ভক্তি প্রদর্শন।

একটি প্রবাদে অবাস্তব ঘটনার কথা বলা হয়েছে। যেমন—

ঙ. কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

অসম্ভব ব্যাপার।

জনজীবনে এই প্রবাদের অর্থ হল পাষণ্ডের মুখে ঈশ্বরনাম, কিংবা অশুচি অপবিত্র মানুষের মুখে কৃষ্ণনাম।

জগন্নাথ: জগন্নাথ হলেন বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অবতার। সর্বত্রই তিনি পূজিত এবং অতিপরিচিত দেবতা। জগন্নাথদেবের দর্শনলাভের বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়ের প্রসঙ্গ প্রবাদের মধ্যে যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি জগন্নাথের যেহেতু হাত নেই, তাই খোঁড়াকে তাঁর সঙ্গী বলা হয়েছে। একদিকে তাঁর প্রতি

ভক্তিভাব ও শ্রদ্ধা, অপরদিকে তাঁকে নিয়ে রসিকতাও প্রবাদে প্রচলিত। দেবতার কথা থাকলেও এই ধরনের প্রবাদ কিন্তু প্রযুক্ত হয় কোনও ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট করে। জগন্নাথ হিন্দুদের অন্যতম উপাস্য দেবতা। তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক। সেইজন্য জগন্নাথ সম্পর্কে বাংলায় এত প্রবচন তৈরি হয়েছে:

ক. যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা।

খ. জগন্নাথে গেলে হাড়ীর ঝাঁটা খেলে।

গ. আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো পাত।

অর্থাৎ নিজের শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি।

ঘ. কালো হাঁড়ি কেয়াপাত, তবে দেখবি জগন্নাথ।

পুরীধামে পৌঁছোনোর আগে থেকেই চারদিকে কালো হাঁড়ি ও কেয়াগাছের প্রাচুর্য দেখা যায়। এসব দেখেই বোঝা যায় জগন্নাথ মন্দির নিকটবর্তী।

শনি: শনি হলেন সূর্য ও ছায়ার পুত্র। শনির তেজের কথা কারও অজানা নয়। শনি ঠাকুর ভীতি-দায়ক কারণ তাঁর কোপে পড়লে কারও মঙ্গল বা কাজ সিদ্ধ হয় না। সেজন্যই শনিকে তুষ্ট রাখতে চায় সকলে—

বিহানী লৌকিক যে জন ঘাড়ে, শনি ঠাকুর ঘুরায় তারে।

কার্তিক: ময়ূরবাহন কার্তিক হলেন হর-গৌরীর পুত্র। প্রচলিত সংস্কার বা বিশ্বাস হল কারও পুত্রসন্তান না হলে কার্তিককে পূজা করলে নিঃসন্তানের পুত্রসন্তান লাভ হয়। সেই সংস্কারজনিত বিশ্বাসের ফলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ মিশ্রিত প্রবাদের সৃষ্টি হয়:

হবে না আর বাঁজার ছেলে কার্তিক রে তোর বাবাও এলে।

গণেশ: হর-পার্বতীর পুত্র হলেন গণেশ। যেকোনও পূজার আগে গণেশকে পূজা করার রীতি। প্রবাদে গণেশের দেবমূর্তির পরিবর্তে জরদ্গব অর্থে গোবর গণেশ বলা হয়েছে।

বিশ্বকর্মা: দেব-কারিগর হলেন বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মার কারিগরি ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

ক. বিশ্বকর্মার ছুঁচ গড়া।

জগন্নাথের অসম্পূর্ণ মূর্তি প্রসঙ্গে বিশ্বকর্মার শিল্পনৈপুণ্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্রবাদে:

খ. বিশ্বকর্মা কত কারিগর তা জগন্নাথে দেখা গেছে।

আবার আর একটি প্রবাদে বিশ্বকর্মা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

গ. বিশ্বকর্মার বেটা বিয়াল্লিশ কর্মা।

দুর্গা বা দুর্গাপূজা: দেবী দুর্গা হলেন মহাদেবের স্ত্রী। ইনি সকলের কাছেই পূজিতা। এই দেবী দশভুজারূপে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গা প্রতিমার অপরূপ রূপের অন্তরালে অর্থাৎ বাইরের চাকচিক্যের ভেতরে থাকে খড়ের কাঠামো। দুর্গার ঐশ্বর্যের পরিবর্তে প্রবাদটিতে দুর্গা প্রতিমার গঠনগত কাঠামোর রূপটিই প্রকাশিত হয়েছে:

হিঁদুদের দুগ্‌গা পুজো
উপরে চিকন-চাকণ ভিতরে খড়ের বুজো।

কালী: শিব বা মহাদেবের পত্নী কালী সবার কাছেই পূজিতা। কালীর রূপ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে প্রবাদের মধ্য দিয়ে।

ক. রক্তদন্তী কালী।

—প্রবাদটিতে কালীর ভয়ংকর রূপের কথা বলা হয়েছে।

খ. রাম রহিম কালী, ভেদ করলেই মলি!

—সব ধর্মই সমান, তীব্র কশাঘাতে সমাজের ভেদবুদ্ধিকে নিন্দা করা হয়েছে প্রবাদটির মাধ্যমে।

গ. কালী কালী বনমালী, শেখ পরাণে জয়ধর আলি।

এই প্রবাদটিতেও হিন্দু-মুসলমানকে সমান দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রবাদটির মূলভাব।

ঘ. কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া।

মহাপ্রসাদের জন্য কালীর সামনে পাঁঠা বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এই বলিদানের মধ্যে ভক্তের পূজা অথবা ভক্তি অপেক্ষা লোভ-লালসার বৃত্তির কথাই প্রকটিত হয়েছে। পাঁঠা খাওয়াই মূল উদ্দেশ্য, কালীপূজা উপলক্ষমাত্র।

কালী ও শিব: কালী ও শিবকে নিয়েও প্রবাদ শোনা যায়।

কালীর শোভা করে অসি, শিবের শোভা শিরে শশী।

—প্রবাদটিতে কালী ও শিবের শোভাবর্ধনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কালী হলেন খড়্গ বা অসিহস্তা, আর শিবের কপালে থাকে চন্দ্র—দু'জনের শোভাবর্ধক রূপের বৈশিষ্ট্য কিন্তু বিপরীতধর্মী। একজন ভয়ংকরী উগ্রমূর্তি, অপরজন শান্তশীতল ধ্যান-গম্ভীর।

চণ্ডী: চণ্ডী লোকদেবী। মঙ্গলচণ্ডীর কুস্বপ্নের কথা পাই একটি প্রবাদে:

ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া।

গঙ্গাদেবী: গঙ্গা শিবের স্ত্রী, দেবীরূপে পূজিতা। মকরবাহিনী এই দেবী শুক্লবর্ণা ও চতুর্ভুজা এবং হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র। গঙ্গা সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদে। গঙ্গাপূজা গঙ্গার জলেই হয় তার জন্য অন্য কোথাও থেকে জল আনার প্রয়োজন হয় না। গঙ্গা পবিত্র বলেই গঙ্গায় ময়লা ফেললেও গঙ্গার পবিত্রতা একটুও কমে না। এই সকল ধারণার বশবর্তী হয়েই গঙ্গা সম্পর্কিত প্রবাদগুলির সৃষ্টি:

ক. মা গঙ্গাই জানেন।

খ. গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা।

গ. গঙ্গায় ময়লা ফেললেও গঙ্গার মাহাত্ম্য কমে না।

লক্ষ্মী: শিব-দুর্গার কন্যা হলেন লক্ষ্মীদেবী। নারায়ণের স্ত্রী এবং শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবীরূপে পূজিতা। হিন্দুদের প্রতি ঘরেই লক্ষ্মীর পূজা হয়ে থাকে। লক্ষ্মী সম্পর্কিত বহু প্রবাদ শোনা যায়। লক্ষ্মীর কৃপালাভ হলে ভক্তের জীবন

ধন-ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে এবং তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলে ভক্তের ভাগ্যে দুঃখের আর সীমা থাকে না। তাই মানুষ যাতে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সে কথা বাংলা প্রবাদে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে:

ক. লক্ষ্মীর ঘরে কালো পেঁচা।

অর্থাৎ সৌন্দর্যের মধ্যে কুৎসিতের অবস্থান কিংবা মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গলের ছায়া।

খ. দক্ষিণে তাল উত্তরে বেল, লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল।

গ. হাড়ীর লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।

ঘ. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

অর্থাৎ সুপ্রাপ্তির প্রত্যাখ্যান।

ঙ. লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।

সরস্বতী: শিব-দুর্গার কন্যা সরস্বতী। ইনি বিদ্যার দেবী। প্রবাদে দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য ও গুণের কথা বলা হয়েছে। প্রবাদের মূল লক্ষ্য যেহেতু মানুষ, তাই নারীর রূপ-গুণের প্রশংসাই করা হয়েছে এখানে।

ক. রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

সরস্বতীর কৃপালাভ করলে বিদ্যালাভ হয়। তাই পণ্ডিত মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

খ. সরস্বতীর বরপুত্র।

অন্নপূর্ণা: দেবী অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী দেবী হিসেবে পূজিতা। দেবী অন্নপূর্ণার কৃপালাভ করেও কেউ যদি অন্নের জন্য হাহাকার করে তবে বিস্মিত হতে হয়। মানবজীবনে এরকম অসংগতি প্রবাদরূপ লাভ করেছে—

ক. অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

আবার দেবী অন্নপূর্ণার গুণ যার মধ্যে আছে তার সম্পর্কে বলা হয়—

খ. সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

মনসা: মনসা সর্পদেবী এবং অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণা। মনসার স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর। মনসা কোপনস্বভাবা বলেই তাকে না চটানোই ভাল। মনসা সম্পর্কিত অত্যন্ত পরিচিত একটি প্রবাদ হল:

ক. একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

অর্থাৎ মনসা একেবারেই ধুনোর গন্ধ সহ্য করতে পারে না তাতে ক্রোধ বেড়ে যায়। অত্যন্ত রাগী স্বভাবের ব্যক্তিকে যদি ধুনো দেওয়া হয় অর্থাৎ উত্তেজিত করা হয় তা হলে তার ক্রোধ আরও বেড়ে যায়, সেকথাই প্রবাদটিতে বলা হয়েছে। এছাড়া মনসা সম্পর্কিত আরও প্রবাদ আছে:

খ. হেলে নয় গিরগিটি নয় মনসার সঙ্গে বাস।

গ. ঢাকের কড়িতে (পাঠান্তর 'দায়ে') মনসা বিকায়।

॥ দুই ॥

পৌরাণিক চরিত্র-বিষয়ক

পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে যে সমস্ত নরনারী আছেন তাঁদের সম্পর্কে পল্লীগ্রামবাসীদের কৌতূহলের শেষ নেই। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের জন্ম এবং তাদের পরিচয় সম্পর্কে যে বিশেষত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে বহু প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যেভাবে চরিত্রগুলি বর্ণিত রয়েছে, তার সঙ্গে গ্রামীণ লোকসমাজের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল তা নয়, কোনও যাত্রা কথকতা পাঁচালি পাঠের আসরে বসে এই সমস্ত চরিত্র সম্পর্কে তাদের যে জ্ঞান জন্মেছে তা এই ধরনের চরিত্র বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যে প্রকাশিত। রামায়ণ-মহাভারত অতি জনপ্রিয় মহাকাব্য। মহাকাব্য দুটির কাহিনী আজও পল্লীবাসীর অন্তরকে আবেগে আপ্লুত করে তোলে। তাই রামায়ণ-মহাভারতের যেসব চরিত্র অধিক পরিচিত, লোকমানসের ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রবাদের মধ্য দিয়ে সেইসব চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রাম: দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র হলেন রামচন্দ্র। রাম প্রজাবৎসল রাজা

ছিলেন। রাম নাম স্মরণ করলে ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়। মরণকালেও রাম নাম করা হয়। রামের বনবাস-কৈকেয়ীর ইচ্ছাপূরণ-সুগ্রীবের সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ঘটনা প্রসঙ্গে রামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন—

ক. রামরাজ্য।

অর্থাৎ যখন কোনও রাজ্যে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজ করে তখন সেটাকে বলা হয় রামরাজ্য।

খ. বল বল তিন বল।
ভোজনে অম্বল, শয়নে কম্বল, মরণে 'রাম বল'।

—দরিদ্র মানুষের এই তিনটেই সম্বল।

গ. কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস।

আকস্মিক বিপর্যয় বোঝাতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। এ হল সৌভাগ্যের উচ্চচূড়া থেকে পতন।

ঘ. রাম নামে ভূত পালায়।

ঙ. ভূতের মুখে রাম নাম।

প্রচলিত বিশ্বাস 'রাম' নামে ভূত পালায়। সেই ভূতের মুখে রাম নাম অর্থাৎ অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

চ. রামের হনুমান।

অর্থাৎ বিশ্বস্ত অনুচর।

ছ. শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।

রামের পরাক্রম প্রকাশক এ প্রবাদ।

জ. রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব।

মারীচের উক্তি। উভয় সংকট আর কী!

ঝ. যাঁহা রাম তাহা অযোধ্যা।

রামচন্দ্র ছাড়া অযোধ্যার অস্তিত্ব নেই।

ঞ. সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

রামচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার অস্তিত্বও বিলুপ্ত।

লক্ষ্মণ: দশরথ ও সুমিত্রার পুত্র হলেন লক্ষ্মণ। জন্মাবধি তিনি ছিলেন রামের নিত্য সহচর। লক্ষ্মণ ছিলেন অতিশয় ভ্রাতৃবৎসল, বিশেষত রামচন্দ্রগত প্রাণ। তাঁর বেশবাস অর্থাৎ রাজবেশ ছেড়ে যোগীবেশ ধারণ, তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম বা ভক্তি এবং আদর্শ দেবর হিসেবে কর্তব্যনিষ্ঠার কথা রামায়ণে আছে। লক্ষ্মণের সেইসব গুণের কথা প্রবাদেও বিধৃত।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যখন বনবাসে ছিলেন তখন রামকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন লক্ষ্মণ। একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশে এবং একটি বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের প্রবল আনুগত্যের প্রকাশ ঘটেছে—

ক. লক্ষ্মণের ফল ধরা।

খ. লক্ষ্মণ ভোজন।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম অসাধারণ। এহেন চরিত্র সম্পর্কে বহু প্রবাদ শোনা যায়। যেমন—

গ. রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই রথে চড়ে স্বর্গে যাই।

অর্থাৎ একজন অন্যজনকে অনুসরণ করে বলে তাদের একাত্মতা বোঝাতে প্রবাদটি বলা হয়েছে।

ঘ. রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

দেবর হিসেবে লক্ষ্মণ অতি কর্তব্যপরায়ণ। লক্ষ্মণের সেই গুণের কথাই প্রবাদে বিধৃত:

ঙ. দেবর লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণের মতো দেবর অতি বিরল। দেবর হিসেবে আদর্শস্বরূপ। বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে সেই পরিচয়টি বিধৃত।

সীতা: মিথিলার রাজা জনকের পালিতা কন্যা এবং অযোধ্যার রাজা রামের মহিষী হলেন সীতা। মাটিতে তাঁর জন্ম, রাবণের ঘরে বন্দিনী ছিলেন বলে সতী হয়েও তাঁকে কলঙ্কিনী সন্দেহে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল— সে অপমান সহ্য করতে না পেরে সীতা ধরাতলে চলে যান এ কাহিনী কারওরই অবিদিত নয়। রামায়ণের সেই সর্বংসহা নারী ধরণীর গর্ভে প্রবেশলাভ করে কেবলমাত্র পতির হৃদয়ে নয়, চিরকালের জন্য জনহৃদয়ে যে কালজয়ী আসন লাভ করে গেছেন তার পরিচয় সীতা সম্পর্কিত প্রবাদে পাওয়া যায়। যেমন—

ক. সীতা হারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর।

লঙ্কায় সীতা বন্দিনী থাকার সময়ে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধারের জন্য বাঁদরদের শরণাপন্ন হন, তাই একথা বলা হয়েছে।

সর্বসংহা সীতা বড় দুঃখিনী ছিলেন। সীতার সঙ্গে দুঃখ জড়িয়ে আছে, মরণেই সীতার দুঃখ ঘুচবে—এই মনোভাবই নিম্নোক্ত প্রবাদটিতে ব্যক্ত হয়েছে:

খ. যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ
মরলে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

আবার সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথাও প্রবাদে বলা হয়েছে:

গ. যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা।

সীতা যে জনম দুঃখিনী, তাঁর আসল বাবা-মা নেই, তিনি পালিতা কন্যা। সীতা সম্পর্কে সে কথাটিই প্রবাদে বিবৃত হয়েছে:

ঘ. জনম দুখিনী সীতা
নাই মাতা নাই পিতা।

রাম ও সীতার সঙ্গে কৃষ্ণ-রাধার তুলনা করে বলা হয়েছে:

ঙ. যেমন রাম তেমন সীতা
যেমন কানু তেমন রাধা।

কোনও বিষয়ে খুঁটিনাটি জানার পরেও কেউ যদি সেই বিষয়ে কোনও তুচ্ছ প্রশ্ন করে, তখন এই প্রবাদটি উচ্চারিত হতে শোনা যায়:

চ. সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা।

রাবণ: নিকষা রাক্ষসীর সন্তান রাবণ ছিলেন লঙ্কার রাক্ষসরাজ। তাঁর ছিল দশটি মাথা, বিশটি হাত ও কান। রাবণের দোষের কথা প্রবাদে শোনা যায়। যেমন—

ক. রাবণের দোষে হয় সমুদ্র বন্ধন।

রাবণ সীতাকে হরণ করেন, রামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধেন, তাই একথা বলা হয়েছে।

খ. ঘরভেদে (ঘরসন্ধানে) রাবণ নষ্ট।

সহোদর ভ্রাতা বিভীষণের শত্রুতাই রাবণের বিনাশের হেতু।
রাবণের অনেক সন্তান অর্থাৎ বৃহৎ পরিবার অর্থে নিম্নোক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত—

গ. রাবণের গুষ্টি, বা রাবণের নাতি।

রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কাপুরীর অবস্থা কীরকম হয়েছিল তাও প্রবাদে বিবৃত—

ঘ. রাবণের পুরী ছারখার।

রামের হাতে রাবণ নিহত হওয়ায় রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির কল্পনা পূর্ণ হয়নি—একথাও শোনা যায়—

ঙ. রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।

রাবণ যে রামের কাছে বধ্য সে কথাটি প্রবাদে ব্যক্ত:

চ. শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।

শূর্পনখা: রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী শূর্পনখা। রাবণের ভগিনী বলে শূর্পনখা গর্ব বোধ করে, তাই সে বলে:

ক. আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পনখা।
ধরা মাঝে এমন জোড়া পারিস যদি দেখা ॥

—শূর্পনখার দাম্ভিকতার পরিচয়বহ প্রবাদটি।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসে থাকাকালীন লক্ষ্মণকে শূর্পনখা প্রেম নিবেদন করলে লক্ষ্মণ তার নাক কেটে দেয়। শূর্পনখার নাক কাটার প্রসঙ্গও প্রবাদে লভ্য:

খ. শূর্পনখার নাককাটা।

মারীচ: রাবণের এক অনুচর মারীচ। সীতাহরণের সময় রাবণ মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে বলেন। মারীচ রামের শক্তিতে ভীত হয়ে এ প্রস্তাবে অসম্মত হলে রাবণ তাকে হত্যা করার ভয় দেখান। মারীচ তখন উভয় সংকটে পড়ে। প্রবাদে মারীচের উভয় সংকটের কথা বলা হয়েছে:

ক. রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব।

কিংবা,

খ. এগুলে রাম পেছুলে রাবণ।

—উভয়সংকট বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

বিভীষণ: রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ। বিভীষণ রাবণকে ত্যাগ করে শত্রু রামের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তাই বিভীষণ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রচলিত প্রবাদটি হল:

ঘরের শত্রু বিভীষণ।

—প্রবাদটি রামায়ণ কাহিনীর হলেও ব্যবহৃত হয় সমাজ-সংসারের ঘটনাসূত্রে।

কুম্ভকর্ণ: রাবণের মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের ঘুমের কথা কারও অজানা নয়। তাঁর আকৃতি ছিল অতি ভয়ানক। কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেছিলেন তিনি। বছরের ছ'মাস অতিবাহিত করতেন ঘুমিয়ে। তাঁর সেই দীর্ঘ ঘুমের কথাই প্রবাদে বলা হয়েছে:

ক. গুণের কথা বলব কত কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।

—দীর্ঘনিদ্রা ও আলস্য বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

খ.   কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

যা খুবই দুরূহ তিনি একটানা ছ'মাস ঘুমোতেন।

জটায়ু: জটায়ু ছিলেন দশরথের বন্ধু। সীতা হরণের সময় রাবণের রথ গলাধঃকরণ করতে গিয়ে জটায়ু রাবণ কর্তৃক নিহত হন। প্রবাদটিতে একথাই বলা হয়েছে:

জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা।

অর্থাৎ পক্ষীকুলেব মধ্যে সর্ববৃহৎ ও শক্তিমান বলে পরিচিত জটায়ু সীতা-হরণকারী পাপিষ্ঠ রাবণকে শাস্তি দিতে তাঁর রথকে গ্রাস করতে গিয়েছিলেন। রাবণের শক্তি সম্পর্কে কোনও ধারণাই তাঁর ছিল না। ফলে রাবণের হাতেই মৃত্যু হয় তাঁর।

মহীরাবণ: মহীরাবণ মাল্যবানের বোনের ছেলে। এবং তাঁর অপর নাম রাবণ, রাবণকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। প্রবাদে মহীরাবণের এবং তাঁর পুত্রের নামোল্লেখ আছে মাত্র। যেমন—

মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণ।

—ভয়ংকরের ধারাবাহিকতা অর্থে ব্যবহৃত।

সুগ্রীব: বানররাজ বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন সুগ্রীব। সুগ্রীব রামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে সুগ্রীবের ভূমিকা কারও অজানা নয়। প্রবাদে সুগ্রীব সম্পর্কে বলা হয়েছে:

একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।

রামায়ণের মতো মহাভারতের বেশ কিছু চরিত্র অবলম্বনে প্রবাদ শোনা যায়। এই ধরনের প্রবাদগুলি পল্লীবাংলার মানুষের মুখেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের ধারণা, বিশ্বাস, জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনা থেকে। মহাভারতের চরিত্র-আশ্রিত সেসব প্রবাদ কম কৌতূহলজনক নয়।

ভীষ্ম: দেবব্রত ভীষ্ম ছিলেন মহাভারতের একজন আদর্শবান বীর। গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্র হলেন ভীষ্ম। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা সকলেরই জানা। সেই প্রতিজ্ঞা অবলম্বনে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের সৃষ্টি হয়েছে:

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

অর্থাৎ এমন মানুষ যিনি নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল।

কর্ণ: মহাভারতের একজন অসাধারণ বীর হলেন কর্ণ। কর্ণ যেমন বীর ছিলেন তেমনি দাতা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। সে কথাই প্রবাদের মধ্যে বলা হয়েছে:

ক. ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম দাতাকর্ণ।

দরিদ্র অথচ দান-বীর, এমন ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

খ. বুদ্ধিতে সেরা বৃহস্পতি, যুদ্ধে সেরা কর্ণ।

—বৃহস্পতিব বুদ্ধিব শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় কর্ণের বীরত্বের পরিচয় প্রদান।

অর্জুন: অর্জুন ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব এবং কুন্তীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীর। পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসকালে অর্জুন 'বৃহন্নলা' এই ছদ্মনামে বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার নৃত্য-গীতের শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কৌরব সৈন্যদের পরাজিত করে গোধন উদ্ধার করেছিলেন। এই বীর প্রসঙ্গেই প্রবাদে বলা হয়েছে:

ক. বৃহন্নলা রথী যার, পরাজয় কোথা তার।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রথের সারথি হিসেবে পেয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে প্রবাদে বলা হয়েছে:

খ. সখা যার জনার্দন, তাঁর সঙ্গে কি সাজে রণ?

এই ধরনের প্রবাদে উপমান হচ্ছে উল্লিখিত চরিত্র কিন্তু উপমেয় হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ যাকে উদ্দেশ করে প্রবাদটি বলা হচ্ছে।

দুর্যোধন: দুর্যোধন হলেন কুরুপুত্র। রাজা দুর্যোধন ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর মনের অধিকারী। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য জলস্তম্ভ বিদ্যাবলে অগাধ জলের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। সে কথা প্রবাদে বলা হয়েছে। যেমন—

দুর্যোধনের মতো জলস্তম্ভ করে থাকা।

শকুনি: শকুনি হলেন গান্ধাররাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পাশাখেলায় শকুনি কপট উপায়ে পাণ্ডবদের হারিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে, তিনি কৌরবদের দুষ্কর্মে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ফলে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। এহেন শকুনিকে প্রবাদে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে—

দুর্যোধনের শকুনি মামা।

অর্থাৎ কোনও দুষ্ট চরিত্রের অতি চতুর মাতুল।

শল্য: মধ্যপ্রদেশের রাজা শল্য ছিলেন পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রীর ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি কৌরবদের পক্ষ নিয়েছিলেন। ইনি কৌরবদের সেনাপতির পদ লাভ করেন, যখন বড় বড় রথীরা ব্যর্থ হন। সেই প্রসঙ্গে শল্যের স্থান সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে প্রবাদে:

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি
ভীষ্ম দ্রোণ-কর্ণ-গেল, শল্য হল রথী।

অর্থাৎ শক্তিশালী ব্যক্তিরা যেখানে পরাজিত, সেখানে শক্তিহীনের আস্ফালন। 'কত হাতি গেল তল/মশা বলে কত জল'—এর সঙ্গে তুলনীয়।

রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্যান্য পুরাণের কিছু চরিত্র এবং তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রবাদে স্থান পেয়েছে।

দৈবকী: কৃষ্ণের মাতা দৈবকী। কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে রক্ষার জন্য সদ্যোজাত পুত্র কৃষ্ণকে ব্রজধামে নন্দের গৃহে রেখে আসেন এবং নন্দের স্ত্রী যশোদা তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে রেখে যান দৈবকীর কাছে। পুত্রসন্তান অন্যত্র রেখে আসার ফলে তাঁর মানসিক কষ্টের কথাই নিম্নোক্ত প্রবাদটিতে প্রকাশ পেয়েছে:

ক. আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

কৃষ্ণ: দৈবকীর সন্তান হয়েও কৃষ্ণের জননীরূপে যশোদার যে পরিচিতি সেকথাও প্রবাদে বলা হয়েছে:

কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী, নাম পাড়ান যশোদারাণী।

অর্থাৎ প্রকৃত মাতা সন্তান জন্মদানের কষ্টভোগ করেন, আর পালকমাতা পাল্য সন্তানের গর্বে গরবিনী হন।

প্রহ্লাদ: হিরণ্যকশিপুর পুত্র হলেন প্রহ্লাদ। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ ভক্তি। কঠিন তপস্যার মাধ্যমে ভক্তির সাধনায় প্রহ্লাদ জয়ী হয়েছিলেন। দৈত্যকুলে তিনি একেবারেই খাপ খান না। এমন ধরনের মানবচরিত্র প্রসঙ্গেই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে বলা হয়েছে:

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

অর্থাৎ যার চরিত্র বা আচরণ বংশের ধারার বিপরীত।

হরিশ্চন্দ্র: সূর্যবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু-র পুত্র ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। অত্যন্ত ধার্মিক রাজা ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী হলেন শৈব্যা এবং পুত্র হলেন রোহিতাশ্ব। ঋণের জন্য তাঁর স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় এবং যজ্ঞের জন্য পুত্র-বলিদানের কথা কারও অজানা নয়। এহেন পুণ্যবান রাজার যে স্বর্গলাভ ঘটবেই তা প্রবাদেও বিধৃত হয়েছে:

হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গলাভ।

অর্থাৎ পুণ্যবান মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি কার্যকারণ সম্পর্কে বিধৃত।

সাবিত্রী: রাজকন্যা সাবিত্রীর সতীত্বের পুরাকথা দীর্ঘদিন ধরে এদেশে প্রচলিত। স্বামী সত্যবানের প্রাণরক্ষার্থে তাঁর তপস্যা অসাধারণ। কিন্তু কেউ যদি (ব্যক্তিমানুষ) সাবিত্রীর মতো সতী না হয়েও সতীপনার ভাণ করে, তখন বিদ্রূপে জর্জরিত হয়। সেই সূত্রেই উচ্চারিত হয় নিম্নোক্ত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি:

সতী সাবিত্রী।

॥ তিন ॥

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারী চরিত্র-সম্পর্কিত

পৌরাণিক দেবদেবী বা নরনারী ছাড়াও কিছু ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারী-পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা প্রবাদমালায়। এই ধরনের চরিত্রগুলি হল কোনও ধর্মগুরু, রাজা-মহারাজা, কবি-মহাকবি, পণ্ডিত, কূটনৈতিক, জ্যোতির্বিদ, ভক্ত বা ভক্তা, দেশপ্রেমিক। পল্লীসমাজের লোকসাধারণ নিজেদের ধারণা অনুযায়ী এই চরিত্রগুলি অবলম্বনে নানা প্রবাদ রচনা করেছেন। এই ধরনের প্রবাদগুলির মধ্যে যে সবসময় চরিত্রের গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা নয়, হয়তো কেবলমাত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমেও তাঁদের পরিচয় দানের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এইসব চরিত্র সম্পর্কে গ্রামের মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানই প্রবাদে উল্লিখিত। এতে গ্রামবাংলার মানুষের অসীম আগ্রহ ও সাধারণ জ্ঞান যে কতখানি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু মানুষ; দেবতা বা পৌরাণিক চরিত্র নয়।

মহীপাল: মহীপাল এমন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি যাঁর মহিমানীতি গ্রামবাংলার মানুষের অন্তরে স্থান লাভ করে। তাই প্রবাদের মধ্যেও প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হতে শোনা যায়:

ক. ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু।

মহীপালের গীতের ব্যাপক প্রচলনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

কিংবা,

খ. ধান ভানতে মহীপালের গীত।

মহীপালের গীত ছিল এমনই লোকপ্রিয়।

রামকৃষ্ণ রায়: নাটোরের (বর্তমান বাংলাদেশ) একজন বিখ্যাত ও সম্মানিত রাজা ছিলেন রামকৃষ্ণ রায়। তিনি অত্যন্ত সাধারণ ঘর থেকে পরে রানি ভবানীর দত্তক পুত্ররূপে রাজা হয়েছিলেন।

কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ, কোথায় ভজা জেলে।

বিপরীতধর্মী চরিত্রের তুলনা প্রসঙ্গে প্রবাদটির সৃষ্টি। রামকৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রদর্শনে এই বৈপরীত্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রানি ভবানী: নাটোরের রানি ভবানী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা। রানি ভবানীর চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্যঙ্গার্থে অতি সাধারণ কোনও নারীর চরিত্রের তুচ্ছতা প্রদর্শন করা হয়েছে তুলনার মাধ্যমে:

রাণী ভবানী আর ফুল জেলেনী।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়: বাংলার বিখ্যাত বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম দুই ভাই হলেন চাঁদ রায় ও কেদার রায়। এঁরা দু'জনে এতই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, এঁদের নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়েছে। একের প্রাপ্য প্রশংসা যদি কেউ অন্যকে দেয় তখন সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে উচ্চারিত হতে শোনা যায়:

খায় লয় চাঁদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের।

আসফ্উদ্দৌলা: অযোধ্যার চতুর্থ নবাব আসফ্উদ্দৌলা ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। তাঁকে নিয়েও প্রবাদ শোনা যায়:

যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় না আসফ্উদ্দৌলা।

ঈশ্বর না দিলে অতি দানশীল ব্যক্তির কাছে হাত পেতেও কিছু লাভ হয় না। অর্থাৎ যে হতভাগ্য ব্যক্তি ঈশ্বরের আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত, সে উদারচেতা দানশীল ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকলেও তাঁর আনুকূল্য লাভ করতে পারে না।

॥ চার ॥

সামাজিক চরিত্র ও সমাজজীবন-বিষয়ক

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত পরিচিত মানুষ বাস করে তাদের স্বভাব-চরিত্র, দোষ-গুণ, আচার-আচরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহু প্রবাদের। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ভাল-মন্দ দিকগুলি কখনও রসিকতা, কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদে।

এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "সামাজিক জীবনের নানাশ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকরো ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহার কৌতুক ও বিদ্রূপের পরিধির মধ্যে আসে নাই। চাষা গয়লা, তাঁতি নাপিত, কলু কামার, বেনে সেকরা, ন্যাকা বোকা, বামুন বোষ্টম, কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াদা, পীর বাঁদী, গুরু চেলা, হিঁদু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্যাঁচড়, ছোট বড়ো, ধনী কৃপণ, গরিব কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত্নী, বুড়ো বুড়ী, মরদ মাগী, কানা খোঁড়া, হাগুন্তী নাচুন্তী, ভড়ং ভণ্ডামি, চুরি বাটপাড়ি, নষ্টামি দুষ্টামি, আয়েশ আমিরি, অনাচার অনাসৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুখ, রোগ শোক, পরচর্চা পরনিন্দা, ঘোঁট দলাদলি, গঙ্গাস্নান তীর্থযাত্রা, চড়ক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেঁটুপূজা, মনসা শীতলা, ষষ্ঠী সুবচনী, পানাপুকুর ভাঙ্গা বেড়া, খাল বিল, খানা নর্দমা, ও গোবর, ভাগাড় আস্তাকুঁড়, ক্ষেত খামার, বাগান বাঁশবন,—কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই।"[১]

সমাজে নানা শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকরো ছবি, স্থানীয় ঘটনা, প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথা এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে বহু প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে— এরই কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যেতে পারে:

সমাজে ব্রাহ্মণের লোভ, মূর্খতা ও অনাচার নিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ প্রবাদ হল:

ক. উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে।

খ. বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

গ. কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা।

পূজা করলেই ব্রাহ্মণ হয় না।

বোষ্টম-বৈরাগী সম্পর্কে তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ প্রবাদ:

ক. মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।

খ. তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।

প্রবাদে সতিন সম্পর্কে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে:

সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলেও তুলে থো।

অর্থাৎ সতিন বিশ্বাসযোগ্য হয় না কোনওদিন। প্রবাদটিতে সতিনের প্রতি তীব্র বিষোদ্গার প্রকাশিত হয়েছে।

নারীর জীবনে বৈধব্য এক বিরাট বেদনাময় অভিজ্ঞতা। বিধবা নারীকে সমাজে নানা সংস্কার ও প্রথা মেনে চলতে হয়, না মানলে তার জীবনে নেমে আসে নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তি:

একে রাঁড়ের ভাত, তায় মুসুরের ডাল।

বিধবার মুসুর ডাল খাওয়া নিষেধ, অথচ বিধবার রান্না করা অন্নে মুসুরের ডাল অর্থাৎ অসম্ভব প্রাপ্তি।

বৈদ্যের আনাড়ি চিকিৎসার প্রতিও বিদ্রূপ করা হয়েছে প্রবাদে—

এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ।

বাইরে ফুটানি, ভিতরে ফাঁকা, মিথ্যা আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবাদও সমাজে প্রচলিত। যেমন—

বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা।

আবার, চাকুরিজীবী মানুষ সম্পর্কে তাচ্ছিল্য করে বলা হয়েছে:

কুকুরের ওজর আছে ত চাকুরের ওজর নেই।

অর্থাৎ চাকুরিজীবী মানুষের স্বাধীনতা নেই।

ধোপা সম্পর্কে রসিকতা ও বিদ্রূপে ভরা একটি প্রবাদ হল:

যার ফাটে তার ফাটে ধোপার তাতে কী।

অর্থাৎ ধোপার আছাড়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গেলে, ধোপার ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় জামাকাপড় যার, তার।

সেকরা সম্পর্কে বলা হয় সে নিজের লোকের গয়না গড়তেও সোনা চুরি করে। স্বর্ণকার বা সেকরা চরিত্র সম্পর্কিত প্রবাদে এ ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

সমাজে চোরেরও অভাব নেই। চোরকে যত ভাল কথা শোনানো হোক না কেন সে চুরি করবেই— তেমনই একটি প্রবাদ হল:

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

মাতালের কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একটি প্রবাদে মাতালের আবির্ভাব ঘটেছে:

মাতাল দাঁতাল শিঙে
বিশ্বাস নেই এই তিনে।

অর্থাৎ মাতাল, দাঁতাল ও শিং বিশিষ্ট জন্তুকে কখনওই বিশ্বাস করা যায় না, হিংস্রদের বিশ্বাস নেই। সমাজে এ ধরনের বিবিধ মানুষ, প্রথা, আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে।

॥ পাঁচ ॥

পারিবারিক সম্পর্ক-আশ্রিত

বৃহত্তর সমাজজীবন অপেক্ষা বাঙালির ক্ষুদ্রতর পারিবারিক জীবন গভীরভাবে বাংলা প্রবাদে স্থান লাভ করেছে। কারণ অধিকাংশ প্রবাদই পারিবারিক জীবনের নানা সম্পর্কে জড়িত আত্মীয়-স্বজনের চরিত্র অবলম্বনে রচিত। প্রবাদের লক্ষ্য প্রধানত এঁরাই। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিয়েই বাঙালির পরিবার গঠিত। বাঙালির এই পারিবারিক জীবনে নানাজনের সঙ্গে নানা সম্পর্ক জড়িত এবং সেই সম্পর্ক কখনও জটিল, আবার কখনও বা নিতান্ত সহজ-সরল ও মধুরতায় পূর্ণ। অপরপক্ষে পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। তবে সব আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক আবার সমান নয়—অম্লমধুর, ভালয়-মন্দয়—কারও সঙ্গে মন্দ, আবার কারও সঙ্গে বা মধুর সম্পর্ক থাকে। বাঙালির এই নানা সম্পর্ক বিজড়িত পারিবারিক জীবন অবলম্বনে বহু প্রবাদ রচিত হয়েছে। আবার অনেক সময় প্রবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালি পরিবারের আত্মীয়তার সহজ-সম্পর্ক নিয়েও যেমন জটিলতার জট পাকানো হয়েছে,

তেমনই আবার জটিল সম্পর্ক নিয়েও সহজভাবে প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

বাঙালি কেবলমাত্র পরিবারের ক'জনকে নিয়েই নয়, নানা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভালবাসে। কারণ বাঙালির গার্হস্থ্য পরিবেশ বড় বেশি জীবনমুখী। তার বন্ধনও নানা সম্পর্কে প্রসারিত। প্রবাদের মধ্য দিয়ে পল্লীগ্রামের মানুষ পারিবারিক জীবনে প্রতিটি মানুষের বিশিষ্টস্থান কীরূপ তা কখনও সহজভাবে এবং কখনও তীব্র শ্লেষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছে। তাই বাঙালির পারিবারিক জীবনের অতিপরিচিত এইসব মানুষেরা প্রবাদের মধ্য দিয়ে জীবন্তভাবে রূপায়িত হয়েছে।

বাবা: পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে বাবার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাই পারিবারিক জীবনে বাবার কথা প্রথমেই মনে আসে। কারণ বাবা হলেন সংসারের সর্বপ্রধান কর্তা। অথচ প্রবাদে টাকা-পয়সার ব্যাপারে বাবাকেও অবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে:

বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে।

মা: বাংলা প্রবাদে উল্লিখিত পারিবারিক চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই যে চরিত্রটির কথা বলতে হয় সেটি হল মায়ের চরিত্র। বাংলা ছড়ায় যেমন মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়েছে, বাংলা প্রবাদেও মা সম্পর্কে সেই একই মানসিকতা। প্রবাদে মায়ের প্রশস্তিকীর্তন শোনা যায়। যার প্রভাব সন্তানের ওপর সর্বাধিক কার্যকরী। তাই বলা হয়:

মা গুণে পোয়া, ভুঁই গুণে রোয়া।

মায়ের সঙ্গে পিতার কথাও বলা হয়েছে প্রবাদে—

বাছার গুণে ঘুম আসে না, কর কত লীলা।
বাপের গলায় শেকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা।

পারিবারিক জীবনের বা গৃহধর্মের সবচেয়ে বড় অবলম্বন বা কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হল মা। তাই তো সংসারে মায়ের স্থান সবার উপরে। প্রবাদের মধ্যে মায়ের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রবাদে মায়ের প্রশস্তিকীর্তন শোনা যায় যেখানে:

ক. মায়ে মারে, মা বলেই কাঁদে।

মায়ের হাতে মার খেয়েও মা বলেই কাঁদে। মায়ের কাছে সন্তান এমনই অসহায়।

খ. কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন ॥

মাসি-পিসি ও বৃন্দাবনের চেয়ে মা বড। তুলনার মাধ্যমে মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত।

গ. মা নেই যার, বিফল জনম তার।

ঘ. অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।

অর্থাৎ মায়ের স্নেহ অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মতোই শীতল।

ঙ. মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙ্গে না।

মায়ের স্নেহ-মমতা এবং মহিমার কথা এইভাবে প্রবাদগুলিতে উজ্জ্বল বাৎসল্যরসে প্রকাশিত।

ভাই-বোন: পরিবারে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কটি কারও অজানা নয়। ভাই-বোনের এই সহজ সম্পর্কটি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদে:

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান ॥

মাসি ও পিসি: প্রবাদে মাসি এবং পিসিও স্থান পেয়েছে। প্রবাদে মাসির চাইতে পিসির প্রতি বেশি টান বা আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। প্রবাদে তাই বলা হয়েছে:

ক. বাপের বোন পিসি ভাত কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসি কাদায় ফেলে ঠাসি ॥

প্রবাদে মাসির পুরুষালি ভাবকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে:

খ. মাসির গোঁফ থাকলে মামা হত।

এ মাসি কিন্তু আপন নয়। বাঙালির সমাজ-কাঠামোয় কোনও-না-কোনও পাতানো সম্পর্ক সম্বোধনে কথাবার্তা চলে। বাসে, ট্রামে, ট্রেনের ভিড়ে যেমন 'দাদা', তেমনি বাজারে মহিলা বিক্রেতাকে 'মাসি' সম্বোধনে কথাবার্তা চালায় ক্রেতা। এখানে সেই পাতানো 'মাসি'র কাল্পনিক গোঁফের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাসির মেজাজ দারোগার মেজাজের তুল্য।

কন্যা : পরিবারে কন্যার স্থান বা মর্যাদার প্রসঙ্গ প্রবাদে বিধৃত হতে দেখা যায়। যেমন,

ক. দশ পুত্র সম কন্যা যদি কন্যা পাত্রে পড়ে।

খ. মেয়ে মানুষ পরের ভাগ্যে খায়।

অর্থাৎ মেয়েরা অধিকাংশই পরনির্ভর (বিয়ের পর বিশেষ করে)।

গ. মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

ঘ. মেয়ের বিয়ে না কালীপুজো।

ঙ. যাচা কন্যা কাচা কাপড় ছাড়তে নেই।

বধূ: বাঙালি সংসারে বধূর স্থান অত্যন্ত বিতর্কিত। যে কন্যা বাপের বাড়িতে একরকম আদর পায়, সেই কন্যারই শ্বশুরবাড়িতে স্থান বা আদর অন্যরকম। অর্থাৎ কন্যার ক্ষেত্রে যা গ্রহণযোগ্য, বধূর ক্ষেত্রে তা নয়। বধূ যখন তার স্বামীর কাছে আদরণীয় হয় তখন শ্বশুরবাড়িতে বিদ্রূপ ও সমালোচনার পাত্রী হয়ে ওঠে। বউ সম্পর্কে শাশুড়ির বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গোক্তি প্রবাদের মধ্যে ধরা পড়ে। যেমন—

ক. পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
আর উনোনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায় ॥

কন্যার প্রশংসা, বউয়ের নিন্দা প্রসঙ্গে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

খ. বউটি ভালো বটে, টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।

গ. বউ নয় রে, বউ নয়—গরল ডাকিনী।
দিনের বেলা মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী।

ঘ. বউয়ের চলন-ফেরন কেমন? না, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন? না, শালিখ কেঁকায় যেমন।

ঙ. ঝি নষ্ট ঠাটে-বাটে, বউ নষ্ট ঘাটে-বাটে।

শাশুড়ি: বউয়ের সঙ্গে শাশুড়ির মধুর সম্পর্কের চেয়ে তিক্ত সম্পর্কই অধিক। বিশেষ করে পুত্র যদি বউয়ের পক্ষে থাকে, তা হলে শাশুড়ির দুঃখ-ক্ষোভ জমে প্রতিহিংসার রূপ নেয়। এ ধরনের নানা মানসিকতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় প্রবাদে। যেমন—

ক. বউমা, ক্ষীর রইল খাবে,
খাবে তো যমের বাড়ি যাবে।

এখানে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশ্যে ক্ষীরের কথা বলা হয়, জনান্তিকে উদ্দেশ করে যমের বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

খ. কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নির পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই ॥

—সংলাপধর্মী নাটকীয়তার লক্ষণ ধরা পড়েছে।

গ. মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলার চন্দ্রহার।

—স্ত্রৈণ পুত্রের মানসিকতা বা আচরণের প্রকাশ।

ঘ. পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে
দুই চক্ষে জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

ঙ. বউয়ে পিন্দে পাটের শাড়ি
হাউড়ির (শাশুড়ি) গলায় কেঁথা।

ননদ: বাঙালি পরিবারে ননদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিবারে ভ্রাতৃবধূর প্রতি ননদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের পরিবর্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। ননদ বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যে কখনও লক্ষ করা যায় ভ্রাতৃবধূর প্রতি ননদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের মনোভাব, আবার কখনও ভ্রাতৃবধূর দ্বারা ননদ অপমানিত বা অবহেলিত। তাই ননদ ও ভ্রাতৃবধূ উভয়ের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় তীব্র শ্লেষ, কটাক্ষপূর্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা প্রবাদ। এ ধরনের কয়েকটি প্রবাদকে বেছে নিয়ে তার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে:

ক. ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী।

ননদিনী শাসনপ্রবণা এবং হিংস্র স্বভাবের। ননদিনীর প্রতি বধূর তাই ভীতির অন্ত নেই।

খ. জা জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ি মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর ॥

গ. দাদার ভাত, বউয়ের হাত।

ঘ. বাপ কাঁদে, মা কাঁদে, আছাড়-বিছাড় খেয়ে।
ভায়ের বউ অভাগী কাঁদে চোখে মরিচ দিয়ে ॥

—মায়াকান্না প্রসঙ্গে উচ্চারিত।

ঙ. ভাইয়ের বউয়ের বাপের বাড়ি দাসদাসী খাটে।
সেই গরবে (ধনের গৌরব গর্ব) বৌ কেবল বুক ফুলিয়ে হাঁটে ॥

চ. ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে ॥

জল আনতে গিয়ে ননদকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে, অথচ এই কথাটা খেয়ে আঁচাবার সময় ভ্রাতৃবধূর মনে পড়ল, আগে একবারও মনে পড়ল না—এহেন অবহেলাজনিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে শেষোক্ত প্রবাদটিতে।

সতিন: বাংলায় একসময় বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকায় সতিন সমস্যা ছিল। সতিনের ঘর করা যে কতটা কষ্টের তা নারীই জানে। স্বামীর ঘরে যখন আর একজন স্ত্রী থাকে বা তার আগমন ঘটে তখন সতিনের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ,

প্রতিহিংসাজনিত কটূক্তির প্রকাশ ঘটে প্রবাদে। সপত্নীবিদ্বেষজনিত বহু প্রবাদ শোনা যায়। যেমন—

ক. একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল, আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর ॥

সতিনের কদর এবং নিজের অবহেলিত অবস্থার প্রদর্শন।

খ. সুয়োর সোনার দুধের বাটি, দুয়ো মাগের ওচলা মাটি।

গ. সাত সতীনে নড়িচড়ি, বেড়ার আগুনে পুড়ে মরি।

ঘ. ছোট মাগ পাটরানী, বড় মাগ ধানভাজানি।

—সংসারে বড়র চেয়ে ছোট বউয়ের আদর বেশি অর্থে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

ঙ. সুয়ো হল রাজরানী, দুয়ো হল ঘুঁটেকুড়ুনি।

শিশুকন্যা ও শিশুপুত্র: পরিবারে শিশুকন্যা ও পুত্র বড় আদরের। কিন্তু পুত্রের তুলনায় কন্যার আদর কম—এই মনোভাব থেকেই কতগুলি প্রবাদ শোনা যায়। যেমন,

ক. সাতজন্মে পাপ করলি,
মেয়ে জন্মে তবে এলি।

খ. ছেলে শিখবে লেখাপড়া,
মেয়ে শিখুক রান্নাবাড়া।

গ. পুত্র সব সম্পদ, কন্যা সব আপদ।

ঘ. ছেলেরা হীরের আংটি,
মেয়েরা মাটির কলসী।

—পুত্রকামনাই যে সমাজের প্রাচীন মানসিকতা তার পরিচয় প্রবাদটিতে পাওয়া যায়।

ঙ. ছেলে বিয়োলে স্বর্গবাস,
মেয়ে বিয়োলে নরকবাস।

—পুত্র ও কন্যার মধ্যে এহেন পার্থক্য সমাজে প্রচলিত আছে যা প্রকৃতই নিন্দার্হ।

শাশুড়ি-বধূ: আগেই বলা হয়েছে যে বাঙালির পরিবারে সবচেয়ে বিতর্কিত ও জটিল সম্পর্ক শাশুড়ি-বধূর। একে অপরকে যেন সহ্য করতে পারে না। এ ধরনের বহু প্রবাদ আজও শোনা যায় উভয় তরফ থেকেই। যেমন বধূর আচরণ সম্পর্কে শাশুড়ির নিন্দনীয় উক্তি—

ক. একে বউ নাচনি, তায় খেমটার বাজনি।

পুত্রকে সন্তুষ্ট রাখতে শাশুড়ি পুত্রবধূকে সেবা করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, প্রবাদের মধ্যে বলেন:

খ. কলায় দলা, হলুদে ছাই
বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।

স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি শাশুড়ির ক্ষোভ আছে বলেই শাশুড়ি বউ-সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন:

গ. কী করবে পুতে?
কানভাঙানির কাছে সে যে নিত্যি যায় শুতে।

আবার, সংসারে বউয়ের কাছে শাশুড়ি, ননদ ও অন্য কেউ অবাঞ্ছনীয়, তাই বউ গর্বিতভাবে বলে:

ঘ. একলা ঘরের গিন্নি হব,
চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।

শাশুড়িও কিছু কম যায় না। বধূর বাপের বাড়ি গরিব বলে বউকে ব্যঙ্গ করতেও পিছপা নয়, যেমন:

ঙ. ঘুঁটে কুড়ুনির বেটি পেলে রাজপুত্তুর বর,
মুড়ি-মুড়কি দেখে বলে—কোন গাছের ফল?

ননদ ও ভ্রাতৃবধূ: ননদ ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে পারস্পরিক বিরূপতার মনোবৃত্তি থেকে বহু প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ভ্রাতৃবধূ যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়, তবে

সে বিষয়ে তীব্র কটাক্ষ করতেও ছাড়ে না ননদিনী। যেমন:

ক. বউয়ের পাঞ্জা ভারী, পা গোদা,
বউকে কিছু বোলো না দাদা।

আবার ভ্রাতৃবধূকে ভাই যদি শাসন বা প্রহার না করে তবে ননদ বিদ্রূপ করে বলে:

খ. দাদা কি বউ মারে?
গামছার বাড়ি মেরে তামাশা করে।

'গামছার বাড়ি' অর্থে লোকদেখানো প্রহারের কথা প্রবাদটিতে বলা হয়েছে।

ভাশুর-শ্বশুর: বাঙালি পরিবারে স্বামী, শাশুড়ি, ননদ প্রভৃতি ছাড়াও আছেন ভাশুর-শ্বশুর। তবে ভাশুর-শ্বশুর বিষয়ক প্রবাদের মধ্যে বিদ্রূপের সুর ননদ-শাশুড়ির তুলনায় অনেক কম। এই ধরনের প্রবাদের মধ্যে ব্যঙ্গ-শ্লেষের পরিবর্তে বরং রঙ্গ-রসিকতার প্রকাশ ঘটে। যেমন:

ক. ভাশুর ঠাকুরের কোলে মাগ নেই,
সেই ভাবনায় আমার ঘুম নেই।

আবার বেকার ভাশুর সম্পর্কে একটু শ্লেষও কখনও কখনও প্রকাশ পায়। যেমন:

খ. নিষ্কর্মা ভাশুরের বচন মিঠা,
নিত্য বসে খান চিকন পিঠা।

ভাশুর ও শ্বশুরকে নিয়ে রসিকতাপূর্ণ প্রবাদেরও অভাব নেই। যেমন:

গ. শোনো শ্বশুর, শোনো ভাশুর বলি তোমাদের পায়ে,
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায়ে।

জামাই: বাঙালি পরিবারে জামাই সম্মানিত ও আদরণীয় হলেও কখনও কখনও সমালোচিতও হয়ে থাকে। যেমন—

ক. জামাইয়ের তরে পিঠা বানাই,
এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

খ. জামাইয়ের নামে মারে হাঁস,
গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস।

গ. মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

আবার জামাইকে নিয়ে ব্যঙ্গও করা হয়। যেমন:

ঘ. যাচলে জামাই খান না কোষ,
শেষকালেতে ভুতি চোষ।

জামাই আদরণীয় হলেও ঘরজামাইয়ের কপালে জোটে অসম্মান ও অনাদর। যেমন:

ক. ঘরজামাই আধা চাকর, সর্বলোকে বলে,
বাপ-দাদার নাম নেই, ফলনার জামাই বলে।

খ. দূর জামাইয়ের মাথায় ছাতি,
ঘরজামাইয়ের মুখে লাথি।

গ. ঘরজামাইয়ের পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

ঘ. যা ছিল আমানি-পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুখাতে দিনু।

ঙ. শ্বশুর বাড়ির সুখ বড়,
ঘর জামাই কিলে দড়।

এহেন আত্মীয়, অনাত্মীয় ও কাছের মানুষদের নিয়েই বাঙালির পরিবার। পরিবারে সুখ-শান্তি, অশান্তি যেমন আছে, তেমনই আছে পরিবারের মানুষদের সম্পর্কে বিবিধ মনোভাব থেকে সৃষ্ট তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ জনিত অসংখ্য প্রবাদ।

॥ ছয় ॥

মানবদেহ সম্পর্কিত

মানবদেহের ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আদিম যুগ থেকেই মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। তাই পুরাকাল থেকেই এই বিষয়ে বহু প্রবাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই ধরনের প্রবাদগুলি কখনও মানবদেহের বিভিন্ন অংশ অবলম্বনে রচিত হয়। বলা যায় যে সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই কায়াগঠনের বিভিন্ন উপাদান ও প্রত্যঙ্গাদি নিয়ে প্রবাদগুলি রচিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

মাথা: মাথাকে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন অর্থে অনেক প্রবাদ শোনা যায়। যেমন—

ক. ছোটলোকের কথা, কচ্ছপের মাথা।

—যে ভয়ে নিজেকে লুকায় অর্থাৎ যার কথার দাম নেই।

খ. মাথার উপর ছড়ি ঘুরানো।

অর্থাৎ অন্যের উপর খবরদারি করা।

গ. মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।

—অকারণ দুশ্চিন্তা।

ঘ. টোকা পানা মাথাটি, খালুই পানা পেটটি।

—মাথা টোকার মতো, পেটটি জেলেদের মাছ ধরার বাঁশ নির্মিত পাত্রবিশেষ।

ঙ. মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড়।

—চূড়ান্ত অপমান করে শ্রদ্ধার ভাণ করা।

চোখ: চোখ মানুষের অপরিহার্য অঙ্গ। চোখ ছাড়া মানুষ একেবারে দেখতে পায় না। চোখ-কেন্দ্রিক বহু প্রবাদ রচিত হয়েছে। যেমন:

ক. চোখে সরষে ফুল দেখা।

—বিপদে পড়ে দিশাহারা হওয়া।

খ. চোখে ধুলো দেওয়া।

—দৃষ্টি এড়িয়ে ফাঁকি দেওয়া।

গ. চোখে ধোঁয়া দেখা।

—বিব্রত বোধ করা।

ঘ. চোখ চায়, সে পায়, চোখ বোজে, সে হারায়।

—বেঁচে থাকলে সব পাওয়া যায়, মরে গেলে সবই শেষ।

ঙ. চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নিরবধি।
মন্দভাবে চাও, চোখের মাথা খাও।

—ভালভাবে দেখার জন্য চোখ, মন্দভাবে কু-দৃষ্টি নয়।

কান: কান মানুষের আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শ্রুতিকর্মটি কানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কান কথাটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে:

ক. কান কামড়ানি, মাথা ব্যথা, ছেপ তলায় না।
আধফোটা চালের ভাত, একটি এড়ায় না।

—অসুস্থ ব্যক্তির অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার বাসনা বা লোভ প্রসঙ্গে প্রযুক্ত।

খ. কান শুনতে ধান শোনা।

—এক শুনতে আর এক শোনা।

গ. কান টানলে মাথা আসে।

—এক বিষয়ে চাপ দিলে অন্য বিষয়ও আয়ত্তে আসে।

ঘ. কান যায় যথায়, মন যায় তথায়।

—একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ থাকা বিষয়ে প্রযোজ্য।

ঙ. কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।

—প্রতিবাদ না করে অত্যাচার সহ্য করা।

নাক: নাককে কেন্দ্র করেও বহু প্রবাদ রচিত হয়েছে। মানবজীবনে ঘ্রাণেন্দ্রিয়র গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রবাদ:

ক. নাক নেই বেটীর নথের সখ,
ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক।

—বোঁচা নাক প্রসঙ্গে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

খ. নাকের ডগে রসকলি, তুই কৃষ্ণভক্ত কবে হলি।

—ব্যঙ্গার্থে প্রবাদটি প্রযোজ্য অর্থাৎ ভণ্ড তপস্বী।

গ. নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশি।

—আসল জিনিসের চেয়ে, অন্য জিনিসকে বড় করে দেখা।

ঘ. নাক নেড়ে কস্‌নি কথা,
ভাঙবে নথের সুযনি পাতা।

—অর্থাৎ বেশি ফরফরানি ভাল নয়।

ঙ. নাক-কাটী নাক-কাটী, করো নাকো রোষ।
সব নাক-কাটীর আছে কিছু কিছু দোষ।

—সব নাক-কাটীরই অর্থাৎ লজ্জার মাথা খাওয়া বা সম্মান হারানো সব মহিলারই দোষ আছে, তাই আলাদা করে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।

মুখ: মানুষের মুখ তার দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুখ কথাটি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য শোনা যায় প্রবাদের মধ্যে:

ক. খাওয়া মুখেতে মুগের ডাল,
খাবু আর পারবু গাল।

—ভরা পেটে খাবার খেয়ে গাল দেওয়া।

খ.	পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

—অন্যের কথায় বিশ্বাস করে কাজ করা।

গ.	মুখে মধু অন্তরে বিষ।

—মুখ মিষ্টি হলেও পেট বিষে ভরা।

ঘ.	মুখ তুলে চাওয়া।

—সদয় বা প্রসন্ন হওয়া প্রসঙ্গে ব্যবহৃত।

ঙ.	মুখে ফুল চন্দন পড়া।

—আশীর্বাদ করা বা শুভ প্রার্থনা করা।

হাত-পা: হাত পা কেন্দ্রিক প্রবাদ হল:

ক.	কথার হাত পা বাহির করা।

—অর্থাৎ আসল কথা বিস্তৃত করা বা আজগুবি কথা জুড়ে দেওয়া।

খ.	ছেলের মত হাত পা, বুড়োর মত কথা।

অর্থাৎ দেখতে ছোট হলে কী হবে বড়দের মতো কথা বলা।

আঙুল: আঙুল শব্দটি ব্যবহার করেও প্রবাদ শোনা যায়। যেমন —

ক.	আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া।

—হঠাৎ বড়লোক হওয়া।

খ.	আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।

—বাঁকাভাবে কাজ করা।

গ.	সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

—ভদ্র ব্যবহার দ্বারা বশীভূত হয় না, কঠোর হলে তবে লোকে বাধ্য হয়।

কপাল: কপাল সম্পর্কিত প্রবাদও অলভ্য নয়।

ক. মজুরের কপালে খেজুরের চাটাই।

দরিদ্র ব্যক্তির ভাগ্যে কম দামি জিনিসই জোটে।

খ. কপালগুণে গোপাল মেলে।

—ভাগ্যে থাকলে দেবতার দর্শন মেলে।

গ. কপালে আছে বাঁদী, সুখের লাগি কাঁদি।

—ভাগ্য খারাপ হলে সুখের মুখ দেখা যায় না।

ঘাড়: ঘাড় শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় প্রবাদে। যেমন:

ক. উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

—একজনের দোষ অন্যজনের ওপর চাপানো।

খ. পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা।

—অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করা।

দাঁত: মুখগহ্বরের অপরিহার্য প্রত্যঙ্গ দাঁতও প্রবাদে স্থান পেয়েছে। যেমন:

ক. দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

—সময় থাকতে প্রাপ্য বস্তুর সদ্ব্যবহার না করা।

খ. যার পাটা (শিল) তার নোড়া
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

—মালিকের ওপর চড়াও হয়ে তার ক্ষতিসাধন করা।

চুল: মানুষের মুখের সৌন্দর্যবর্ধনকারী চুলও প্রবাদের রাজ্যে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

ক. কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব
চুল নিয়ে কি পেতে শোব।

অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না।

খ. চুল কাটলে হয় ডালে-পালে।
নাক কাটলে নয় কোনও কালে।

—যে জিনিস যেরকম তা সেরকমই করা যায়, অন্যভাবে নয়।

পা: পা ছাড়া মানুষ হাঁটতে পারে না। সেই পা শব্দটিও ব্যবহৃত হতে দেখা যায় প্রবাদে। যেমন—

ক. মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।

—অতিরিক্ত পরিশ্রম করা।

খ. পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়া।

—স্বজনের সমর্থন হারিয়ে আশ্রয়হীন হওয়া।

বুক: বুক-কেন্দ্রিক প্রবাদগুলি হল:

ক. বুকে সাহস নেই, মুখে সাহস।

—ভীত ব্যক্তির মিথ্যা আস্ফালন করা।

খ. বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।

—শত কষ্টেও চুপ করে থাকা।

পিঠ: পিঠ শব্দটি ব্যবহার করেও বহু প্রবাদ শোনা যায়। যেমন—

ক পেটে খেলে পিঠে সয়।

—কোনও কিছুর বিনিময়ে কষ্ট সহ্য করা।

খ. পিঠে কুঁজ চাঁদ দেখার সাধ।

—অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচেষ্টা।

হাত: হাতকে কেন্দ্র করে অনেক প্রবাদ রচিত হয়েছে।

ক. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

—অবহেলা করে সুযোগ হারানো।

খ. এক হাতে তালি বাজে না।

—কারণ ছাড়া কাজ হয় না।

নখ: প্রবাদে হাতের নখও বাদ যায়নি—

নখের ছিদ্রে কুড়ুল লাগানো।

—নখ কাটা গেলে, কুড়ুলের আর প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ কাজ হয়ে গেলে আর অন্য জিনিসের প্রয়োজন হয় না।

॥ সাত ॥

আচার-আচরণ-অভ্যাসমূলক

আমাদের গৃহজীবনে পরিচিত অনেক আচার-আচরণ-অভ্যাসকে অবলম্বন করে বহু প্রবাদ রচিত হয়েছে। প্রতিদিনের সংসারে চলতে ফিরতে মানুষের (বিশেষত নারীর) আচার-আচরণের মধ্যে তার চারিত্রিক বিশেষত্ব-জনিত যে ত্রুটি তাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট প্রবাদের মধ্যে ব্যঙ্গ-শ্লেষ-বিদ্রূপের খোঁচা লক্ষ করা যায়। এই ধরনের প্রবাদগুলি ব্যবহারের সময় উপস্থাপনা ভঙ্গিটি হয় তির্যক:

ক. খটমটিয়ে হাঁটে নারী, কটমটিয়ে চায়
মাসেক খানেক ভিতর তার সিঁথির সিঁদুর যায়।

অর্থাৎ নারীর পুরুষালি আচরণ তার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে ওঠে।

খ. নাচুন্তির (হাগুন্তির) লাজ নেই,
দেখন্তির লাজ।

—নির্লজ্জের লজ্জাহীনতার কথা বলা হয়েছে।

মানব চরিত্র ও স্বভাব বিষয়ক আরও কয়েকটি প্রবাদ:

গ. আমার নাম যমুনাদাসী, পরের খেতে ভালবাসি।

—পরের জিনিসে আসক্তি।

ঘ. আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পরবি কিসে?

—বার্ধক্যের প্রতি ব্যঙ্গ।

ঙ. একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি।

—বউয়ের হুজুগেপনার নিন্দা।

চ. আদর বিবির চাদর গায়
ভাত পায় না ভাতার চায়।

—আবদারের আতিশয্যকে ধিক্কার।

ছ. গাঁ-বেড়ানি ছুতারনী, তোলা জলে স্নান।

—আদিখ্যেতার নিন্দা।

জ. আপনার হাতে পড়ল হাঁড়ি।
ভাত রেখে আমানি বাড়ি ॥

—কৃপণতার নিন্দা।

ঝ. সাত চড়েও রা কাড়ে না।

—মার খেয়েও চুপ করে থাকা।

ঞ. কাকে এলে কি শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।

—অতি চালাকির নিন্দা।

ট. সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

—সময়ের কাজ সময়ে করাই ভাল।

ঠ. কত ধানে কত চাল, গিন্নি বিনে আল্‌থাল্‌।

—বধূর আচার-আচরণ, চাল-চলন সবই শাশুড়ি বক্রদৃষ্টিতে দেখেন। তাই প্রবাদে শাশুড়ির বধূর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায়:

ড. কলাবতী বৌটি আমার কত কলাই জানে,
কলা গাছে নাঙ উঠিয়ে বেগড়ো ধরে টানে।

—বধূর গুণপনার প্রকাশ।

ঢ. কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

—বউয়ের কাজ কম, খাওয়া শোওয়া বেশির প্রতি ইঙ্গিত প্রকাশিত।

ণ. খায়-মাগীর গলা বেশি, না-খায় মাগীর ফোঁপানি বেশি।

—বউ খেলে তার গলার স্বর খুব জোরে হয় এবং যে বউ কম খায় সে শুধু ফোঁপায়—এটাও বউয়ের প্রতি শাশুড়ির খেদোক্তি।

ত. গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে।

—বধূর বড়লোকি চালচলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

থ. বউটি ভালো বটে।
টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে ॥

—শাশুড়ির ধমক খেয়ে বউয়ের বাটনাবাটার কথায় শাশুড়ির উল্লাস-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।

দ বউয়ের গলার স্বর কেমন।
শালিক কোঁকায় যেমন ॥

—বধূর গলার স্বরের সঙ্গে শালিকের কোঁকানোর তুলনা করা হয়েছে ব্যঙ্গার্থে।

ধ. যদি বলে পাকের কথা, তবেই ওঠে মাথার ব্যথা।

—বধূর কর্মবিমুখতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশিত।

ন. বউয়ের চলন ফেরন কেমন।
তুর্কী ঘোড়া যেমন ॥

—বধূর চলন ফেরন ভাল নয়। ভাল হলেও, বধূর হাঁটা-চলাকে শাশুড়ি ব্যঙ্গ করে তুর্কি ঘোড়ার নাচনের সাথে তুলনা করেন।

প.   লাজে বউ হাঁ না করে।
চালতা হেন গেরাস ধরে ॥

—প্রবাদটিতে বধূর খাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

ফ.   কথার দোষে কার্য নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান,
গিন্নির দোষে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যান।

ব.   নেকা, আদুরে, চালশে-কানা,
জল বলে খায় চিনির পানা।

উপরিউক্ত প্রবাদগুলিতে নারীর স্বভাব ও আচরণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে।

॥ আট ॥

গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সম্পর্কিত

আমাদের গৃহজীবনে প্রতিদিনের সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে অনেক জিনিসপত্রের প্রয়োজন। সেইসব জিনিস প্রয়োজনের তাগিদেই ব্যবহার করে থাকে মানুষ। আর প্রবাদ-প্রবচন জীবনঘনিষ্ঠ বলেই সেইসব জিনিসপত্র-কেন্দ্রিক বহু প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে বাংলায়:

কলসি

শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি।

—সারবস্তুহীন ব্যক্তির আস্ফালন।

হাঁড়ি

যেমন হাঁড়ি তেমন সরা।

—যোগ্য পাত্রীর সঙ্গে যোগ্য পাত্রের মিলন। ইংরেজিতে একেই বলে 'মেড ফর ইচ আদার'।

থলি

থলির বিড়াল বের হয়ে পড়া।

—গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়া।

ঢেঁকি

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

—অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়।

মই

পাকা ধানে মই দেওয়া।

—সমাপ্ত কাজ পণ্ড করে দেওয়া।

ছুরি

মুখে রাম নাম, বগলে ছুরি।

—মুখে ধর্মের নাম নিলেও মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা করা।

জুতা

গরু মেরে জুতো দান।

—গুরুতর পাপ করে প্রতিকার স্বরূপ সামান্য দান করে পুণ্য সঞ্চয় করা।

চালুনি

চালুনি বলে, ছুঁচ তোর তলায় কেন ছেঁদা।

—নিজের দোষ ঢেকে রেখে অন্যের দোষ ধরা।

কাঁথা

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

—অবস্থার সঙ্গে সংগতি না রেখে অবাস্তব কল্পনা করা।

চাটাই

মজুরের কপালে খেজুরের চাটাই।

—দরিদ্র শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না।

কুড়াল

নিজের পায়ে কুড়াল মারা।

—বুদ্ধির দোষে নিজের অনিষ্ট নিজে করা।

নরুন

নরুন দিয়ে তালগাছ কাটা।

—যা অসম্ভব ব্যাপার।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে: "নখের রঞ্জিনী নরু নাহি কাটে তাল তরু।"

ছুঁচ

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।

—বন্ধু হিসেবে মিশে পরে শত্রুতা করে—অনিষ্ট করে।

॥ নয় ॥

নিসর্গপ্রকৃতি-বিষয়ক

প্রকৃতি চিরকাল সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে মানবসমাজে আপন সৌন্দর্য বিতরণ করে। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সমগ্র জগৎকে কত কী দান করে যাচ্ছে, দুনিয়ার এক প্রান্তে বসে তার হিসাব করা যায় না। বিচিত্র ও বিস্ময়কর তার রূপ। কোথাও তুষারশুভ্র পাহাড়ের পর পাহাড়—কোথাও অতলান্ত সুনীল জলধি, আবার জঙ্গল যে কী ভয়ংকর অথচ সুন্দর হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি না। হিমপ্রবাহ কিংবা নির্ঝরিণীর আইডিয়া থাকা এক, আর ইচ্ছেমতো সেই

অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে বিধাতার মহিমা অনুভব করা অন্য কথা। নদী, জল আর মাঠসর্বস্ব বাংলাদেশে প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের আস্বাদ আর কোথায় পাওয়া যাবে? তবু এই শ্যামলী বাংলারও এক বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে।

বাংলার এই কোমল মিষ্টি ছবিখানিই যুগে যুগে কালে কালে বাঙালির সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে, ছড়ায়, ধাঁধায় চিরায়ত সম্পদ হয়ে আছে। লৌকিক প্রবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। বাঙালি প্রকৃতিপ্রেমিক এবং বাংলাদেশের প্রকৃতিও চিরসুন্দর। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপমাধুর্য ও বৈচিত্র্য অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বোধহয় কোনও অংশে কম নয়। রূপসী বাংলার সৌন্দর্য কেবলমাত্র সাহিত্যিকের ভাবপ্রবণতার খোরাক জোগায়নি, পল্লীকবির প্রবাদের আসরেও প্রকৃতি তার আপন স্থানটি দখল করে নিয়েছে।

প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. উদ্ভিদ ও লতা-পাতা সংক্রান্ত
খ. আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত

ক. উদ্ভিদ ও লতা-পাতা সংক্রান্ত

বাংলার প্রকৃতি বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক। নানা ফল ও ফুলের সমারোহে বাংলার প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে আছে এ দেশে। বাংলার প্রবাদেও দেখা যায় গাছপালা ও ফল, ফুল অনেকটা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের গাছ, নানারঙের ফুল, বিভিন্ন ধরনের ফল নিয়ে অনেক প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি চিরশ্যামলিম। গৃহ-আঙ্গিনায় মাঠে-ঘাটে গাছপালা, লতা-পাতা ও ফুল-ফলের দৃষ্টান্ত অতি সাধারণ। উদ্ভিদ আমাদের নিত্য সহচর। প্রবাদশিল্পীর দৃষ্টি উদ্ভিদ লোকেও আকৃষ্ট হয়েছে। যেসব গাছপালা আমাদের অতি পরিচিত এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনে মঙ্গলসাধন করে সেগুলি নিয়ে অধিক প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে।

লতা-পাতা, গাছপালা, ফল-ফুল প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবাদ রচয়িতার বাস্তবতাবোধ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকেই প্রবাদগুলির জন্ম। তবুও উদ্ভিদ ও লতা-পাতা সংক্রান্ত প্রবাদগুলি যেমন মানুষের জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তেমনই আবার এই ধরনের প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে অনেকসময় প্রবাদ রচয়িতা তাঁর

অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

আম

ফলের রাজা আম। প্রবাদেও আমের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ক. ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।

—রসালো আমের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে গঙ্গাজলকে উপমিত করা হয়েছে।

খ. আম খাওয়া নিয়ে কথা,
আঁটি নিয়ে কী মাথাব্যথা।

—আসল জিনিসের বদলে অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমড়া

ক. আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

—যা মজবুত নয় অর্থাৎ অপদার্থ—এটি বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত।

খ. আমড়াগাছি করা।

—অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য খোসামোদ করা।

কলা

ক. কলাপোড়া খাও।

—শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কলা পোড়াবার নিয়ম প্রচলিত আছে। শ্রাদ্ধের ইঙ্গিত করে গালি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মর।

খ. কলাবউ।

কলাবউ দুর্গাপূজার নবপত্রিকা। বধূর মতো বস্ত্রাচ্ছাদিত ও অবগুণ্ঠনবতী করে গণেশের পাশে রাখা হয়। কলাবউ লজ্জাশীলা বউ, একথা বিদ্রূপার্থে বলা হয়েছে।

কুল

ক. কুল পাড়ে, পরে খায়
কাঁদতে কাঁদতে ঘরে যায়।

—নিজের পরিশ্রমের ফল অনেক সময় পরে ভোগ করে।

খ. কলা দেখানো বা খাওয়ানো।

—বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত।

কাঁঠাল

ক. কাঁঠাল খেয়ে লাগল আঠা
তেল দিয়ে ঘুচাও লেঠা।

—কাঁঠালের আঠা অল্পে ছাড়তে চায় না।

খ. কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

—একটার সঙ্গে আর একটা মিশ খায় না। অর্থাৎ সোনার পাথরবাটির মতো অসম্ভব বস্তু।

শাক

বোঝার উপর শাকের আঁটি।

—ভারের উপর সামান্য ভারও দুর্বহ হয়।

শাকের পরেই আসে সবজির কথা। বিভিন্ন ধরনের সবজিকে নিয়েও প্রবাদ রচিত হয়েছে।

বেগুন

পান্তা ভাতে নুন জোটে না
বেগুন পোড়ায় ঘি।

—দুঃস্থ ব্যক্তির আচরণ সমালোচিত হয়ে করুণ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

পটল

ভয় পায় না শেখের বেটা, পটল ভাজা খায়।

—গরিবের বড়লোকি ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

লাউ

হাটে বিকায় না যে লাউ
তারে এনেছে নন্দ সাউ।

—পরিত্যক্ত জিনিস ঘরে আনলে নিন্দার ভাগী হতে হয়।

সজনে শাক

সজনে শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা।

—কার্তিক মাসে ভূত চতুর্দশীতে চোদ্দোশাক খাওয়ার রীতি আছে। প্রয়োজনের সময় সজনে শাক পাড়া প্রসঙ্গে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

মুলো শাক

শাককে শাক, উপরি মুলো।

পুঁইশাক

আহাম্মুক দুই, যে পরের চালে তোলে পুঁই।

—শাকের মধ্যে রাজা পুঁইশাক। সেই পুঁইশাককে অন্যের চালে তুললে অন্যের ভোগে যায়। এ হল মূর্খতা।

প্রকৃতির অকৃপণ দানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন অভাব নেই, তেমন সেই সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নানা সময়ে ফোটা হরেকরকম ফুলের ভূমিকাও নেহাত কম নয়। ফুলকে নিয়ে নানা প্রবাদ রচিত হয়েছে। যেমন—

গোলাপ

গোলাপ বাগে কুকুর শোঁকা।

—গোলাপ বাগিচায় কুকুর শোঁকা (কুকুরমুখো) গাছ বেমানান।

পদ্মফুল

গোবরে পদ্মফুল।

—যেটা অসম্ভব, সেটাও কখনও সম্ভব হয়—এই অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

চাঁপাফুল

চাঁপাফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

—চাঁপাফুলের সুন্দর গন্ধে যেমন ভ্রমর-প্রজাপতি তার কাছে যায়, তেমনি জামাতা শ্বশুরবাড়ি যায় সুন্দরী পত্নীর রূপ-যৌবনের আকর্ষণে। উভয়ের তুলনার্থে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

গাছ

ক. বড় গাছেই ঝড় লাগে।

—অর্থাৎ কর্তা ব্যক্তিকেই বিপদ আপদের দায় ভোগ করতে হয়।

খ. গাছে তুলে মই টেনে নেওয়া।

—অর্থাৎ প্ররোচনা দিয়ে কঠিন কাজে জড়িয়ে ফেলে পরে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করা।

খ. আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত

মাথার উপরে দিগন্তবিস্তারী অসীম আকাশ চিরকালই মানবমনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তার বুকে অজস্র গ্রহ-নক্ষত্র অপার রহস্য নিয়ে যুগে যুগে কাব্য-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। প্রতিদিনই মানুষ কিছু-না-কিছু গ্রহ-নক্ষত্র আকাশে দেখতে পায়। পৃথিবীর ঋতু বদলের নানা রং কবিদের আবিষ্ট করে। পরিচিত ও অপরিচিত গ্রহ নক্ষত্র প্রবাদে স্থান পেয়েছে। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে

সবচাইতে পরিচিত হচ্ছে চন্দ্র-সূর্য-তারা। এছাড়া সূর্যের কিরণ, চাঁদের জ্যোৎস্না, তারার সৌন্দর্য ও আকৃতি, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ প্রভৃতি কোনও কিছুই বাদ যায়নি।

এছাড়া আরও অনেক প্রাকৃতিক বিষয় আছে যা মানুষের অতিপরিচিত, তাকে নিয়ে আদিম যুগ থেকে মানুষের যেমন কৌতূহলের শেষ নেই, তেমনি প্রবাদ রচয়িতার এই সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই। এই ধরনের প্রবাদগুলি হল কুয়াশা আলো আঁধার দিনরাত্রি আগুন ছায়া মেঘ ঝড় বৃষ্টি বাজ শিল জল বাতাস ঘূর্ণি সাগর নদী পর্বত বরফ ভূমিকম্প মাটি শিশির শীত প্রভৃতি। এইগুলি সমস্তই সূর্য ও তার কিরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাকৃতিক নিয়মে যা যা ঘটে বা সৃষ্টি হয় তার অনেক বিষয়ই প্রবাদ রচয়িতার মনে যে কত সহজভাবে স্থান করে নিয়েছে তা প্রবাদগুলির মধ্য দিয়েই বোঝা যায়।

আগুন

বেণীর আগুন হাতে লাগা।

—অর্থাৎ পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটা।

মেঘ ও জল

মেঘ না চাইতে জল।

—অপ্রত্যাশিতভাবে ফল লাভ হলে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

নদী

খর নদীতে চর পড়ে না।

—গতিশীল কাজে কোনও কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

সমুদ্র

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা,
শিশিরে কি ভয়?

—যে বড় আঘাত পেয়েছে, সে ক্ষুদ্র আঘাতে বিচলিত হয় না।

পর্বত

আকন্দে যদি মধু পাই,
তবে কেন পর্বতে যাই।

—হাতের কাছে সুবিধা পেলে কেউ আর দূরে যেতে চায় না।

চাঁদ

ক. চাঁদ-কপালে দীর্ঘ ফোঁটা,
মুখে তার সরষে-বাটা।

—অর্থাৎ প্রিয়দর্শন, কিন্তু রুক্ষস্বভাবের ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রবাদ।

খ. চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা,
ঢাকের কাছে টেমটেমি।

—অর্থাৎ মহতের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্রের সমাদর হয় না।

রোদ-বৃষ্টি

ক. রোদ হয় বৃষ্টি হয়,
শিয়াল কুকুরের বিয়ে হয়।

—দুটি বিপরীত প্রাকৃতিক ব্যাপার একই সঙ্গে ঘটতে দেখলে অন্য একটা বিচিত্র ঘটনার কল্পনা করা হয়।

খ. রোদের বেলা হেলায় যায়,
বৃষ্টির বেলা ঘর ছায়।

—অবহেলায় সুযোগ নষ্ট করে পরে অসুবিধার মধ্যে কাজ করা অর্থে প্রযোজ্য।

॥ দশ ॥

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত

প্রবাদে কৃষিকর্ম সংক্রান্ত বিষয় উপস্থিত হয়। বিশেষত খনার বচনে বহু কৃষি বিষয়ক প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এর সঙ্গে শুভাশুভ দিন যুক্ত থাকে। কৃষিকর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবাদ হল:

ক. লঙ্কা পুঁতো গুড়ো, বেগুন পুঁতো বুড়ো।

—প্রবাদটিতে বলা হয়েছে লঙ্কাগাছ ছোট অবস্থায় পোঁতা ভাল, আর বেগুনের চারা বড় পোঁতা ভাল।

খ. নারকেলের গোড়ায় মাটি,
সুপারির গোড়া কাটি।

—অর্থাৎ নারকেল গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, আর সুপারি গাছের গোড়া কাটতে হয়। আবার চাষের জমি কীরূপ হবে তাও বলা হয়েছে। যেমন,

গ. চার আল উঁচু, মাঝখানে নিচু।

—কোন সময় কী চাষ করতে হবে সে কথাও প্রবাদে শোনা যায়, যেমন,

ঘ. পুবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে কলা দক্ষিণে খোলা।

ঙ. ওল পুঁতে দোল দেখো।

॥ এগারো ॥

খাদ্যবস্তু-বিষয়ক

বাঙালির ভোজনপ্রিয়তার কথা কারও অবিদিত নয়। খাদ্যরসিক বাঙালি শুধু খেয়েই তৃপ্ত নয়, কোন বস্তুর সঙ্গে কোন উপকরণের সংযোগ ঘটলে রান্নাটি

মুখরোচক হয়ে উঠবে তাও সে জানে। বাঙালির এই ভোজনরসিকতার পরিচয় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'নিদয়ার সাধভক্ষণ' এবং 'কালকেতুর ভোজন পর্ব' অংশেও পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বর গুপ্তের বহু কবিতাতেও বাঙালির লোভনীয় রসনাবিলাসের পরিচয় আছে। বাংলার গার্হস্থ্য জীবনে খাদ্যবস্তুর প্রয়োজনীয়তার কথা প্রবাদস্রষ্টা অস্বীকার করতে পারেননি। এজন্য খাদ্যের তালিকায় ভাত মাছ মাংস ডিম চিঁড়ে বিভিন্ন ধরনের ফল, দুধ ইত্যাদির যে একটা বিশেষ স্থান আছে তার প্রতিও প্রবাদ রচয়িতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আবার বিভিন্ন ব্যঞ্জন সহযোগে নানা ধরনের রান্নাও কেমন মুখরোচক হয় সে সম্বন্ধেও তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন। এই ধরনের প্রবাদের মধ্য দিয়ে অজ্ঞাত সেই প্রবাদ রচয়িতার বাস্তববোধ, গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির ও রসিক মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে সহজ অথচ কবিত্বপূর্ণ ভাষায়।

মুরগি

এক মুরগী কবার জবাই?

—এক জিনিস বারবার প্রকাশ করা অর্থে ব্যবহৃত।
অর্থাৎ একটা প্রাণীকে বারবার পীড়ন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

লেবু

লেবু চটকালে তিতা হয়।

—অর্থাৎ অতিরিক্ত পীড়নে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কলা

রথ দেখা কলা বেচা।

—উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হওয়া।

কৈ (মাছ অর্থে)

কেউ মরে বিল ছেঁচে;
কেউ খায় কৈ।

—একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে।

ঘি

ভাঁড়ে নাই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

—ভেতরে সার বস্তুর অভাব অথচ তা দেখাবার বৃথা চেষ্টা।

খই

নেই কাজ তো খই ভাজ।

—প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় কর্মে শক্তি নাশ করা।

চিঁড়া

মিঠা (মিষ্টি) কথায় চিঁড়া ভেজে না।

—কেবল কথার চাতুরিতে কাজ হাসিল করা যায় না।

ঘোল

দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।

—উন্নত মানের বস্তুর অভাব নিকৃষ্ট মানের দ্বারা মিটানো।

জল

সাত ঘাটের জল খাওয়া।

—নানা স্থানে ঘুরে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

দুধ

দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা।

—অতি ভয়ংকর মানুষকে আদর দিয়ে পালন করলেও ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

দই

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।

—অনেক পেয়েও যার আশা মেটে না।

নুন

নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

—কোনও কাজের উদ্যোগ নিতে নিতে কাজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া।

॥ বারো ॥

পশুপাখি-কীটপতঙ্গ-প্রাণী-বিষয়ক

প্রাণীজগতে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। স্থল-জল-অন্তরীক্ষ—সর্বত্রই অসংখ্য পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, প্রাণী বাস করে। প্রাত্যহিক জীবনে পরিচিত-ই শুধু নয়, অনেক অপরিচিত পশুপাখি-কীটপতঙ্গ প্রবাদের রাজ্যে এসে ভিড় করেছে। এই ধরনের প্রবাদে রূপকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণীর বর্ণনায় প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। আবার প্রাণীকুলে এই পরিচিতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবন পশু-পক্ষী-প্রাণীজগতের সঙ্গে বাঁধা। প্রকৃতির নিয়মে কেউ-ই কাউকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। জীবন রক্ষার তাগিদে মানুষ অনেক প্রাণীকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত জীবে পরিণত করেছে। জীবনচর্যার নিত্যসঙ্গী এই পশুপক্ষীরা তাই অনিবার্যভাবেই প্রবাদে ঠাঁই করে নিয়েছে:

গরু

গরু না বিয়োতেই ঘিয়ের সর।

—একটির সূত্রে অপরটির আগাম প্রত্যাশা।

কুকুর

কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।

—সবার সব কিছু সহ্য হয় না।

বিড়াল

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া।

—ভাগ্যক্রমে ঈপ্সিত সুযোগ মেলা।

বাঘ

যেখানে বাঘের ভয়,
সেখানে সন্ধ্যা হয়।

—যাকে বা যে বিষয়ে ভয় করে চলা হয়, তাই যখন উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হয় সে প্রসঙ্গে প্রবাদটি রচিত।

শিয়াল

শিয়াল বাংলাদেশের এক পরিচিত জীব। শিয়ালকে নিয়ে নানা প্রবাদ আছে। যেমন:

বনগাঁয় শেয়াল রাজা।

বানর

বানরের গলায় মুক্তার মালা।

—কোনও মূল্যবান বস্তু অজ্ঞতাবশত নষ্ট করে ফেলা বা অপাত্রে মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অর্পণ।

কোকিল

কোকিলের বউ, ছেলে ধরতে জানে না।

—মেয়ে কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, কাকই ডিম ফুটায় ও বাচ্চা লালন পালন করে। অনভিজ্ঞতার কারণ ঘটলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ঘুঘু

ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি।

—কাজের প্রথম অংশে সুখ অনুভব করা, কিন্তু পরিণামে যে যন্ত্রণা আছে তা বুঝতে না পারা।

টিয়া

লাভের ধান টিয়ায় খায়।

—মুনাফা ও আনুষঙ্গিকে খরচ সমান হলে এ ধরনের প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পিপীলিকা

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।

—পতনের পূর্বে অধিক বাড়াবাড়ি অর্থে প্রযুক্ত।

শকুন

শকুনের নজর ভাগাড়ের দিকে।

—অধম ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করলেও স্বভাব ত্যাগ করতে পারে না।

সাপ

সাপের পাঁচ পা দেখা।

—অত্যন্ত স্পর্ধিত হওয়া প্রসঙ্গে ব্যবহৃত।

মাছ

পানি ঘোলা করে মাছ শিকার করা।

—কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা অর্থে প্রযোজ্য।

॥ তেরো ॥

বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চলে আসছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সাহিত্যেও বাদ্যযন্ত্রের কথা শোনা যায়। লোকসাহিত্যের একটা বিরাট অংশে, বিশেষ করে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের। যেমন--- ঢাক ঢোল করতাল খঞ্জনি

ঘুঙুর বাঁশি মাদল ইত্যাদি। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রবাদেও দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের বাদ্যযন্ত্রগুলি লোকবাদ্য নামে বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদান হয়ে গিয়েছে। তাই প্রবাদের রাজ্যে লোকবাদ্যের একটা বিরাট অবদান বা ভূমিকা রয়েছে। বাংলার লোকমনের কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা এইসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তাদের মানসিক চেতনাবোধ শুধু জাগ্রত বা পরিতৃপ্ত করেনি, এর মধ্য থেকে বাঙালির লোকমানসের যে সামাজিক অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ, জানবার আগ্রহ তাকে বিচিত্র ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রবাদের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক প্রবাদের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল:

ঢাক

ক. ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

—হীন ব্যক্তি কর্তৃক মহতের কাজ করার চেষ্টা। ঢাক বাজায় সাধারণত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা। আর চণ্ডীপাঠ করেন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সুতরাং ঢাকি যদি চণ্ডী পাঠ করেন,— তা হলে যেমন হয়।

খ. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

—অর্থাৎ পাপ চাপা দেওয়া যায় না, শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই পড়ে।

ঢোল

ক. হাটের মাঝে ঢোল পেটা।

—কোনও গোপন কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা।

খ. দুর্গাপূজায় ঢাক বাজে না,
ষষ্ঠী পূজায় ঢোল।

—অর্থাৎ যেখানে আড়ম্বরের প্রয়োজন সেখানে সেটি না হয়ে যদি অন্য কোনও তুচ্ছ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে হয় সে প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

কাঁসি

খাই দাই কাঁসি বাজাই।

—নিষ্কর্মা জীবন সম্পর্কে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

ডুগডুগি

খাই দাই ডুগডুগি বাজাই।

—এই প্রবাদটিও নিষ্কর্মার জীবন যাপন সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সানাই

সানাইয়ের পোঁ ধরা।

—অন্ধভাবে কাউকে সমর্থন বা অনুকরণ করা উপলক্ষে ব্যবহৃত।

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের নাম সম্বলিত প্রবাদগুলিতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিতে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে রূপকের মধ্য দিয়ে অন্য বক্তব্য বা অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কখনও বা কৌতূহলের মধ্যে দিয়ে। তবে সেই বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে মানবজীবনের ওপর।

॥ চোদ্দো ॥

বিলাসোপকরণ সম্পর্কিত

নারী সাজতে ভালবাসে, তার ভূষণকে আমরা অলংকার বলি। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য জীবনে কত রকমেরই না বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার। তাই জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রবাদমালায় আলতা টিপ কাজল হার বালা দুল নথ ঢাকাই শাড়ি প্রভৃতি বিবিধ উপকরণের প্রাচুর্য। নারীর বিলাসিতার এই ভূষণ কীভাবে প্রবাদে ব্যবহৃত হযেছে তা দেখা যেতে পারে:

আলতা

সধবা নারীর এক অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ আলতা। আলতা পরলে নারীর পায়ের সৌন্দর্য বাড়ে। কিন্তু গোদা পায়ে আলতা মানায় না। তাই ব্যঙ্গ করে বলে হয়েছে:

গোদা পায়ে আলতা, খাঁদা নাকে নথ।

—এই দুটিই মানানসই নয়।

নথ

সুন্দরী নারীর টিকালো নাকেই নথ মানায়। খাঁদা বা বোঁচা নাকে যে নথ মানায় না সে কথাটি ব্যঙ্গবিদ্রূপের সঙ্গে বলা হয়েছে পূর্বোক্ত প্রবাদে।

টিপ

নারীর রূপসৌন্দর্যবর্ধনকারী আর একটি উপকরণ হল কপালের টিপ। সুন্দরী নারীর কপালে টিপের উজ্জ্বলতা প্রসঙ্গে প্রবাদে আছে:

এ না টিপ কে না পরে,
কপালের গুণে টিপ ঝলমল করে।

টিপ সকলেই পরে, কিন্তু কপাল যদি সুন্দর হয় তবেই টিপ পরা মানানসই হয়।

কাজল

নারীর রূপচর্চার আর একটি উপকরণ হল কাজল। তবে সব নারীর চোখই কাজল পরলে সুন্দর দেখায় না। হরিণনয়না বা পদ্মের পাপড়ির মতো চোখে কাজল পরলে নারীকে অপূর্ব দেখায় ঠিকই কিন্তু চোখের চাহনি বা সুন্দর দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, প্রবাদে সেটাই বলা হয়েছে।

শুধু কাজল পরলে হয় না, চাউনি চাই।

চন্দন

চন্দন পরলে দেখতে যেমন ভাল লাগে, তেমনই তার সৌরভেও চারদিক সুরভিত হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে চন্দনের অসঙ্গত ব্যবহার ব্যঙ্গের কারণ হয়। যেমন—

কপালে থুয়ে পাছায় চন্দন।

বিলাসিতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদের কথাও শোনা যায়।

শাড়ি

সুন্দর শাড়ির চাহিদা সর্বত্র। তাই প্রবাদেও নারীর অঙ্গের সৌন্দর্যবর্ধক শাড়ির কথা বলা হয়েছে। প্রবাদে স্ত্রীকে ঢাকাই শাড়ি পরানোর কথা পাই আমরা;

মায়ের গলায় দড়ি,
বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

—স্বামী মাকে অবজ্ঞা করে বধূর প্রতি যত্নশীল হয়।

কুৎসিত অথচ ধনবতী নারীর অতিরিক্ত শাড়ি পরাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

রাজার বাড়ির চেড়ি,
দিনে সাতখানা শাড়ি।

নারীর অঙ্গের ভূষণ অলংকার। সেইসব বিবিধ অলংকারের কথা প্রবাদে বলা হয়েছে:

ক. মায়ের পেটে ভাত নেই,
বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।

—স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি মায়ের আক্ষেপ।

খ. গরু হাল বেচে গড়ায় বউয়ের গলার হার।

—স্ত্রৈণতার পরিচয়।

গ. গিন্নির হাতে রাঙ্গাপলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।

—মা'র প্রতি পুত্রের অবহেলা। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা।

ঘ. ভাত পায় না খেতে, সোনার আংটি হাতে।

—খাবার জোটে না অথচ হাতে সোনার আংটি শোভা পায়।

ঙ. খাঁদা নাকে নথ, গোদা পায়ে মল।

—যাকে যা পরলে মানায় না।

গয়না সম্পর্কিত প্রবাদের মধ্য দিয়ে নারীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হতে দেখা যায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে শৌখিন জিনিসের ব্যবহার বিশেষ করে পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজের ব্যাপারে কিছু বিদ্রূপ-কৌতুকপূর্ণ প্রবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন:

আতর

অবাক সৃষ্টি করলেন চুপে
নাক নেই তার আতর গোঁপে।

সৃষ্টিকর্তা নাক দেননি, অথচ আতর ব্যবহারের প্রচেষ্টা।

কোনও পুরুষ যদি অশোভন বিলাসিতা করে তাকেও ব্যঙ্গ করা হয় প্রবাদের মাধ্যমে:

ক. ঘুঁটে কুড়ানির বেটা এল ধুতি-উড়ানি কিনতে।

খ. চটি জুতার আবার ফিতে।

প্রবাদে জামাইয়ের বিলাসিতাকেও বিদ্রূপ করা হয়েছে:

জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের,
দুবুড়ি কড়ি সুতোর ফের।

চুলহীন পুরুষ বা নারী যদি কেশবিলাসের দিকে মন দেয় তা হলে তাদের সমালোচিত হতে হয়। যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে:

চুল নেই তার টেড়িকাটা।

আর নারীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে:

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা।

পাগড়ি

পাগড়ি একান্তভাবে পুরুষের ব্যবহার্য সামগ্রী। প্রবাদে পেয়াদার পাগড়ি নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে:

পেয়াদাবাবু পাগ বেঁধেছেন
যেমন সরু ধানের চিঁড়ে।

বিলাসোপকরণ-বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষের অতিরিক্ত বিলাসিতাকে কৌতুকের সঙ্গে সমালোচনা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে।

॥ পনেরো ॥

প্রেম-বিষয়ক

প্রবাদে যে কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা থাকে তা নয়, এর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার মধুর কথাও ব্যক্ত হতে দেখা যায়। তবে প্রেম বিষয়ক প্রবাদে মান-অভিমানের সঙ্গে ঈর্ষার ভ্রূকুঞ্চনও লক্ষ করা যায়। প্রেম যে জাত-পাতের উর্ধ্বে মানব-মানবীর মিলন সূচক, এমন সামাজিক সম্প্রীতির কথাও প্রবাদে আছে:

ক. যার ঈর্ষা নেই, সে আবার প্রেমিক নাকি?

প্রেম-ভালবাসার বহুমাত্রিক অনুভব ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঈর্ষাও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ. দুই দেহ এক আত্মা।

—প্রেমের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠতার স্বরূপ বোঝাতে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

গ কদিন পিরীত থাকে ঢাকা।

—অর্থাৎ প্রেম যে গোপন থাকে না সে প্রসঙ্গে প্রবাদটি প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের গানেও আছে "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,/ আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।"

ঘ. পিরীতের নাও পাহাড়ে চলে।

—গভীর আবেগময় প্রেমের বিহ্বলতায় বাস্তব থেকে দূরে স্বপ্ন ও রোমান্সের যে জগৎ তৈরি হয়— প্রবাদটিতে সে কথাই বলা হয়েছে।

ঙ. যার সঙ্গে মজে মন,
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

—প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও বাধাই প্রতিবন্ধক নয়, জাতপাত তো দূরের কথা।

চ. পিরীত থাকলে তেঁতুল পাতায় দু'জন শোয়া যায়।

—প্রেম যে ভালবাসার নিবিড়তায় কত গভীর, কত উদার বা সহানুভূতিপ্রবণ সে প্রসঙ্গেই প্রবাদটির সৃষ্টি। তুলনীয়:

যদি হয় সুজন
তেঁতুল পাতায় ন'জন।

কিংবা,

ছ. গলায় গলায় পিরীত ভাব।

—প্রবাদটিতে অত্যন্ত নিবিড় ভালবাসার কথা বলা হয়েছে।

॥ ষোলো ॥

স্থাননাম-বিষয়ক

বিভিন্ন স্থান বা জায়গার নাম অনুসারে বহু প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের প্রবাদে সাধারণত কোনও গ্রাম বা স্থানীয় এলাকার মানুষের পদবি, পেশা বা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি গ্রামের লোকপ্রসিদ্ধি কিংবা স্থানমাহাত্ম্য নিয়েও প্রবাদ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের প্রবাদে সাধারণত ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপেক্ষা কৌতুকরসেরই প্রাধান্য। সর্বোপরি প্রবাদে উল্লিখিত লোকমনের কৌতূহলের প্রকাশ ঘটেছে। এ ধরনের প্রবাদ বাংলায় কম নয়:

ক. শিং, শিমলা, কব
তিনে জাজিনগর।

—বীরভূমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জাজিনগর গ্রাম অবস্থিত। সিং অর্থাৎ সিংহ, শিমলা হল শিম্বলাল গাঞ্চী ব্রাহ্মণ আর কর বৈদ্য— এই তিন পদবিধারী ব্যক্তিরা এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন— এঁদের নিয়েই প্রবাদটি রচিত।

খ. পাল ভট্টাচার্য খাঁ
তিন নিয়ে মানকর গাঁ।

—মানকর এক সময় ছিল বর্ধমান জেলার গৌরব। রেশম শিল্প ও সারস্বত সাধনার কেন্দ্র হিসেবে মানকরের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। পদবি নিয়ে যেসব গ্রামের পত্তন হয়েছিল তাদের মধ্যে উক্ত প্রবাদটি মানকর গাঁ সম্পর্কিত।

হাওড়া জেলায় বহু গ্রামের নাম সেই অঞ্চলের প্রধান প্রধান পরিবারের নামের সঙ্গে যুক্ত এবং লোকমুখে তা প্রবাদের আকার ধারণ করেছে:

গ. রায় বাঁড়ুজ্জে মোল্লা
তিন নিয়ে খাললা।

আবার পেশাগত বৈশিষ্ট্য নিয়েও কিছু গ্রাম জনপদ প্রবাদে স্থান পেয়েছে:

ঘ. ঘেঁটেল, চেটেল, ফড়ে
তিন নিয়ে উলুবেড়ে।

নদী পারাপারের জন্য যাঁরা খেয়া ঘাটে নিযুক্ত তাঁরাই হলেন ঘেঁটেল। চেটেল হলেন পথিকদের বিশ্রামস্থান, চটির তদারককারী। ফড়ে অর্থাৎ দালাল।

ঙ. রায় লস্কর খাঁ
তিনে পাতেণ্ডা গাঁ।

—এটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির কাছাকাছি একটি গ্রাম।

চ. বাগ সিংহ ভুঞে
তিন নিয়ে তেঘরে।

—হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম তেঘরি। তিন ঘর বসতির জন্য এই গ্রামের নাম তেঘরি থেকে তেঘরে।

জাতি বা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য কতকগুলি প্রবাদে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন—

ছ. বামুন চাঁড়াল মুসলমান
তিন নিয়ে পিপুল্যমান।

—পিপুল্যমান হল হাওড়া জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

জ. দুলে কপালি মুচুরমান
তিন নিয়ে বাগনান।

—প্রবাদটিতে হাওড়া জেলার বাগনানের জাতি বা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

ঝ. তাঁতি গোঁসাই পচাভুর
তিন নিয়ে শান্তিপুর।

—এ ছাড়া স্থাননাম-বিষয়ক আরও বহু প্রবাদ শোনা যায়:

ঞ. হাড়ি বাগদি নেড়ে
এই তিনে তুলসীবেড়ে।

—এটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ-সম্পর্কিত প্রবাদ।

ট. কুঁজড়ো কাওয়ারি নুর
তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

গড়বেতার বগড়ি এলাকার প্রধান বসবাসকারীদের নিয়েও প্রবাদ প্রচলিত:

ঠ. বাগদি ল্যায়েক কামার ভট্ট বেনা
এই পাঁচ নিয়েই বগড়ি পরগণা।

হুগলির ভাঙামোড়া গ্রাম সম্পর্কেও একটি প্রবাদ শোনা যায়:

ড. বামুন বদ্যি বাঁশের গোড়া
এই তিন নিয়ে ভাঙামোড়া।

উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের একটি গ্রামকে নিয়েও প্রবাদ প্রচলিত আছে:

ঢ. বাঁশ, বাজানে, ঘটকেরা
তিন নিয়ে মাঠকোমরা।

বর্ধমানের মানুষ ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন। প্রবাদে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

ণ. লম্বা কোঁচা, কাছায় টান,
তবে জানবে বর্ধমান।

আবার দেশজ ফসল নিয়ে বর্ধমান সম্পর্কে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে:

ত. আম, আমড়া, কুঁজরা ধান,
এই তিন নিয়ে বর্ধমান।

বর্ধমানের অন্তর্গত একটি গ্রাম সম্পর্কিত প্রবাদ হল:

থ. যদি পাও ঢাকের সাড়া,
তবে জানবে কামার পাড়া।

বর্ধমান ও হুগলির কাছাকাছি একটি গ্রাম সিঙ্গারকোণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামটির প্রসিদ্ধি আছে। সেই গ্রামটিকে নিয়েও প্রবাদ শোনা যায়:

দ. গান, বাজনা, সুজন,
এই তিন নিয়ে সিঙ্গারকোণ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম ঘোড়ানাশ। এই গ্রামের নাম-ইতিহাস প্রচলিত প্রবাদ থেকে জানা যায়:

ধ. রাজার সুখে রাজ্যে বাস,
তার সাক্ষী ঘোড়ানাশ।

হাঁসখালি গ্রাম নিয়ে একটি চমৎকার প্রবাদ শোনা যায়:

ন. ইট খোলা টালি,
তিন নিয়ে হাঁসখালি।

মানভূম-সম্পর্কিত প্রবাদটিতে মানভূমের লোকেদের পান খাওয়ার অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে:

প. মুখে পান হাতে চুন,
তবে জানবে মানভূম।

কাশী হল তীর্থস্থান। এখানে সন্ন্যাসী যেমন আছেন, তেমনি বিধবাদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবেও স্থানটি চিহ্নিত। পথে আবার বিশ্বেশ্বরের বাহন এখানে পূজিত বলে অনেক ষাঁড় ঘুরে বেড়ায় পথে। কাশীর এই তিন বৈশিষ্ট্য প্রবাদে কৌতুকের সঙ্গে স্থান পেয়েছে:

ফ. ষাঁড় রাঁড় সন্ন্যাসী,
এই তিন নিয়ে বারাণসী কাশী।

পিণ্ডদানের জন্য সবাইকে গয়ায় যেতে হয়,— সে কথাও প্রবাদে আছে:

ব. বাপ থাকতে বিদ্যমান,
গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান।

কটক-সম্পর্কিত একটি কৌতুককর প্রবাদ শোনা যায়:

ভ. উঠল বাই তো কটক যাই।

হরি (কৃষ্ণ)-র লীলাক্ষেত্র বলে তীর্থস্থান হিসেবে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি যথেষ্ট। বৃন্দাবনে গেলে হরিনাম করা হয়, কিন্তু প্রবাদে বলা হয়েছে, হরির স্মরণ করলে বৃন্দাবনে না গিয়েও হৃদয়ে তার স্বরূপ অনুভূত হয়। যেমন—

ম. হরিপদে থাকলে মন,
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

প্রবাদে কলকাতা শহরও বাদ যায়নি:

য. মিথ্যা কথার কিবা কেতা,
আজব শহর কলকাতা।

কলকাতার নাগরিকতাঋদ্ধ মানুষেরা কত সুন্দর করে মিথ্যা বলতে পারে প্রবাদটিতে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

কিংবা,

র.	বেটী, মাটি, মিথ্যাকথা,
	এই তিন নিয়ে কলকাতা।

কলকাতার অন্তর্গত কালীঘাট সম্পর্কে চমৎকার দুটি প্রবাদ শোনা যায়। যথা—

ল.	তাঁতি রাজপুত ভাট
	তিন নিয়ে কালীঘাট।

ব.	কালির অক্ষর নেইকো পেটে,
	চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।

রাঢ় অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল বীরভূমের খ্যাদাভ্যাস নিয়ে পাই একটি প্রবাদ—

শ.	পোস্ত টক কলাইয়ের ডাল,
	এই তিন বীরভূমের চাল।

ষ.	কলাপাতা, কাঠের আঁটি
	এই তিন নিয়ে বৈদ্যবাটি।

স.	চোর চোট্টা হারামজাদ
	এই তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ।

খাদ্যরসিক বাঙালির খাদ্যাভ্যাস স্থান-বিশেষে পৃথক এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রবাদে এক একটি স্থানের সামাজিক রীতিনীতি এইভাবেই ধরা আছে কখনও সেখানকার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কখনও বা বিশেষ জিনিসপত্র নিয়ে।

ক.	বাঁদর সভাকর মদের ঘড়া
	এই তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।

খ.	তাল বাবলা ছুঁচো বোঁচা
	এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

গ.	দাঁতে মিশি কাপড় বালি
	বাড়ী কোথা না কুড়মন পলাশী।

ঘ. গাঁজা গুলি অন্নভাঙা
তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা।

ঙ. রাস তাস জোরের লাঠি
তিন নিয়ে পানিহাটি।

চ. চাল চিঁড়ে গুড়
তিন নিয়ে দিনাজপুর।

ছ. চিঁড়ে চেটাই ঝেঁতলা
তিন নিয়ে চেতলা।

জ. বেহায়া বেরসিক বাঁকা
তিন নিয়ে ঢাকা।

ঝ. ধান খুন খাল
তিন নিয়ে বরিশাল।

ভারতের বিভিন্ন স্থান, পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা, কলকাতা ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকী বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা প্রসঙ্গেও প্রবাদ পাওয়া যায়। স্থাননাম-বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ও কৌতূহলের যেমন প্রকাশ ঘটেছে তেমনি এই শ্রেণীর প্রবাদ বাংলার সমাজ-ইতিহাসের এক ধরনের দলিলস্বরূপ। প্রবাদগুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অপেক্ষা অনাবিল রস-রসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে।

॥ সতেরো ॥

লোককাহিনীমূলক

বিচিত্র বিষয়ের বহু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও লোককাহিনীমূলক প্রবাদের চলন খুব বেশি নয়। এই ধরনের অল্প কয়েকটি প্রবাদ আমরা পেয়েছি। তবে এই শ্রেণীর প্রবাদ বিশেষ কৌতূহলজনক এই কারণে যে

প্রত্যেক প্রবাদের সঙ্গে একটি করে কাহিনি বা গল্প জড়িয়ে আছে। এ ধরনের কয়েকটি প্রবাদের উদাহরণ তুলে ধরা হল:

ক. ঘরে ঘরে?

—এটি একটি কাহিনিমূলক প্রবাদের উদাহরণ। কাহিনিটি হল: "মেয়েদের মহলে একদিন কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইয়াছে এই বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। একটি ছোট্ট ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা তোমার কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে? মা লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। একজন বলিল, তোর বাবার সঙ্গে। ছেলেটি বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ ঘরে ঘরে?"[২]

প্রবাদটির মধ্যে কৌতুক রসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

খ. কাঙালি মেরে কাছারি গরম।

এক জমিদারের কাছারিতে সবাই ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে; কেননা অজন্মার জন্যে খাজনা-পত্তর বিশেষ জমা পড়ছে না। কাজে কাজেই নাচ-গান-মহ্‌ফিল-হই-হল্লা সব বন্ধ। অজন্মার জন্যে দেশে দুর্ভিক্ষও লেগেছে, সবাই 'হা-অন্ন', 'যো-অন্ন' করছে। ওই অন্নের তাগিদেই চাষি গেরস্ত দলে দলে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। এমনই এক চাষি ভিখিরি কাছারিতে এসে চাট্টি চাল চেয়েছে— ভেবেছে, জমিদার হল রাজা, সে কি আব দুঃখী প্রজাকে দুটি ভিক্ষে দেবে না? কাঙালিকে কাছারির ভেতর পেয়ে তো মোসাহেবের দল আহ্লাদে হই-হই করে উঠল; আর সব আমোদ তো পয়সার অভাবে বন্ধ, তো এ বেটাকেই সবাই মিলে ঠেঙিয়ে মজা করা যাক। মারধর খেয়ে যখন অবশেষে বেচারি ফিরে যাচ্ছে তখন সে গজ গজ করতে করতে গেল এই বলে: "শালার বেটা শালারা, ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই! হারামজাদার পোয়েরা কাঙালি মেরে কাছারি গরম কচ্চেন।"[৩]

গ. মাকড় মাল্লে ধোকড় হয়।

এক ধোপার ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ঠাকুরমশাইকে শুধোল: "হ্যাঁ গা ঠাউর মশায়, মাকড় (মাকড়সা) মাল্লে কী হয় গা?" পুরুত ঠাকুর তো মওকা বুঝে বিধান ফাঁদলেন: "সে কি রে! ধোপার ছেলে হয়ে তুই মাকড় মাল্লি! তাও আবার এই চোত্তির মাসের বিরস্পতিবারের ভরদুপুরে। তোর প্রাচিত্তির করা লাগবে— এ কদিন আমিষ, লবণাহার বন্ধ রেখে সংক্রান্তির

দিন ঠিক সুয্যি ওঠার সময় পাঁচ পণ কড়ি, পাঁচ কাহন আতপ-তণ্ডুল, পাঁচ ছটাক ঘি, পাঁচ কিতে পান, পাঁচ গণ্ডা সুপুরি, পাঁচ ছড়া মর্তমান কলা, পাঁচ আনা পয়সা আর একখানা নতুন কোরা বস্তর নিয়ে আসবি নাইবার পর— আর আনবি শ্বেত হলিন্দা (হরিদ্রা) ফুল। আরে দেব, দেব'খন তোর মাকড় মারার মহাপাপ খণ্ডন করিয়ে।" ধোপার ছেলে বলে— "আরে ঠাকুর তা'লে তোমার ন' ছেলে প্যাংলাকে বল গে' এসব আনতে। মাকড়টা তো মাল্ল সে-ই।" ঠাকুরমশাই লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে ব্যাজার মুখে বললেন, "আরে বাপুরে বাপু! বামুনের ছেলে মাকড় মাল্লে ধোকড় (অর্থাৎ, কিছুই না) হয় এটাও জানিসনে?"[8]

॥ আঠারো ॥

লোকশিক্ষা-উপদেশ ও প্রজ্ঞাসূচক

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত প্রবাদের রাজ্যে বেশ কিছু লোকশিক্ষা-উপদেশ ও প্রজ্ঞাসূচক প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর প্রবাদে পল্লীনির্ভর বাঙালি সমাজের লোকশিক্ষা ও লোক-জ্ঞান চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত:

ক. তিন মাথা যেখানে বুদ্ধি নিবি সেখানে।

—অর্থাৎ অতিবৃদ্ধ, বয়সের ভারে যার মাথা নুয়ে পড়ে দু' হাঁটুতে ঠেকেছে তার কাছে বুদ্ধি বা শিক্ষা নেওয়া উচিত।

খ. আগে পা পরে গা,
মাথায় দিয়ে নাইতে যা।

—স্নানের আগে তেল মাখার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আগে পায়ে, তারপর গায়ে, সবশেষে মাথায় তেল মাখতে হয়। এতে স্নায়ুশিরা সচল থাকে।

গ: ওঠা ধানের পথ্যি হয় না।

—অর্থাৎ সদ্য ওঠা ধান থেকে যে চাল হয় তা রোগীকে পথ্য হিসেবে দিতে নেই। দিতে হয় পুরনো চালের ভাত। তা সহজপাচ্য।

ঘ. খেয়ে হাগে শুয়ে জাগে,
সে লোক কোনো কামে না লাগে।

—দুটিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই একথা বলা হয়েছে।

ঙ. আলো-হাওয়া বেঁধো না,
রোগভোগ সেধো না।

যে ঘরে আমাদের বাস, সে ঘরে আলো-হাওয়ার অবাধ প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। বদ্ধ ঘরে রোগের উৎপত্তি হয়। তাই এ সতর্কীকরণ।

কিংবা,

চ. বেড়াও যদি ভোরের বেলা,
থাকবে না আর রোগের জ্বালা।

ভোরের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, মনও সতেজ থাকে।

ছ. বাদ্যের মধ্যে বাঁশি,
রোগের মধ্যে কাশি।

—বাদ্যের মধ্যে সেরা বাদ্য হল বাঁশি, রোগের মধ্যে কাশি হল মারাত্মক। প্রবাদটি প্রজ্ঞাসূচক।

॥ উনিশ ॥

লোকসিদ্ধান্তমূলক

বাংলা প্রবাদের রাজ্যে কতকগুলি লোকসিদ্ধান্তও প্রবাদের গুরুত্ব পেয়েছে। এই শ্রেণীর প্রবাদে একটি সিদ্ধান্তকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় উদাহরণ ও তুলনার প্রয়োগ করতে দেখা যায়। ফলত প্রবাদগুলিতে অনেক সময় সিদ্ধান্তের সঙ্গে ব্যঙ্গ এমনভাবে মিশে যায় যে তখন সিদ্ধান্ত না ব্যঙ্গ বড় এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা যায়। মূল কথা হল এই ধরনের প্রবাদে মূল সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা:

ক. আপনার বেলায় আঁটিসুটি,
পরের বেলায় চিমটি কাটি।

পাঠান্তর: নিজের বেলায় আঁটিসুটি,
পরের বেলায় দাঁতকপাটি।

খ. আড় নয়নে বাঁকা ভুরু,
সেজন হয় নাটের গুরু।

গ. একাদশীর কেউ নয়,
পারণের গোঁসাই।

ঘ. এখন বুঝিবে না যৌবনের ভরে,
তখন কাঁদিতে হবে অজ্ঝোর ঝরে।

ঙ. কলির বউ ঘরভাঙানি।

চ. কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন,
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।

—মা-ই হচ্ছেন সংসারের পরম আশ্রয়। মাতৃহীনের কাছে মাসি-পিসি মায়ের চেয়ে বড় হতে পারে না।

ছ. কত ধানে কত চান,
গিন্নি বিনে আল তাল।

জ. কথার দোষে কার্য নষ্ট,
ভিক্ষায় নষ্ট মান।
গিন্নির দোষে গৃহ নষ্ট,
লক্ষ্মী ছেড়ে যান ৷৷

ঝ. কী মজার শ্বশুরবাড়ী,
যার আছে পয়সাকড়ি।

—বিত্তবান শ্বশুরবাড়িতে বেশি সমাদর পেয়ে থাকে।

ঞ. কলায় দলা, হলুদে ছাই,
বউরে সেবিলে, পুতেরে পাই।

—পুত্রের সেবা পেতে হলে পুত্রবধূর সেবা করতে হয়।

ট. ঘর দেখে দেয় আর বর দেখে দেয়।

—কন্যার বিয়ে দেওয়ার আগে পাত্রের ঘরবাড়ি আর পাত্রকে দেখতে হয়।

ঠ. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

—একমাত্র সহায় বা সম্বল।

ড. জোয়ারের পানি নারীর যৌবন।

—অর্থাৎ, তা চিরস্থায়ী নয়।

ঢ. ধীর জ্বাল ঘন কাটি,
তারে বলি দুধ-আওটি।

ণ. নিজের ছেলে সোনাধন,
পরের ছেলে দুশমন।

—নিজের ছেলের প্রতি অন্ধ আবেগ।

ত. পরের সোনা দিয়ো না কানে,
কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে।

—পরের জিনিস ব্যবহার করতে নেই।

থ. পুরুষের বল টাকা, নারীর বল শাঁখা।

দ. পাতে পড়লেই খাওয়া হয় না,
রাজায় পড়লেও রানী হয় না।

ধ. ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশি।

ন. শাঁখা, শাড়ি, কেশ— তিনে নারীর বেশ।

প. যে রাঁধুনি তার পাত্রের সাজেও বাঁধুনি।

ফ. সতী নারী গঙ্গাজল,
অসৎ নারী বদ্ধজল।

ব. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

॥ কুড়ি ॥

লোকসাংবাদিকতা-বিষয়ক

পল্লী অঞ্চলে মুখের প্রবাদ গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। লোকসাংবাদিকতা-বিষয়ে বাংলায় বহু প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের প্রবাদ থেকে সংবাদ বা তথ্য যেমন পাওয়া যায় তেমনি সংবাদমূলক প্রবাদে সংবাদের সঙ্গে বিদ্রূপ-শ্লেষ ব্যঙ্গও জড়িয়ে আছে:

ক. গুলি খিলি, মতিচুর
এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

—প্রবাদটিতে বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে আফিঙের গুলি, পানের খিলি এবং মিহিদানার কথা বলা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে একসময়ে

গুলিখোরদের আধিক্য, পানের খিলির কদর ও মতিচুরের সুনাম ছিল— সে কথাই লোকসাংবাদিকতার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে প্রবাদে।

খ. গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা
তিন নিয়ে সরশুনা।

—বেহালার দক্ষিণে পরিচিত স্থান সরশুনার নামের সঙ্গে গাঁজা, তাড়ি আর প্রবঞ্চনার কুখ্যাতি কখন যেন জড়িয়ে গেছে। তা থেকেই এই প্রবাদের উৎপত্তি। প্রবাদটি নিন্দামূলক এবং সংবাদধর্মী।

গ. কোথা থেকে এল গজা কৃষ্ণপুর বাড়ি।
ছত্রিশ বছর বয়স তবু উঠল না গোঁফ দাঁড়ি।

—প্রবাদটি ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। ব্যক্তিবিশেষের গোঁফ-দাঁড়ি সম্পর্কে বেশ কৌতুকপূর্ণ সংবাদ প্রবাদটিতে লক্ষ করা যায়।

ঘ. কাগজ, কলম, কালি
তিন নিয়ে বালি।

—হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালিতে একসময় কাগজ-কলম ও কালি তৈরি হত। সেই সংবাদধর্মী প্রসিদ্ধি প্রবাদেও শোনা যায়।

ঙ. অম্বিকানগর গেছে গানে
খাতড়া গেছে দানে।
রাইপুর গেছে বানে ॥

—এই সংবাদধর্মী প্রবাদটি বাঁকুড়া জেলার তিনটি স্থানকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। অম্বিকানগরের সংগীতপ্রেমিক রাজা বিভিন্ন স্থানের সংগীতজ্ঞ শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। খাতড়ার রাজা ছিলেন দানশীল, রাজার এই অতিরিক্ত দানশীলতার জন্য রাজাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। রাইপুর জনপদ কংসাবতী নদীর বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই তিনটি কারণের কথা এই সংবাদধর্মী প্রবাদে ব্যক্ত হয়েছে।

বিবিধ-বিষয়ক

বিষয়গত দিক থেকে বাংলা প্রবাদের শ্রেণীবিন্যাস করে যথাসম্ভব সেগুলির আলোচনা করা হলেও লোকসাহিত্য এমন একটি বহুমাত্রিক বিষয় যে সব সময় নির্দিষ্ট ছকের বন্ধনে তাকে বাঁধা যায় না। প্রবাদের ক্ষেত্রে কথাটি বেশি করে খাটে। বাঙালির জীবনচর্যার এমন অনেক বিষয় আছে বিশেষ করে বঙ্গনারীকে কেন্দ্র করে, যার গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবনের উত্থান পতনে আমরা সেগুলি এড়িয়ে চলি কিংবা আমল দিই না। প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি জীবন-সম্ভব বলেই জীবনের অলিতে গলিতে তার বিচরণ। প্রবাদের দর্পণে জীবনচর্যার সেই অচেনা রাস্তার অনুপুঙ্খ ঘটনাবলী প্রতিফলিত হয়। বক্ষ্যমাণ উপ-অধ্যায়ে সেগুলিরই অনুসন্ধান করেছি আমরা; শিরোনাম করেছি বিবিধ বিষয়ক প্রবাদ।

নারীনির্যাতন

ক. যত যাই কর না কেন,
পুরুষের নীচে থাকবে জেন।

খ. গরুর মত বৌকে না মারলে
হয় না সিধে কোন কালে।

—পুত্রবধূর প্রতি আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত অর্থাৎ নারীনির্যাতনের পারিবারিক দিকটি প্রবাদ রচয়িতা এখানে তুলে ধরেছেন।

গ. নিধির মায়ের চালে ঝিঙে
বৌকে মেরে বাজায় শিঙে।

—ঝিকে মেরে বউকে শেখানো প্রবাদটির অনুকরণে এই প্রবাদটি রচিত হয়েছে।

ঘ. খেটে খেটে মরবো,
তবু লাথি ঝাঁটা খাবো।

ঙ. খেটে খেটে মুখে রক্ত ওঠে,
তবু বলে— মানুষ বটে।

বাল্যবিবাহ

ক. বেশ হয়েছে বামুন ঠাকুর
তোমার কথা মানি
বারো বছরে বিয়ে হয়েছে
স্বামী ব'লে না জানি।

—বাঙালি সমাজে গৌরীদান প্রথার প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রবাদটিতে। এখনও বাংলার গ্রামেগঞ্জে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

খ. বিবি যখন বড়ো হবে
মিঞা তখন কবর পাবে।

—হিন্দুর কৌলীন্য প্রথা ও মুসলিমের বিধি বহির্ভূত বিবাহরীতি প্রসঙ্গে প্রবাদটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শিশুকন্যা ও শিশুপুত্র

নারীর পুস্তকে হাত দেওয়া নিষেধ এই সামাজিক বিধান সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

ক. ছেলে শিখবে লেখাপড়া
মেয়ে শিখুক রান্না করা।

খ. পুত্র সব সম্পদ, মেয়ে সব আপদ।

গ. ছেলে বিয়োলে স্বর্গবাস
মেয়ে বিয়োলে নরকবাস।

ঘ. মেয়ে হলে মুখ ঘোরায়
ছেলে হলে শাঁখ বাজায়।

নারীশিক্ষা

এই ধরনের প্রবাদগুলিতে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে। এসব প্রবাদে সামাজিক অবক্ষয় এবং মুক্তচিন্তার অভাব দেখা যায়।

ক. মেয়ে যত পাশ দেবে
মাথায় তত চড়ে বসবে।

খ. মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক
খুন্তি তো নাড়তেই হবে।

গ. সময় কোথায়, মেয়ে শিখবে লেখাপড়া।
সারবে কে সংসারের কাজ আগাগোড়া।

ঘ. নারী শিক্ষা না হলে
সমাজ পিছোয় পলে পলে।

ঙ. শিক্ষাই চোখ ফোটায়
মেয়ে বলে কেন থাকবে পিছিয়ে তায়?

নারীর অবমূল্যায়ন

ক. পুরুষের গলে মালা দিয়ে
নারী থাকবে খাটে শুয়ে।

খ ভাতার আনবে উপায় করে
মাগ থাকবে ঘরে ঘরে।

—এ ধরনের মনোভাবের ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে।

গ. ভাত দেয় কি ভাতারে
ভাত দেয় গতরে।

—এটাই আসল কথা।

চরিত্রহীন নারী-সম্পর্কিত

চরিত্রহীন নারী সম্পর্কে সামাজিক মনোভাব প্রবাদে ব্যক্ত হয়েছে:

ক. ন্যাকা মাগীর বাঁকা কথা।

খ. নষ্ট নারীর পরিচয়
বুদ্ধিগুণে সতী হয়।

গ. নষ্ট মাগীর বড় গলা
শুনতে কান ঝালাপালা।

ঘ. ঢং মারানী ঢং করিসনি
ঢং করে আর ঘুরে বেড়াসনি।

পণপ্রথা

ক. পণ ছাড়া বিয়ে

কী হবে সে মেয়ে নিয়ে।

—বাঙালি সমাজের কুপ্রথা।

খ. কড়ি বিনা শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায় না।

গ. কনের মা কান্দে,
আর টাকার পুঁটুলি বান্দে।

ঘ. হাঁড়ি কিনবে বাজিয়ে
বৌ আনবে সাজিয়ে।

—প্রবাদটি সামাজিক রীতির অনুসারী।

বিধবা প্রসঙ্গ

ক. সধবার কপালে সিঁদুর দেখে,
বিধবারা মরে দুখে।

খ. বিধবার একাদশী ফল নাই করলে
কিন্তু পাপ হবে না করলে।

গ. বিধবার জীবন
প্রত্যাশায় সর্বক্ষণ।

মাদক ও ধূমপান-বিষয়ক

ক. তেলে তামাকে পিত্তনাশ
যদি কর বার মাস।

খ. দিনে মদ্য পান করে
এক হপ্তা মাথা ধরে।

গ. মেজাজ আনে ধূমপানে।

খেতমজুর, শ্রমিক সংক্রান্ত

ক. খেটে খাওয়া যাদের বরাত
কাটবে না তাদের দুখের রাত।

—যারা শ্রমজীবী তাদের অদৃষ্ট কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রতিদিন কাজ না করলে তাদের অন্ন জোটে না।

খ. মালিককে যে সুখে রাখে
তার বরাতে দুঃখ না থাকে।

—শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক নিয়ে প্রবাদটি গঠিত। মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক কেমন ছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রবাদে। বর্তমান যুগে এই ধরনের প্রবাদ সৃষ্টি হয় না। কারণ সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। শ্রমিকের চেতনার ফলে শ্রমিক আর দাসত্ব করতে চায় না।

গ. গরীবের সবই বরাত
বাঁচা সেই ঈশ্বরের হাত।

ঘ. যে সয় সে রয়।

ঙ. গরীবের খেটে খেটেই মরতে হবে,
কোন দাদা আর কি করবে?

বার্ধক্য-বিষয়ক

ক. বুড়ো বয়সে ধাড়িপনা
না হয় সুখ কেবল যাতনা।

খ. বুড়া হৈলে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

গ. বয়সে অনেকের মাথা সাদা হয়
কিন্তু স্বভাব সাদা হয় না।

প্রতিবন্ধী প্রসঙ্গ

ক. পাপ করেছি রাশি রাশি
ভুগবে কী আর মাসি পিসি।

—একের পাপে অন্যের শাস্তি প্রসঙ্গে প্রবাদটি ব্যক্ত হয়েছে।

খ. অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত।

গ. খোঁড়া জগন্নাথের সেতো।

ঘ. ল্যাংড়া হয় যত চ্যাংড়া ছোঁড়া।

বাস্তুতন্ত্র-বিষয়ক

ক. দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা,
পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা।
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই,
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই।

—বর্তমানে এ ধরনের প্রবাদ প্রায় অপ্রচলিত।

খ. আগে তিতা, পাছে মিঠা।

গ. বেড়াও যদি ভোরের বেলা,
থাকবে না আর রোগের জ্বালা।

অধ্যবসায়-সম্পর্কিত

ক. কহিতে কহিতে সুখ বাড়ে
খাইতে খাইতে পেট বাড়ে।

খ গাইতে গাইতে গায়েন
বাজাতে বাজাতে বায়েন।

—একটা কিছু করতে করতে মানুষ দক্ষতা অর্জন করে।

অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নাও তার।

—প্রবীণের বুদ্ধি গ্রহণ প্রসঙ্গে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

অনভিজ্ঞতা-বিষয়ক

ক. নাচতে জানে না, উঠান বাঁকা।

—চলতে না জানলে পারিপার্শ্বিকতার দোষ দেওয়া হয়।

খ. জানলেই ভয়, না জানলেই নয়।

আশা-নৈরাশ্য প্রসঙ্গ

ক. আশায় পরম সুখ
নিরাশা পরম দুখ।

খ. পিঁড়া পেতে করনু ঠাঁই,
বাড়া ভাতে পড়লো ছাই।

পরিহাস সম্পর্কিত

যে কাজে অনেক রথী-মহারথী ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে কোনও ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।

ক. হাতী ঘোড়া গেল তল
ভেড়ায় বলে কত জল।

খ. কুঁড়ে ঘরে বাস,
খাট পালঙ্কের আশ।

অদৃষ্ট-বিষয়ক

ক. কপালের লিখন,
না যায় খণ্ডন।

খ. অভাগা যায় বঙ্গে,
কপাল যায় সঙ্গে।

বিচার-বিভ্রাট-বিষয়ক

চোর যায় চুরি করি বসি,
হাউষের (নিরপরাধ) গলায় লাগে রশি।

—নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া প্রসঙ্গে। চোরে চুরি করে কৌশলে, আর নিরপরাধ মানুষ সমাজে যন্ত্রণাভোগ করে কিংবা পুলিশের কাছে শাস্তি পায়।

জোর-জুলুম-বিষয়ক

ক. ভালুক কি নাচতে চায়,
নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়।

খ. পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

—অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে কিছু করা। সামাজিকভাবে মানুষ যখন অসহায় তখন প্রতাপশালী মানুষের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

উভয়সংকট-বিষয়ক

ক. নায়ে যাইতেও পোড়ে,
তরে যাইতেও পোড়ে।

খ. হাগেও না
পথও ছাড়ে না।

বাহ্যাড়ম্বর-বিষয়ক

ক. বাইরে বাইরে নাম ফাটে,
ঘরের মাইয়া কাইন্দা মরে।

খ. বাহির বাড়ী লণ্ঠন,
ভিতর বাড়ী ঠন্ঠন্।

—ভিতরে কিছু নেই, বাইরে চাকচিক্য বোঝাতে প্রবাদটি প্রযোজ্য।

কপটতা প্রসঙ্গ

ক. মুখ খুব মিঠে,
নিম-নিশিন্দা পেটে।

—মুখে মধু অন্তরে বিষ অর্থে।

খ. ফোঁটা পরে কপাল জুড়ে,
ঘাড় করে কাত,
দিনে করে সাধুগিরি,
চুরি সারারাত।

—ভণ্ড ও প্রতারক প্রসঙ্গে। যে অসৎ ব্যক্তি সে সবসময়ই ছদ্মবেশে থাকে। ধার্মিকের মতো ফোঁটা পরে সে চুরির ফন্দি আঁটে।

শত্রু বিষয়ক

ক. গাছের শত্রু লতা,
মানুষের শত্রু কথা।

খ. যার শিল যার নোড়া,
তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া।

—নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল অর্থে প্রযোজ্য।

আত্মমুখী চেতনা

ক. আপন চরকায় তেল দাও।

খ. চাচা আপন জান বাঁচা।

গ. আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

ঘ. আপ ভাল তো জগৎ ভাল।

সংঘশক্তি ও ঐক্য

ক. একের বোঝা, দশের লাঠি।

খ. দশচক্রে ভগবান ভূত।

বিপরীতধর্মী দর্শন

ক. দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

খ. যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল।

স্বার্থপরতা ও কুটিল স্বভাব

বাংলার সমাজ জীবনে এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে এবং অনেক কুটিল চরিত্রের লোক আছে যারা সব সময়ই নিজেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখে এবং সৎ মানুষদের প্রতারণা ও অপমান করে।

ক. পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা।

খ. গরু মেরে জুতা দান।

গ. পবেব মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা।

ঘ. ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

ঙ. ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

প্রতারণা

ক. কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি।

খ. পার হয়ে গুজরানকে সালাম।

অবাস্তব স্বপ্ন

ক. ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

—গরিব মানুষ সবসময়ই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

খ. বামন (খর্ব অর্থে) হয়ে আকাশে চাঁদ ধরতে পাওয়া।

—যাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থান নিম্নমানের তারাও অবাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন।

আইন-বিষয়ক

সামাজিক ও আইন বিষয়ক অবস্থান দৃঢ় ও কঠোর। যিনি বিচারক তিনি তাঁর বিচারের বাণী প্রকাশ করার মধ্যে ব্যক্তিগত সহানুভূতির কথা বলতে পারেন, কিন্তু আইনের বিধান অলঙ্ঘনীয়। সামাজিক মানুষের মনে অপরাধীর প্রতি সমবেদনা থাকলেও অনেক সময় সমাজ বিধান, মোড়ল কিংবা বিচারকেরা সামান্যতম অপরাধের জন্য গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। সেই কারণেই এই প্রবাদগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

ক. হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

খ. লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

—বিচারকের রায় অলঙ্ঘনীয়।

পেশাগত মানুষের স্বভাব-বিষয়ক

ক. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

—অনেক লোকের সমাগমে কার্য নষ্ট। কোনও কাজে অতি মাত্রায় লোকের সমাবেশ ঘটলে সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়— সেই প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

খ. অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

গ. ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।

ঘ. বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

ঙ. চোরের নজর বোচকার দিকে।

—চোর সবসময় অপরের সম্পদের দিকে নজর রাখে যাতে সুযোগমাফিক অপহরণ করতে পারে।

চ. গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না।

সামন্তশাসকের চিত্র

ক. জোর যার মুলুক তার।

—মধ্যযুগের শেষদিকে বাংলায় যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়ে জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের লেঠেলরা সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর যে অত্যাচার চালাত সেই প্রসঙ্গে এই প্রবাদটির সৃষ্টি।

খ. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

—আমাদের দেশে ও সমাজে এমন অনেক লোক আছে যাদেরকে সাধারণ মানুষ মানে না, অথচ এরা নিজেদের সবসময়েই সমাজে বড় বলে জাহির করতে থাকে।

গ. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

—সেকালে প্রতাপশালীদের মধ্যে যে যুদ্ধ তাতে প্রাণ দিত সাধারণ মানুষেরাই। একালে সেই একই রীতি।

ঘ. যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দই।

—সমাজে এমন লোকও আছে যারা কিছু না করেও ধনবানের অর্থকে আত্মসাৎ করে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সমাজজীবনে রাজা ও প্রজার মধ্যে যে জন-বৈষম্য ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবন এবং শোষণের চিত্র এই প্রবাদগুলির মধ্যে যথার্থভাবে পরিস্ফুট। সেইজন্য এই প্রবাদগুলিকে সমাজের চিত্র বলে গণ্য করা যায়।

এ ছাড়াও সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতি-উপদেশমূলক প্রবাদও

আছে। মোটকথা বৈষয়বৈচিত্র্যে বাংলা প্রবাদের তুলনা হয় না। বাঙালির জীবনের এমন বিষয় নেই যা নিয়ে প্রবাদ সৃষ্টি হয়নি। এমনকী আধুনিক জীবনচর্যার কোনও কোনও বিষয়ও প্রবাদে স্থান পাচ্ছে— সৃষ্টি হচ্ছে নতুনতর প্রবাদ। পরিবর্তনশীল চলমান জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

বাংলা প্রবাদে বাঙালি সমাজ

"ধর্মানুষ্ঠানের প্রধানতম ক্ষেত্রের নাম সমাজ। যেখানে কতকগুলি নরনারী পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া বসবাস করেন সেইখানেই সমাজ গঠিত হয়।...সমাজের কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য অনুশাসন থাকে। লিখিত ও অলিখিত,—এই অনুশাসনের দ্বিবিধ রূপ। লিখিত রূপ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ, আর পরস্পরের সম্মতি ক্রমে অধিকাংশ মানুষের সুবিধার জন্য, মঙ্গলের জন্য যে প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে, অথচ যাহার লিখিত কোন দলিল নাই, তাহাই ইহার অলিখিত রূপ।"[১]— সাহিত্যরত্ন পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সমাজের এই যে অলিখিত প্রথা বা অনুশাসনের কথা বলেছেন প্রবাদ-প্রবচনের মতো লোকজ সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যেই তা অনেকটা ধরা আছে। পল্লীবাংলার গ্রামনির্ভর সমাজের দর্পণ বাংলা প্রবাদসমূহ— একথা বললে বোধহয় ভুল হয় না। বাঙালি সমাজের বিচিত্র বিষয় এগুলিতে প্রতিফলিত। সমস্ত প্রবাদেই যে কোনও-এক বিশেষ সময়ের সমাজচিত্র পাওয়া যায় তা নয়, বিভিন্ন সময়ের বিচিত্র সামাজিক চিত্র এগুলিতে লভ্য। একারণেই প্রবাদকে একটা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রবাদের ভিতর দিয়ে অতীত ইতিহাস, মানুষের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, আবার সংস্কার-বিশ্বাস, বিভিন্ন ধরনের প্রথা, নানারকম অভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটে উঠতে দেখা যায়। বাংলা প্রবাদকে বাদ দিয়ে বাঙালি সমাজকে জানার চেষ্টা বৃথা।

প্রবাদে সমাজের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। জীবনচর্যার বিচিত্র বিষয়ের ভালমন্দ, সংগতি অসংগতি নিয়েই লোকমুখে প্রবাদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে সমাজ গঠনের কাল থেকেই। আবার প্রবাদের মধ্যে নারীদেরই প্রধান

ভূমিকা বা স্থান। নারীই বেশিরভাগ প্রবাদের স্রষ্টা ও কথক। কেননা বাঙালি সমাজের গঠন গৃহধর্মে, আর সেই গার্হস্থ্যধর্মের কেন্দ্রভূমিতে নারীর অবস্থান। যথার্থ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ: "জীব পালনের সমস্ত প্রবৃত্তি জাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে।...এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধন জাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে—প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানব সংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের, সকল সভ্যতার মূল ভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।"[২]— এ তো কবি-কথা নয়, যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ। বাংলা প্রবাদগুলি থেকে তাই নারীসমাজের বিভিন্ন দিক ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় সহজেই। মেয়েদের যে চিত্র প্রবাদে পরিস্ফুট হয়, তা অন্যত্র দুর্লভ। প্রবাদে নারীর সঙ্গে পুরুষের প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে নারীর দৃষ্টিতে পুরুষের মূল্যমান যাচাই হয়েছে বলা যায়। প্রবাদে নারী কেবল পুরুষের সমালোচনাই করে না, আত্মসমালোচনাও করে থাকে। সর্বোপরি নারী-মনস্তত্ত্বের দিকটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় প্রবাদে। সমাজে নারীর অবস্থানজনিত নানা প্রসঙ্গ প্রবাদের মধ্যে কীভাবে উল্লিখিত হয়েছে দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা দেখা যেতে পারে।

ধর্মজীবনের নানা চিত্র প্রবাদে অঙ্কিত হয়েছে। প্রবাদের একই সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার স্বাধীনভাবে পালন করতে দেখা যায়। সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করলেও তারা নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ছিল অনুরক্ত। যেমন—

> ফাঁরে (বিপদে) পড়লে আল্লার নাম
> বজ্রপাতে রাম নাম।

আবার বিপরীত অবস্থাও লক্ষ করা যায়। সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস এত দৃঢ় ও গভীর যে সেখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা কোনো নিটোলরূপ সহজে নজরে পড়ে না। তার মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী ধারা-উপধারা ও

উপাদান মিশ্রিত হয়েছে।"[৯৩] বাংলা প্রবাদেও এমনতর দৃষ্টান্তের অভাব নেই :

ক. পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।

খ. ডোম বাগদী হোড়েল জাত
পোষ না মানে আধেকরাত।

গ. চাষার হাতে শালগ্রামের মরণ।

ঘ. চাঁড়ালের চিনি, বামনের লবণ।

সংসারযাত্রা নির্বাহই যদি বাঙালি সমাজে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে সেই বিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক জটিলতাও কম নয়। সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রথার প্রচলন ছিল। সেইসব প্রথার মধ্যে অন্যতম প্রথা হল পণপ্রথা, যা আজও বাঙালি মেয়েদের ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। কন্যার বিবাহের জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে পণপ্রথার শিকার হতে হত— এই প্রসঙ্গের অবতারণাও প্রবাদে করা হয়েছে।

ক. কড়ি বিনা শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায় না।

খ. পণছাড়া বিয়ে,
কী হবে সে মেয়ে নিয়ে।

অর্থাৎ পণের মূল্যেই নারীর মূল্য বিবেচিত হত সমাজে। আর মেয়ের রং যদি কালো হয়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। পণের পরিমাণও যায় বেড়ে:

গ. কালো মেয়ে কি থাকবে ঘরে,
সব বিকোবে বাজার দরে।

ঘ. ঘর করতে চাই দড়ি
বিয়ে করতে চাই কড়ি।

ঙ. হাঁড়ি কিনবে বাজিয়ে
বৌ আনবে সাজিয়ে।

চ.	বরণী নাচে, বর নাচে, নাচে কনের মন,
মাথায় মাথায় ভাবনা তার, যার দিতে হয় পণ।

বিবাহে 'দেনাপাওনা'র করুণ কাহিনি বাংলা সাহিত্যে প্রচুর। এ ক্ষেত্রে বিবাহযোগ্যা কন্যার আত্মবলিদান শুধু নয়, কন্যাদায়গ্রস্তপিতার মর্মন্তুদ চিত্র ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে তির্যক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে শেষোক্ত প্রবাদটিতে।

পণপ্রথার সঙ্গে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। বাঙালি সমাজে কৌলীন্য প্রথা অনুযায়ী এক সময়ে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই দুই প্রথার কুফল নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আন্দোলনও কম হয়নি।— এ বিষয়েও প্রবাদ শোনা যায়। ঠিক বয়সে বিবাহ না হলে সে মেয়ে সমাজের কাছে পরিত্যাজ্য। প্রবাদে সে কথাও উচ্চারিত হতে শোনা যায়:

যে মেয়ের বিয়ে হয় না,
সে তো সমাজের ফেলনা।

আবার বিবাহ-প্রসঙ্গে সমাজে নারীর নিজস্ব মতামত অপেক্ষা অভিভাবকদের মতামত যে গুরুত্ব পেত তাও প্রবাদে বলা হয়েছে—

বাবা মা যাকে বলবে বিয়ে করতে
তারই গলায় হবে কন্যাকে মালা দিতে।

বহুবিবাহ-প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে প্রবাদের মধ্যে:

ভাগে পড়েছে একটা ছেলের জন্য পাঁচটা মেয়ে
তাই যত খুশী মেয়েকে কর তুমি বিয়ে।

মনু বা রঘুনন্দন শাসিত বাঙালি সমাজে বাল্যবিবাহ এবং অসমবিবাহ এক সময়ে খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রথার যে পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক এই মতের সমর্থনে বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকেই বাল্যবিবাহ এবং অসমবিবাহের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা পুরুষের বিবাহের বয়স এবং স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম নির্ধারণ করায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন, "চব্বিশে এবং আটে বিবাহ হইলে হাড়ে হাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও পারে কিন্তু সে মিশ্রণ সত্বর বিশ্লিষ্ট হইতে আটক নাই। দম্পতির বয়সের এত ব্যবধান

থাকিলে আমাদের দেশে বিধবা সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িবে সন্দেহ নাই।"[৪] এই কবিকথার মেয়েলি রূপান্তর তীব্র বিদ্রূপ ও খেদোক্তির সঙ্গে প্রবাদে ধরা আছে :

বেশ হয়েছে বামুন ঠাকুর
তোমার কথা মানি
বারো বছর বিয়ে হয়েছে
স্বামী বলে না জানি।

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' প্রবাদটি সমাজে সুপ্রচলিত ছিল। অসমবয়সি বরের সঙ্গে কন্যার বাল্যবিবাহ হলে পরে তার পরিণতি কতটা মর্মান্তিক হতে পারে তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে প্রবাদে উচ্চারিত হয়েছে তা। কেবল হিন্দু সমাজ নয় মুসলমান সম্প্রদায়কেও রেয়াত করা হয়নি সেখানে:

বিবি যখন বড়ো হবে
মিঞা তখন কবর পাবে।

সমাজে বহুবিবাহ প্রথা ছিল। বহুবিবাহ মানেই সতিন সমস্যা। এ প্রসঙ্গে বর ও বধূকে ব্যঙ্গ করে কৌতুকপূর্ণ প্রবাদ শোনা যায়:

ক. ছেঁড়া কচুর পাত
এক মাগকে ভাত দেয় না
আবার মাগের সাধ।

খ এক বরের মাগ হেলা-ফেলা
দোজবরের মাগ গলার মালা ৷৷

গ. দোজবরে ভাতারের মাগ
চতুর্দশীর চোদ্দ শাক।

ঘ. এক বরে মাগ নাড়ে চাড়ে
দোজবরে মাগ পুড়িয়ে মারে।

বিবাহের পরেই আসে সন্তানের কথা। মানব সমাজে বংশরক্ষায় যেহেতু পুত্রের গুরুত্ব অধিক, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই প্রচলিত পদবন্ধটি তাই

বাঙালি মানসিকতায় চেপে বসে আছে আজও। অথচ সমাজে কন্যাসন্তানের প্রয়োজন যে কতটা 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সে কথা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। একালের আধুনিক জীবনেও কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা এতটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে কন্যা-ভ্রূণ হত্যা রোধ করতে। এই সামাজিক অন্ধত্ব বাঙালি সমাজের কত গভীরে প্রোথিত ছিল প্রবাদগুলি তার প্রমাণ। সমাজে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রের কামনা অধিক। পুত্রের জন্মের পর তার অত্যধিক আদরের কথা এবং পরিবারে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের স্থান কত ওপরে প্রবাদের মধ্যে তা ধরা পড়েছে:

ক. ছেলে শিখবে লেখাপড়া
মেয়ে শিখুক রান্না করা।

খ. ছেলেরা হীরের আংটি
মেয়েরা মাটির কলসী।

গ. পুত্র সব সম্পদ,
কন্যা সব আপদ।

ঘ. ব্যাটার সখ মেটাও
ঝিকে ধরে পেটাও।

ঙ. পুত্র সুখের চিত্ত
কন্যা দুঃখের চিত্র।

চ. পুত্র বলে বংশ বাড়ে
কন্যা যাবে পরের ঘরে।

ছ. ছেলে হলো হীরের টুকরো
মেয়ে হলো খুদকুঁড়ো।

জ. ছেলে বিয়োলে স্বর্গবাস
মেয়ে বিয়োলে নরকবাস।

ঝ. পুতের মুতে কড়ি
মেয়ের গলায় দড়ি।

উক্ত প্রবাদগুলির মধ্যে দিয়ে সংসারে কন্যা ও পুত্রের স্থান, ছেলের আদর ও মেয়ের অনাদর বিষয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষণীয়।

সমাজে নারীর অস্তিত্ব না থাকলে আমরা তার যথার্থমূল্য অনুধাবন করতে পারতাম। নারীসমাজের প্রতি সর্বাধিক অবহেলা অত্যাচার উৎপীড়ন শোষণ দেখে শরৎচন্দ্র এমনটা মন্তব্য করলেও পুরুষশাসিত বাঙালি সমাজের টনক নড়েনি। নানা সামাজিক প্রথা ও রীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীর মুক্তির দিশা হতে পারে শিক্ষা। শিক্ষাই তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। অথচ পুরুষসমাজ সেটা চায় না। সমাজের অর্ধেক মানুষ এইভাবে দুর্বল হলে সামাজিক সংকট তৈরি হয়। সে সংকট যে সৃষ্টি হয়েছে অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তা দেখিয়েছেনও। অথচ কতপূর্বেই না রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন আমাদের। সমাজে নারীশিক্ষাকে ভাল চোখে দেখা হত না। প্রবাদেই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আছে :

ক. মেয়ে যত পাশ দেবে
মাথায় তত চড়ে বসবে।

খ. মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক।
খুন্তি তো নাড়বেই।

গ. লেখাপড়া যে মেয়ে করে
তাকে নিয়ে দুর্ভোগ সংসারে।

ঘ. স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী
শিখলে লেখাপড়া হবে বাড়াবাড়ি।

কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এসব কথা আজ আর খাটে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লজ্জা,... বাটনা-বাটা কোটনা-কাটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য বাজার দরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকেব দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো আনা খাটছে না।"[৫]

আবার সধবা নারীর লেখাপড়া শেখা উচিত নয়, সে লেখাপড়া শিখলে তার ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কেও প্রবাদে পাওয়া যায় :

ঙ. লেখাপড়া শিখলে
বিধবা হবে অকালে।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার কারণে পদস্খলিত বিধবা নারী সামাজিক অবক্ষয়ের বিষময় ফল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের নাটকে-উপন্যাসে বাঙালি সমাজের এই সমস্যা নানা দিক থেকে উদ্‌ঘাটিত। বাংলা প্রবাদে এমনতরো পদস্খলিত নারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে মেয়েলি বচনে :

ক. ন্যাকা মাগী শাঁখা পরে
ভাতার এলে এলিয়ে পড়ে।

খ. ঢ্যামনা মাগীর ঢ্যামনা মন
পরপুরুষকে করে আপনজন।

গ. খানকী, তার মান কি।

ঘ. খানকীর আবার জাতের বিচার।

ঙ. বাজারে নাম লেখালে জাতের ভয় কি।

—'বাজারে নাম লেখালে' অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি করলে।

চরিত্রহীন নারীদের প্রতি তীব্র কটূক্তি শুধু নয়, শেষোক্ত প্রবাদটিতে সমাজের ঘৃণাও প্রবলভাবে ধরা পড়েছে।

বাঙালি সমাজে বৈধব্য-সমস্যা এতই প্রবল যে একসময়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলন করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হলেও হিন্দুসমাজে তেমনভাবে গৃহীত হয়নি তা। বিধবা নারীর কৃচ্ছ্রসাধন, কঠিন বিধিনিষেধ তাকে অশেষ দুর্গতির পথে ঠেলে দিয়েছে। প্রবাদে সে ছবির বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন বাঙালি সমাজের দলিলস্বরূপ। তেমনই বিধবার আচরণ ইত্যাদি নিয়ে প্রবাদে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে :

ক. বিধবার একাদশী করলে আর ভাল কি
না করলেই নিন্দা।

খ. সধবার কপালে সিন্দূর দেখে
বিধবারা মরে দুখে।

গ. বিধবার জীবন
প্রত্যাশায় সর্বক্ষণ।

ঘ. পুরুষ করবে যা খুশী তাই
বিধবার তাতে নাক গলাতে নাই।

বিধবার আচার আচরণ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয় শুধু, অনাচার নিয়েও কটূক্তি করা হয়েছে প্রবাদে :

ঙ বিধবার মতি
ধরে ভীমরতি।

চ. একে ষাঁড়ের ভাত
তায় মুসুরীর ডাল।

সহমরণ প্রথা নিয়েও প্রবাদে বলা হয়েছে :

পতির মরণে সতীর মরণ।

আমরা আগেই বলেছি বহুবিবাহ পীড়িত সমাজের অন্যতম কুফল ছিল যৌথ পরিবারে সতিন সমস্যা। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল সতিন সমস্যা। প্রচলিত এই প্রথার বিচিত্র সমস্যা বাংলা প্রবাদগুলিতে ধরা আছে।

পাবিবারিক জীবনে সতিনের জ্বালা যে-কোনও নারীর পক্ষে বড জ্বালা। সপত্নী বিদ্বেষে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। এই সতিন সমস্যা অর্থাৎ সতিনদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের নিষ্ঠুর প্রসঙ্গে প্রবাদে বেশ ধিক্কার ও প্রতিবাদের সুরেই উচ্চারিত হয়েছে :

ক. যমকে ভাতার দিতে পারি।
সতীনকে তবু দিতে নারি।

অর্থাৎ যমকে স্বামী দিতে রাজি থাকলেও সতিনকে স্বামী দিতে নারাজ, এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদটিতে। স্বামী যে স্ত্রীর কাছে কত আপন, সতিন কণ্টকস্বরূপ তাও বলা হয়েছে, আর একটি প্রবাদে :

খ. উৎবেড়ালী উৎ খা
স্বামী রেখে সতীন খা।

বাঙালি হিন্দু নারীর জীবনে সতিন যে কত বড় কণ্টকজ্বালা ছিল এর থেকে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আবার প্রবাদে সতিনের প্রতি অবিশ্বাসও প্রকাশিত হতে দেখা গেছে :

গ. সতীনের হাত, সাপের ছোঁ
চিনি দিলে তুলে থো।
সতীনের ডাক নিশির ডাক
তিন ডাকে চুপ করে থাক।

প্রবাদগুলির বেশির ভাগ যেহেতু নারীদের সৃষ্টি, তাই নারীসমাজের সব থেকে জটিল সমস্যাটি নিয়ে নিজেরাই বেশি উচ্চকণ্ঠ হয়েছে।

সতিনের ঘরে সবসময়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। একজন আর একজনকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। এ লড়াই স্বামীর প্রতি অধিকারের। প্রবাদে শোনা যায় :

ঘ. সতীনে সতীনে বাদ
প্রতি কথায় প্রতিবাদ।

ঙ. সব কিছুরই ভাগ দেওয়া যায়।
স্বামীর ভাগ না ছাড়া যায় ॥

চ. একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল, 'আঁস্তাকুড়ের' হলাম কুকুর।

ছ. দিন গেল হেলায় ফেলায়
রাত গেল সতীনের জ্বালায়।

জ. যে নারী সতীনে পড়ে
তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

এহেন সতিন নিয়ে ঘর করলে সতিনের প্রতি বিদ্বেষে তাকে মেরে ফেলার কথাই মনে আসে সপত্নীর। তাই প্রবাদের সতিন অবলীলায় বলে :

ক. বঁটি বঁটি বঁটি
সতীনকে কুটনো কুটি।

খ. অশথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি।

সপত্নী বেদনার মূলকথা এইভাবেই প্রবাদে ধরা পড়েছে,— সেখানে নারীর নিজস্ব সামাজিক-পারিবারিক এবং হৃদয়গত অধিকারকে ভাগ করে দিতে হয়। এহেন জ্বালা সহ্য হয় না বলেই বাঙালি গৃহবধূ সহজেই কামনা করে মৃত্যুর :

সাত সতীনে নড়ি চড়ি
বেড়ার আগুনে পুড়ে মরি।

সতিনের পরেই আসে সপত্নীপুত্রের কথা। সপত্নীপুত্রদের প্রতি আক্রোশও প্রবাদে লক্ষ করা যায় :

ক. সতীনের পুত।

খ. সতীনের পোয়ের হাত দিয়ে সাপ ধরানো।

আবার সপত্নীপুত্র যে বিমাতার সংসারে সুখে-আদরে থাকে না সেকথাও প্রবাদে শোনা গেছে :

সৎমার মুখ নাড়া
সবার উপর যেন খাঁড়া।

পুরুষশাসিত বাঙালি সমাজে সতীত্ব নারীজীবনের প্রধান সম্পদ। সতীত্ব রক্ষাই তার কাছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সামিল। অসতী নারীর ঠাঁই নেই সমাজে। প্রবাদে সতী ও অসতী নারীর প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে :

ক. পতির পায়ে থাকে
তবেই তারে বলে সতী।

খ. নষ্ট নারীর পরিচয়
বুদ্ধিগুণে সতী হয়।

গ. সতী নারী গঙ্গাজল
অসৎনারী বদ্ধ জল।

ঘ. সতী যায় রথে
অসতী যায় সোঁতে।

ঙ. সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া
অসতীর পতি যেন ভাঙা নথের গুড়া।

দেখা যাচ্ছে প্রতিটি প্রবাদেই সতী নারীর গুণকীর্তন এবং অসতী নারীকে হেয় করা হয়েছে। আবার কলঙ্কিনী নারীর দুঃখের কথাও ধরা আছে প্রবাদে :

ক. যতই কর শিবসাধনা
কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

খ. পুড়বে নারী, উড়বে ছাই, তবু না তার কলঙ্ক যায়।

আবার সতীত্বের ভড়ং নিয়ে প্রবাদে ব্যঙ্গও করা হয়েছে :

ক. বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি
যুবাকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী।

খ. মাছ ছেড়েছি, মাংস ছেড়েছি, ধর্মে দিয়েছি মন
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছে বৃন্দাবন।

সমাজে সতিন সমস্যা যেমন আছে, তেমনি অনেক পরিবারে আছে শাশুড়ি-পুত্রবধূর কলহ, মনোমালিন্য, তিক্ততা। পুত্রবধূ প্রসঙ্গে শাশুড়ির মনোভাব কয়েকটি প্রবাদে চমৎকার ধরা পড়েছে : পুত্রবধূর আচরণ নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত :

ক. একে বউ নাচনি, তায় খেমটার বাজনি।

বিয়ের পরে পুত্র বধূর অনুগত হয়ে যায়। সেই স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি কটাক্ষ করে শাশুড়ির মনোবেদনার প্রকাশ :

খ. কী করবে পুতে
কান ভাঙানির কাছে সে যে নিত্যি যায় শুতে।

এ ধরনের মানসিকতা বিষয়ে আর একটি প্রবাদ হল :

গ. মা-বাপ ডেও-ঢাকনা, শাল-শালাজ নিয়ে ঘরকন্না,
ঘরে আছে সিদ্ধেশ্বরী, তার মত নে কর্ম করি।
তুমি মা সিদ্ধেশ্বরী, পা ধুয়ে দাও গণ্ডূষ করি।

পরিবারে পুত্রবধূর কর্তৃত্ব এবং পুত্রের শ্বশুরশাশুড়ির প্রভাব পুত্রের পিতা-মাতার সহ্য না হওয়ারই কথা। অপরপক্ষে পুত্রবধূর রূপহীনতার প্রতি শাশুড়ির কটাক্ষও প্রবাদে বিধৃত হয়েছে :

কোন্ কালে বউ রূপসী,
জাড়কালে বউয়ের জাড়কাটা, গরমি কালে ঘামাচি।

বাড়ির বউয়ের প্রতি বিরূপতা যত তীব্র, গিন্নি ও কন্যার তুলনায় তার কীভাবে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়, একটি তুলনাত্মক প্রবাদে চমৎকারভাবে তা উপস্থাপিত হয়েছে :

গিন্নি ভাঙল নাদা, ও কিছু নয় দাদা।
মেয়ে ভাঙল কাঁসি,—পড়ল একটা হাসি,
বউ ভাঙল সরা, গেল পাড়া পাড়া।

পুত্রবধূর বাপের বাড়ি যদি দরিদ্র হয়, তা হলে শাশুড়ি তার বাপের বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে কীভাবে খোঁটা দেয় প্রবাদে তার পরিচয় আছে তির্যক উপস্থাপনায় :

ঘুঁটে কুড়ুনির বেটি পেলে রাজপুত্তুর বর,
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে— কোন্ গাছের ফল।

অর্থাৎ বধূটি এমন ভাণ করছে যে অতিসাধারণ মানের খাদ্যবস্তুও সে চেনে না!

তা ছাড়া নিজের কন্যার তুলনায় সংসারে বধূর আধিপত্য শাশুড়ি সহ্য করতে পারে না, তার রূপের প্রতি কটাক্ষ করে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করতেও ছাড়ে না :

পদ্মমুখী ঝি আমার শ্বশুরবাড়ি যায়,
আর উনোনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায়।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের গবেষণা থেকে জানা গেছে বাঙালি মেয়েরা খাদ্যাভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। দরিদ্র পরিবারেই শুধু নয়, মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারেও এমন ঘটনা ঘটার কারণ, বাড়ির পুরুষদের খাওয়া শেষে মেয়েদের খাওয়ার অভ্যাস যখন প্রায় ক্ষেত্রে খাদ্যবস্তু অবশিষ্ট থাকে কম। এই প্রথা বা নিয়ম দীর্ঘদিন থেকে বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকায় শারীরিকভাবে বাঙালি নারী দুর্বল। ভাল খাবার প্রায়ই তার কপালে জোটে না। এই অনুশাসনসর্বস্ব সামাজিক অসংগতির প্রমাণ প্রবাদেও ধরা আছে :

বউমা, ক্ষীর রইল খাবে,
খাবে তো যমের বাড়ি যাবে।

এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শাশুড়ির প্রতি বধূদের বিদ্বেষও চরম অবস্থায় পৌঁছয়। শাশুড়ির মৃত্যুতেও সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় না :

শাশুড়ি মল সকালে—
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে তো কাঁদব গিয়ে বিকালে।

বাঙালি পরিবারে অন্তঃপুরের অম্লমধুর সম্পর্কের বিচিত্র কথা এইভাবেই ধরা আছে প্রবাদগুলিতে। ননদের সঙ্গে ভ্রাতৃজায়ার সম্পর্ক মধুর হলেও তিক্ততা, বিরূপতাই বেশি। ননদকে উদ্দেশ করে বহু প্রবাদ থেকেই তা বোঝা যায়। অলস ননদ ভ্রাতৃবধূকে কাজে সাহায্য করে না, অথচ খাওয়ার সময় মিথ্যা সন্তান-সম্ভাবনার কথা বলে বেশি খেতে চায় :

কাজকর্মে নেই কো ঠাকুরঝি,
চেপে চেপে ভাত বেড়ো আমি বালশে পোয়াতি।

বিপরীত ধরনের ঘটনাও প্রবাদে আছে। ননদকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে কিন্তু তাতেও ভ্রাতৃজায়ার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সেই খবরটাও মনে পড়েছে অনেক পরে। ননদের প্রতি ভ্রাতৃজায়ার এ হেন হৃদয়হীন আচরণ ধরা আছে প্রবাদে :

ভালো কথা পড়লো মনে আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি মায়ের মনঃকষ্টও প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদে :

ক. মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।

খ. কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নির পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই।

পুত্রবধূর দাপটে বৃদ্ধা শাশুড়ির দুরবস্থার শেষ নেই। বধূর আদরে কোপ পড়ে শাশুড়ির অনাদরে।

গ. পুতের ভাত, বউয়ের হাত।

ঘ. পুতের বিয়ে আপনি দিলাম।
বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী
গিন্নীপনা গেল ॥

ঙ. কি করবে পুতে
নিত্যি সে যে কান ভাঙানীর কাছে যায় শুতে।

শাশুড়ির এই মর্মস্পর্শী খেদোক্তিগুলিতে বাঙালি পরিবারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও অস্ফুট রেখাচিত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শাশুড়ি মাতা ও পুত্রবধূর অহি-নকুল সম্বন্ধই কেবল নয় পরস্পরের অপত্য মমত্ববোধ, স্নেহ-ভালবাসার কথাও প্রবাদে আছে :

আদরের বউ
ফালদ্যা কাড়ে রউ।

পুরুষশাসিত সমাজে নারী সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যসূচক প্রবাদগুলি একটা বিশেষ সমাজ-মানসের ছবিকেই স্পষ্ট করে তোলে :

ক. পুরুষের দশদশা, নারীর শুধু শোয়া বসা।

খ ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে।

গ. নারী নরের মরণ ফাঁদ।

ঘ. পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই।

ঙ. কড়ি দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে ঘর।

সামাজিক অনুশাসনের মতো এইসব প্রবাদমালা বহুদিনের সামাজিক অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবেই মানুষের কাছে গৃহীত হয়। প্রবাদগুলি সবই যে নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক তা নয়—নারী পুরুষ উভয়কে নিয়েই মানবচরিত্র। বিচিত্র মানবচরিত্রের লোকজ্ঞান এই প্রবাদ। নারীর কালো রং নিয়ে যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে তেমনি কৃষ্ণবর্ণের প্রতি অনুকূল মনোভাব নিয়েও প্রবাদ শোনা যায়। কয়েকটি সুন্দর উপমা দিয়ে চমৎকারভাবে তার গুণকীর্তন করা হয়েছে একটি প্রবাদে :

বটের ছায়া, কূপের বারি
ইটের বাড়ি, শ্যামা নারী।

স্বামী-স্ত্রীর চারিত্রিক ও স্বভাবগত বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে আর একটি প্রবাদে :

যেমন পাত্র ভজহরি, তেমনি কন্যে বিদ্যেধরী।

বাঙালি সমাজে একসময় ঘরজামাই প্রথা ছিল। ঘরজামাইয়ের কপালে আদরের পরিবর্তে অনেক সময়ই জুটত লাঞ্ছনা। তার প্রতি বিদ্রূপ ও কটূক্তি শোনা যায় প্রবাদে :

ক. ঘরজামাই আধা চাকর, সর্বলোকে বলে।
বাপ দাদার নাম নেই, ফলনার জামাই বলে।

খ. দূরজামাইয়ের মাথায় ছাতি
ঘরজামাইয়ের মুখে লাথি।

গ. যা ছিল আমানি পাতা মায়ে ঝিয়ে খেনু
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুখাতে দিনু।

নিজের বাড়িতে দূরে থাকা জামাইয়ের আদর এবং ঘরজামাইয়ের কপালে এহেন অসম্মান ও অনাদর যে জোটে আধুনিক কালেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অথচ কত প্রাচীনকাল থেকেই নারীকণ্ঠের কাকলি এই

প্রবাদমালায় পারিবারিক ইতিহাসের চূর্ণ হিসাবে তা ধরা আছে।

সমাজে বিচিত্র সমস্যার অন্যতম হল প্রবীণ মানুষদের বার্ধক্যজনিত সমস্যা। সমাজ এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এটাই কাম্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না, প্রবাদে বার্ধক্যের কষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে :

বুড়ো বয়সে ধাড়িপনা
না হয় সুখ কেবল যাতনা।

তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অবহেলার চিত্রও সেখানে দুর্লভ নয় :

বুড়োর মাথায় শালিক নাচে
আর কি বুড়োর বয়স আছে।

প্রতিবন্ধীকে সমাজের বোঝা হিসেবে না দেখে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। অথচ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অহরহ দেখতে পাই আমরা। বিদ্যাসাগরমশায়ের বর্ণপরিচয়ের নীতি-বাক্য—কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলবে না, কত সহজেই না প্রবাদে অস্বীকৃত হয়েছে :

কানা বলে আমি সব দেখতে পাই
খোঁড়া বলে আমি নদী ডিঙিয়ে যাই
কালা বলে আমি সব শুনতে পাই
বোবা বলে ইশারায় আমি বলি
কেয়ার থোড়াই।

সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণীর মানুষের কথা প্রবাদের মধ্যে দেখা যায়। প্রবাদে কৃষক, তাঁতি, গোয়ালা, কামার, কুমোর, চামার, ব্রাহ্মণ (যজমানি), বৈদ্য (চিকিৎসক), নাপিত, বেনে, জেলে প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গদেশে সমাজ গঠনে জাত-কর্মের বিভাজন করে দিয়েছিলেন রাজা হরিদেব বর্মের সান্ধিবিগ্রাহিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভবদেব ভট্ট। দশকর্মপদ্ধতি সংকলনই শুধু নয় 'নবশাখ' সম্প্রদায়কে পুরোহিতদান তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। নবশাখের পরিচয় আছে সেকালের একটি ছড়ায়:

তিলি, তাম্বুলী, মালী।
গোপ, নাপিত, গোছালী ॥

চিটে, পিটে, কামার।
এই নয় জাতি আমার ॥

এঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিলি বণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাম্বুলী— পান বিক্রেতা, মালী— মালাকার, গোপ— সৎগোপ ও পল্লব গোপ। নাপিত— ক্ষৌরকার, গোছালী— বারুজীবী, বারুই, যাহারা পানের চাষ করে। চিটে—মোদক, ময়রা। পিটে— কুমোর, কামার— কর্মকার, লৌহের অস্ত্রশস্ত্র ও কৃষিকার্য ও গৃহোপকরণ নির্মাতা।"*

এই বৃত্তি বিভাজনের দেখাদেখি অন্যান্য জাতিরাও যেমন কলু, স্যাকরা, শুঁড়ি, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ও পুরোহিত লাভ করেছিল। সমাজে মুচির বামুন, শুঁড়ির বামুন, কুমার বামুনও দেখা যায়।

বৃহত্তর বঙ্গসমাজ এইসব বৃত্তিধারীদের নিয়েই গঠিত। গ্রামগুলি বামুনপাড়া, কুমোরপাড়া, বাগদিপাড়া— এরকম কিছু পাড়ার সমন্বয়মাত্র। বাংলা প্রবাদে এইসব বৃত্তিধারীদের চমৎকার পরিচয় আছে। আছে তাদের কর্ম অনুযায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাও। তবে একালই হোক বা সেকালই হোক প্রতিটি যুগেই শ্রমজীবী মানুষেরাই সমাজের পিলসুজ। দুর্ভাগ্যপীড়িত সেইসব খেটে খাওয়া মানুষের ছবিও প্রবাদে উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-বেদনা, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, বিরামহীন খাটুনি নিয়ে হাহুতাশ এইসব প্রবাদের উপজীব্য।

যেমন—

ক. খেটে খাওয়া যাদের বরাত
কাটবে না তাদের দুখের রাত।

খ. মুখে কথা নয়
কাজ কথা কয়।

গ. অভাগা যেদিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়।

ঘ. মালিককে যে সুখে রাখে
তার বরাতে দুঃখ না থাকে।

ঙ. গরীবের খেটে খেটেই মরতে হবে
কোন ভায়া আর কি করবে।

প্রবাদগুলিতে খেতমজুর ও শ্রমিকের সমাজে স্থান কীরূপ অর্থাৎ তাদের দুঃখ কষ্টের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কোনও কোনও প্রবাদে শ্রমজীবী মানুষের ওপর অত্যাচারের কথাও পেয়েছি আমরা :

মজুরকে লাথি
হুজুরকে সেলাম।

সাধারণত দরিদ্র মানুষই এইভাবে অসম্মানিত হত।

প্রবাদে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও তাদের পেশাগত দিককে ব্যঙ্গ করতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও শ্রেণীকৌলীন্যের জেরে অনেক অন্যায় সুযোগ সে নেয়। সেই ব্রাহ্মণ সম্পর্কে সামাজিক মানুষের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদে। যজমানি ব্রাহ্মণ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ক. বামুন বাদল বান, দখিনা (দক্ষিণা) পেলেই যান।

খ. বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

গ. কালির অক্ষর নেইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।

কায়স্থদের ধূর্ততাকে ব্যঙ্গ করে যেমন প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি তাদের জীবিকার প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে :

কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত।

কিংবা,

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।

গণকের ভণ্ডামিও প্রবাদে বিধৃত :

রাজা খায় ডেড়ে, গণক খায় ভেঁড়ে।

জমিদারদের শোষণে মানুষ একসময় ছিল তিতিবিরক্ত, তাই প্রবাদে জমিদার সম্পর্কে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়েছে ·

শাপ শালা জমিদার, তিন নয় আপনার।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেকালে স্বৈরাচারী শাসনের দাপট ও উৎপাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রবাদে :

ক. বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

খ. জোর-যার মুলুক তার।

গ. খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই গুরুত্ব পেয়েছে প্রবাদে। বৈদ্যের অর্থলোলুপতা অর্থাৎ চিকিৎসকের চিকিৎসা অপেক্ষা কড়ির লোভকে প্রবাদে ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

অর্থাৎ

বৈদ্য টাকা ছাড়া কিছু করে না।

প্রবাদটি একালে বেশি করে প্রযোজ্য। আবার বৈদ্য যদি ভাল চিকিৎসা করতে না পারেন, তবে তার সম্পর্কে কটূক্তিও আছে প্রবাদে :

এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই, ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ।

সমাজে কবিরাজের সম্মান-অসম্মান দুই ছিল :

খালি পেটে বদরিকা, ভরা পেটে বেল।
কবিরাজ দেখে বলে এই রোগীও গেলো ॥

গোপাল হালদার বলেছেন, "তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (means of living) দিয়াই তখনকার সমাজের পরিচয়।"[৩] বাংলা প্রবাদগুলি লক্ষ করলে একথার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। শুধু কায়স্থ বা বৈদ্য নয়, পূর্বে উল্লিখিত 'নবশাখ'-এর অন্তর্গত পেশাজীবীদের খুঁটিনাটি বিবরণ পাই প্রবাদমালায় :

নাপিত হল কবিরাজ
ক্ষৌরি করে কে?

নিজের বৃত্তিকে লঙ্ঘন করে অধিক সম্মানের আশায় অপরের বৃত্তি গ্রহণ করলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এরকম আর একটি প্রবাদ :

খেতো তাঁতি তাঁত বুনে
কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।

বয়নশিল্পী তাঁতির কাজের একনিষ্ঠতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

তাঁতি তাঁত বুনতেই মন
তাঁতি কৃষ্ণকথা শোন ॥

প্রবাদে ধোপার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এইভাবে ধরা পড়েছে :

ধোপা পরের কাপড়ের শোভা।

গোপ জাতি সম্পর্কে সমাজের সাধারণ মানুষের ধারণা এদের স্বভাব সহজ সরল নয়, সুযোগ পেলেই দুধে জল মেশায়। প্রবাদেও তার উল্লেখ আছে :

গাই গয়লা ভাব থাকলে
আধসের দুধ এক হাঁটু জলে।

স্বর্ণকার সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ অবিশ্বাসী। সুযোগ পেলেই সোনা হাতিয়ে নেয় সে— এটা তার স্বভাব। অতিপ্রচলিত প্রবাদে তার স্বভাব চরিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে :

স্যাকরা নিজের মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

বোষ্টম-বৈরাগীও প্রবাদের ব্যঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি—

ক. সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে।

উদরপূর্তির প্রত্যাশাই বৈরাগী ভিক্ষুকের নৃত্যের কারণ। এদের ভণ্ডামির কথাও প্রবাদে চিত্রিত হয়েছে :

খ. মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।

গ. তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।

কৃষকদের নিয়ে যে সব প্রবাদ আছে, তার বেশির ভাগই তাদের চিরকালীন দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা নিয়ে :

ক. চাষা মরে সেও ভালো, কিন্তু পরের কাস্তে যেন না হারায়।

খ. চাষার দুঃখ এগারো মাস।

গ. চাষা যদি করে হিত, করতে করতে বিপরীত।

জেলেদের সম্পর্কেও সেই একই কথা অর্থাৎ দারিদ্র্য :

জেলের পরনে টেনা, পাঁজারির কানে সোনা।

কিংবা,

জেলের পাছায় হাঁড়ি।

কামার-কুমোর সম্পর্কেও চমৎকার প্রবাদ আছে :

কামার মানুষের কুমার কাম।

অর্থাৎ কামারের কুমোর বৃত্তি সাজে না।

পেশিশক্তিই কামারের মূলধন, তাই বৃদ্ধ দুর্বল কামার অকেজো বিবেচিত হয়। এ নিয়ে একটি প্রবাদ আছে :

কামার বুড়ো হলে ভেরেণ্ডার গাছে সার।

চাকুরিজীবী—চাকুরিজীবীদের স্বাধীনতা নেই, অর্থাৎ তার কর্মজীবন নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ। কর্মস্থলে কোনও ওজর-আপত্তিও খাটে না। মধ্যবিত্ত চাকুরে বাঙালি সম্পর্কে তাই প্রবাদ :

ছোট কুকুরের ওজর আছে চাকুরের ওজর নেই।

কবি ভারতচন্দ্রও চাকরিকে ধিক্কার দিয়েছেন বারবার তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে :

"এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক।"

কিংবা,

চাকুরির মুখে ছাই—ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি।

উকিল—হুট করে আইনব্যবসায়ী অর্থাৎ উকিলের কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। তার চেয়ে আপসে বিবাদের মীমাংসা অনেক ভাল। এর জন্যে বিবাদীর কাছে যদি নিজে যেতে হয় সেও ভাল। প্রবাদে এই সামাজিক অনুশাসন চমৎকারভাবে ধরা আছে :

বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে
উকিল পাঠাবে না, আপনি যাবে।

ঘটক—পুরাকালে তো বটেই, একালের সমাজেও বিবাহের ব্যাপারে ঘটকের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। সাধারণত ঘটক অত্যন্ত চতুর স্বভাবের হয়। প্রবাদে তার সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা আছে এইভাবে :

সমাজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।

মাতাল—মাতাল বিশ্বাসযোগ্য নয়, তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তাই মাতালের আচার-আচরণের সঙ্গে হাত ও শিং বিশিষ্ট জন্তুর স্বভাবের তুলনা করে প্রবাদে বলা হয়েছে:

মাতাল দাঁতাল শিঙে, বিশ্বাস নেই এই তিনে।

চোর—সমাজে চোরের অভাব নেই, চোরকে যতই বোঝানো যাক না কেন, সে চুরি করবেই। চুরি বিদ্যা যার স্বভাবে, নীতিকথা ধর্মকথা তার কানে প্রবেশ করে না। চৌর্যবৃত্তির এই বৈশিষ্ট্য প্রবাদে স্থান পেয়েছে :

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

কিংবা,

চোর খোঁজে আঁধার রাত।

কাজি—সমাজে অনেকসময় বিচারক হিসেবে কাজির স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ দেখা যেত। মধ্যযুগের বাংলাদেশে ইসলামিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারকার্যের জন্য নিযুক্ত হতেন কাজি। এঁরা সবসময়ই যে নিরপেক্ষ বিচার করতেন তা নয়। তাই প্রবাদে 'কাজির বিচার' কথাটি থাকলেও, কাজির প্রতি শ্রদ্ধার চেয়ে অশ্রদ্ধাই বেশি প্রকাশিত হয়েছে :

কাজির গাই কোরাণে আছে, কেতাবে নেই।

কিংবা,

কাজির বাড়ির খানা, পাত কাটলে মানা।

সমাজের নানা ন্যাকা-বোকা চরিত্র নিয়ে বহু প্রবাদ শোনা যায়। অসম্ভব কল্পনা, অহেতুক লজ্জা, ফাঁকা আওয়াজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সৃষ্ট প্রবাদগুলি বাঙালির মুখে মুখে ফেরে :

ক. কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান।

খ. নাচতে নেমে ঘোমটা টানা।

গ. ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার।

ঘ. লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী।

পরছিদ্রের অন্বেষণ করা মানুষের প্রকৃতিজাত ধর্ম। এ প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত প্রবাদটি হল :

চালুনী বলে—ছুঁচ, তোর পিছে কেন ছেঁদা।

অল্পশিক্ষিত মানুষের প্রতি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আছে :

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

ছোট জিনিসের মধ্যেও যে ভয়ংকরশক্তি থাকে বিশিষ্টার্থক 'ধানিলঙ্কা'র প্রয়োগ-ব্যবহারে তা বোঝা যায়।

সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অন্যতম বিষয় হল প্রেম-ভালবাসা। প্রবাদে প্রেমের স্থান অনেকখানি জায়গা জুড়ে, কখনও ভাল অর্থে, কখনও বা মন্দ অথে :

ক. চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।

খ. পিরীতের পেত্নীও ভাল।

গ. যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখাও লাভ।

প্রবাদের রাজ্যে কিছু নীতি উপদেশমূলক কথাও আছে :

মালা জপ মিছে, মন নয় পিছে।

কিংবা,

পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত।

প্রবাদ জানিয়ে দেয় বাংলার লোকসমাজ বিশ্বাস-সংস্কারের অধীন। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও বেশী পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহাব সামাজিক ব্যবস্থা হইতে—তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচারবিচার, উৎসব অনুষ্ঠান জানিলে।"[৮] কৃষিজীবী মানুষ সোম ও বুধবার গোলায় হাত দেয় না, কেননা তা অকল্যাণকর। সামাজিক অনুশাসনের মতো প্রবাদ তাই বলে :

সোম বুধে না দিও হাত
ধাব করে খেও ভাত।

যাত্রা সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সংস্কার হল কোথাও যাবার সময় পথে কচ্ছপ দেখলে সে যাত্রা শুভ হয় না, তাই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে বলা হয়েছে :

কচ্ছপ অযাত্রা।

প্রবাদে ব্যক্তি সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংস্কারও বিদ্যমান, সকালবেলা নিঃসন্তান ব্যক্তির মুখদর্শন অশুভ। প্রভাতে এমন ঘটনা ঘটলে সারাদিন নানাভাবে দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, এমনকী অন্নও জোটে না। তাই প্রবাদে বলা হয়েছে:

আটকুড়ার মুখ দেকলি, দিন যায় উপআসে।

('আটকুড়া' অর্থাৎ নিঃসন্তান, 'উপআসে' অর্থাৎ উপবাসে।)

গুরুজন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরিবারের বিশ্বাস ও সংস্কারজনিত কারণে ভাশুরের নাম উচ্চারণ করা লোকাচার বহির্ভূত। এই সংস্কার প্রবাদেও স্থান পেয়েছে :

ভাইয়ের নাম চূড়ামণি, চূড়াব নাম ধরতে না পারি।

বিবাহ আচারে যে সাতপাকে বন্ধনের কথা আছে সেটি সম্পর্কে লোকজীবনের সংস্কার হল :

সাতপাকের বিয়ে চোদ্দ পাকেও খোলে না।

বাঙালি পরিবারে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এমন পারিবারিক কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের সমাগম ঘটে। এদের মধ্যে কেউ যদি কর্মবিমুখ অলস হন তা হলে তাঁকে বিদ্রূপের শিকার হতে হয়। প্রবাদের তির্যক ভঙ্গিতে সে ব্যঙ্গ মারাত্মক হয়ে ওঠে :

খাবার সময় মস্ত হাঁ
উলু দেবার সময় মুখে ঘা।

এরকম পারিবারিক অনুষ্ঠানে ভাল অর্থাৎ সাহায্যকারী কুটুম্বেরও আগমন ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই তার প্রতি গৃহিণীর অতিরিক্ত ভালবাসা। সেই কুটুম্ব সম্পর্কে প্রবাদে আছে :

এমন কুটুম্ব কই বা পাই
গাদাখান থুয়ে লেজাখান খাই।

মানুষের সামাজিক কর্তব্য আতিথেয়তা। পরিবারে অতিথি এলে মানুষ খুশিও হয়। গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি প্রসঙ্গে প্রবাদ পাই :

যেখানে গেরস্থের বাসা
সেখানে অতিথির আশা।

কিন্তু বাড়িতে যদি অতিথি বেশিদিন থাকে, তখন অতিথির আর আদর থাকে না। প্রবাদে সে প্রসঙ্গও আছে :

মাছ আর অতিথি দুদিন পরেই বিষ।

তা হলেও অতিথিপরায়ণ হিসাবে বাঙালির সুনাম আজও অব্যাহত। বিশেষত পল্লীবাংলার মানুষের সুনাম আছে। এ সম্পর্কেও প্রবাদ শোনা যায়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রবাদ হল :

আস বেহাই বস বেহাই
দু বেহাইতে তামাক খাই।
তোমার মেয়ে আমার ছেলে
ঘর করছে মন্দ নয় ॥

প্রবাদটির মধ্য দিয়ে আবার দুই বেয়াইয়ের পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্কও পরিস্ফুট হয়েছে।

মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাস করে। কারণ সমাজে অদৃষ্টে বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। অদৃষ্ট সম্পর্কিত প্রবাদ হল :

কপাল ছাড়া পথ নাই।

কিংবা,

অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল।

ধার কর্জ করা এক ধরনের মানুষের যেমন স্বভাব, তেমনি আবার কিছু মানুষ আছে যারা আর্থিক প্রয়োজনের তাড়নায় ধার বা ঋণ করে। স্বাভাবিক কারণেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজে যথেষ্ট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হত। প্রবাদের সমাজ অনুশাসন :

কর্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।

কিংবা,

কর্জ করে ঘি খায়, চিরকাল কষ্ট পায়।

পূর্বে টাকাপয়সা অর্থে কড়ি শব্দটি প্রচলিত ছিল। কড়ি সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। কড়ি থাকলে কী হয়, আর না থাকলে কী হয় তা প্রবাদে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ধনবান ও ধনহীন ব্যক্তির সামাজিক ফারাকটুকু চিহ্নিত হয়েছে প্রবাদমালায় :

যার কড়ি তার জয়।

সমাজে বেগার খাটা বা খাটাবার রীতি প্রচলিত ছিল। তাই প্রবাদে বেগার দেওয়া প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানানো হয়েছে :

অরাজ্যে বামুন বেগার।

প্রবাদে অধিক সন্তান সন্ততি থাকার কুফল সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে :

অধিক সন্তান যার, অশেষ দুর্গতি তার।

মদ্যপান বহুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। সমাজে মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে প্রবাদমূলক অনুশাসন আছে :

যে ঘরেতে মদ্য ঢোকে
লজ্জা পালায় সে ঘর থেকে।

কিংবা,

এক দিন মদের জোরে
সাত দিন মাথা ঘোরে।

বেশ কিছু প্রবাদে যেমন জাতীয় ইতিহাসের টুকরো ছড়িয়ে আছে, তেমনি আছে বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির সামাজিক পরিচয় :

ক. ধান ভানতে মহীপালের গীত।

খ. কৃত্তিবেসে কাশীদাসে, আর বামুন ঘেঁষে এই তিন সর্বনেশে।

গ. হুসেনশাহের আমল।

ঘ. রাঘব রায়ের কাল।

ঙ. কানু ছাড়া গীত নেই।

চ. ধান ভানতে শিবের গীত।

বাংলাদেশে একসময় শিবের গান এবং কৃষ্ণকথার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল শেষোক্ত প্রবাদ দুটি তার স্পষ্ট প্রমাণ।

এছাড়াও সামাজিক ইতিহাসের নানাদিক, স্থানীয় ঘটনা বা গালগল্প কিংবা বঙ্গদেশে প্রচলিত রঙ্গরসিকতা বহু প্রবাদ জাতীয় রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে রয়েছে কৌতুককর বর্ণনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ :

ক. লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

খ. রতনবাবুর নাতি স্বর্গে দেবে বাতি।

গ. কালীঘাটের কাঙালী।

ঘ. দোয়াত নেই কলম নেই
নন্দরাম সরকার।

ঙ. ভেতো বাঙালী।

চ. ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো সেপাই।

ছ. শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।

জ. বাঙাল, পুঁটিমাছের কাঙাল।

ঝ. তেরি মেরি বাঙালি, কদুশাকের কাঙালী।

ঞ. পশ্চিমে সাধু, পুবে বাবু।

প্রাচীন বাঙালি সমাজে কৌলীন্যপ্রথা ছিল। জাতিশ্রেষ্ঠ বাঙালির কৌলীন্য বোঝাতে কতকগুলি প্রবাদে তার বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের কথা বিদ্রূপ ও কৌতুকের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে :

ঘোষ বোস মিত্র এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি ॥

—প্রবাদটিতে কুলীন কায়স্থদের মধ্যে আবার কে বড়, কে ছোট তার হিসাব পাওয়া যায়। আবার বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যে কে কীরকম প্রকৃতির তাও ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদে :

মুখুটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা ॥

কিংবা কুলীন কায়স্থদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ, কার কেমন প্রকৃতি প্রবাদ তাও নির্ণয় করে দিয়েছে :

ঘোষ বংশ বড়ো বংশ বোস বংশ দাতা।
মিত্র অতি কুটিল, দত্ত হারামজাদা ॥

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের কথা আমরা আগেই বলেছি। এদেশের নারীসমাজে সারা বছর ধরেই পালিত হয় কোনও-না-কোনও ব্রত নিয়ম। পাঁজিতে ক্যালেন্ডারে তার নির্ঘণ্ট যেমন দেওয়া থাকে, তেমনি কোনও

কোনও বার-ব্রত সম্বন্ধে নির্দেশিকা পাওয়া যায় প্রবাদে। যেমন অম্বুবাচীর দিনটি আষাঢ় মাসের সাত তারিখেই নির্দিষ্ট, এর কোনও পরিবর্তন নেই। প্রবাদে আছে :

সাতই আষাঢ় অম্বুবাচী
নেই কোনো তার পাঁজি পুঁথি।

আবার একাদশী নিয়ে আর একটা প্রবাদে আছে :

শয়ন উত্থান পাশমোড়া.
তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
ক্ষেপার চোদ্দ ক্ষেপীর আট
এই ধরে বছর কাট ॥

—প্রবাদটি একাদশীর শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন, ভীম পালন এবং শিব চতুর্দশীর ও দুর্গাষ্টমী পালন প্রসঙ্গে রচিত।

বাংলা প্রবাদের সিংহভাগ নারীসমাজকেন্দ্রিক। সমাজে মেয়েরা মেয়েদের গুণকীর্তন যেমন করে তেমনই আবার তাদের চালচলন নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না। এই ধরনের ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদে অনেক সময় শিষ্টাচার বোধ বা ভব্যতার হানি ঘটে। গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট এই ধরনের প্রবাদে পল্লীর নারীর দুঃখ-বেদনা, রাগ-দ্বেষ, কৌতুক সবই পরিস্ফুট হয়েছে :

ক. নারীর বল, চোখের জল।

খ. গড় করি মেয়েদের পায়
ধানভানা চাল ঠাকুরে খায়।

গ. গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে।

ঘ. যতই কর শিবসাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

ঙ. মাছ খায় না যতিনী, পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যতিনী, কোলে তিনটে মিন্‌সে।

চ. জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে রক্ত।

ছ. সতী যায় সোঁতে, অসতী যায় রথে।

জ. মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেশ্যা।

ঝ. যুবকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী।

প্রবাদে সমাজের বিচিত্র ছবি কীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ বলেছেন : "জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের তীব্র অনুভূতির প্রকাশই প্রবাদের জন্মভূমি। আমাদের কর্মময় জীবনের সুষ্ঠু প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা, নীতিকথা, তত্ত্বকথা, রসিকতা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-প্রীতি, মিলন-বিচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, নিন্দা-প্রশংসা, যাত্রা-অযাত্রা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কৃষিস্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, মেঘ-বৃষ্টি, খরা-বাদল, আকাল-সুকাল, চুরি-ডাকাতি, শত্রুতা-মিত্রতা প্রভৃতি কোনও কিছুই প্রবাদকারের আওতার বাইরে নয়। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, শালা-শালী, নাতি-নাতনি প্রভৃতি সমাজজীবনের রাজা-জমিদার, মন্ত্রী-মোড়ল, পাইক-পেয়াদা, হিন্দু-মুসলমান, মোল্লা-বামুন, পীর-ফকির, চোর-ডাকাত, চাষি-মজুর ও মাঝি প্রভৃতি কেউই প্রবাদকারের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।"[১]

তাই প্রবাদে সমাজের কথা বলতে গিয়ে নানারকম রীতিনীতি বা প্রথা, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যেমন এসেছে, তেমনই সমাজে বসবাসকারী বিচিত্র ধরনের মানুষের স্বভাব ও মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। কখনও তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে, আবার কখনও বা কৌতুকের মধ্যে দিয়ে। প্রবাদ হল এক ধরনের সমাজ-অনুশাসন বা সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার নীতিনির্দেশিকা। বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভবকাল থেকে এদেশের মানুষকে নিয়ে যে সব বিচিত্র প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যেই আছে সমগ্র বঙ্গসমাজের পরিচয়। বাঙালির জীবনের খুঁটিনাটি জানতে গেলে জানতে হবে তার প্রবাদমালা।

তথ্যসূত্র

১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ গৌড়বঙ্গসংস্কৃতি, বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬, পৃ. ৬৫

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ নারী, কালান্তর। রবীন্দ্র রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড ১৯৯০, পৃ. ৬৭৩

৩. ঘোষ, বিনয় . সংস্কৃতিব সামাজিক দূবত্ব, একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ১৯৯২, পৃ ২২০-২২১

৪ বিস্তাবিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. হিন্দুবিবাহ, সমাজ। রবীন্দ্র বচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্কবণ), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৪০৬ পৃ ৪৪৪-৪৫

৫ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নারী, কালান্তর (রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩০৬ পৃ. ৬৭৬

৬ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ : গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, ১৪০৬ পৃ ২১

৭. হালদাব, গোপাল সংস্কৃতির গোড়ার কথা, একালেব প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ১৯৯২, পৃ ১৭৫

৮ ঐ, পৃ ১৭৭

৯. দাসচৌধুরী, গোপাল ও সেন, প্রিয়রঞ্জন সম্পাদিত, প্রবাদ প্রবচন, ১৩৬৭, পৃ. ২

বাংলা প্রবাদে প্রতিবাদী চেতনা

প্রতিবাদ মানুষের প্রতিরোধ বাসনার অভিব্যক্তি। মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানবসমাজে এই অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। সমাজবদ্ধ মানবজীবনে আত্মপ্রকাশের ধারা বহুমুখী। শিশুর কান্নাও একধরনের প্রতিবাদ। হাত-পা ছোঁড়ার মধ্যে দিয়ে সে প্রতিবাদ করে ইঙ্গিতে, অঙ্গভঙ্গিতে। এর প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। যারা বোবা কিংবা অন্ধ তারাও প্রতিবাদ করতে জানে। তবে তাদের ভাষা স্বতন্ত্র। এই প্রতীকী ভাষা কালক্রমে মুখর হয়েছে সমাজে, রাষ্ট্রে, রাজনৈতিক জীবনে। রাজনৈতিক মিছিলে মশাল, নিশানা কিংবা বদ্ধমুষ্টি এই প্রতিবাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকী প্রকাশ।

ভাষায় যখন মানুষ মুখর হল, তখনই প্রতিবাদ হল সরব, ভাষা-মুখর, শব্দ-ঝংকৃত। প্রতিবাদ কখনও সহিংস্র, আবার কখনও বা অহিংস। সারা পৃথিবী এই চরিত্রধর্মে আচ্ছন্ন। প্রকৃতপক্ষে বিপন্ন মানুষ প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ করে মুক্তির জন্য। ব্যক্তি ও সমাজের এই মানস প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয় ছড়া, গান, প্রবাদ বা শ্লোগান। সেই অতীত কাল থেকেই আজও চলছে সেই ধারা। প্রতিবাদ কখনও সৃষ্টিমুখর, কখনও বা ধ্বংসাত্মক। কখনও শান্তির জন্য প্রতিবাদ, আবার কখনও ধ্বংসলীলায় ভয়ংকর। সভ্যতার নটরাজ তাই সৃষ্টি ও ধ্বংসের তালে কখনও লাস্যময়, কখনও বা তাণ্ডব ভয়ংকর।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা প্রবাদ। সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রকাশিত হয়েছে। কারণ সামন্তপ্রভুরা যুগে যুগে ক্রীতদাস সৃষ্টি করেছে আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টির মাধ্যমে। সামন্তপ্রভুরা, রাজারা, জমিদাররা শোষণের মাধ্যমে পুঁজির পাহাড় সৃষ্টি করেছে। মার্কসীয় দর্শনে একেই বলেছে, শ্রেণী বৈষম্য। এই শ্রেণী বৈষম্যের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে শ্রেণী

শোষণের বহু নির্মম রূপ প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগে নারীরা ও শিশুরাই শোষণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

শোষণ এক সামাজিক ব্যাধি। এই শোষণ সামাজিক আর্থিক রাষ্ট্রিক ধর্মীয় মানসিক সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান। ফলে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। প্রবাদের মধ্যেও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন কঠোর নির্মম, অথচ আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশের পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনেও নির্মমতার শেষ নেই। প্রকৃতির অনিবার্য দুর্বলতায় মেয়েরাই বেশি করে শোষণ-পীড়নের শিকার হয়েছে। তাই লিখিত সাহিত্যে, মৌখিক সাহিত্যে নারীর জীবনযন্ত্রণার চিত্র অধিকতর প্রকাশিত। প্রবাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধবলে সমাজের এই নির্মমতার চিত্রই বেশি করে প্রকাশিত হয়। যেমন—

> 'ভাগ্যের সন্ধান নিয়ে কাকের প্রতি প্রহার।'
> বাউরী পাড়ায় খটাস মহাবল।
> হুলো বিড়াল ভোঁদড়ের প্রতিযোদ্ধা।
> সাপে নেউলে সম্বন্ধ।
> অন্যায় রাজপুরে বিচারীর বড়মুখা মন্ত্রী।

সব সমাজেই প্রবাদের প্রচলন দেখা যায়। প্রবাদ ক্ষুদ্র হলেও তা ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ এবং অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ও বুদ্ধিপ্রধান। "প্রবাদ প্রবচন হলো এমন এক ধরনের উক্তি, যা বহুল প্রচলিত। আকারে সংক্ষিপ্ত, প্রকারে সরস, সুদীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী। আপাততুচ্ছ, কিন্তু স্বরূপগত গভীর উক্তি। সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্রবাদ প্রবচনগুলির মূল্য অপরিসীম। সমাজতাত্ত্বিক এগুলিতে সমাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। খুঁজে পান বহুবিধ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, বঞ্চনা-বেদনা, ক্ষোভ-অসন্তোষ, অসংগতি, শ্লেষ ও ধিক্কারের চিহ্ন।"[১]

পারিবারিক জীবনে শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে বধূর সম্পর্ক মধুর নয়, বরং তিক্ত। তাই বধূ শাশুড়ি-ননদ ছাড়া নিরঙ্কুশ ঘরসংসারই কামনা করে:

> একলা ঘরের গিন্নী হব।

যন্ত্রণাদায়ক শাশুড়ির অধীনতা বধূর কাম্য নয় বলেই সে বলে:

শাশুড়ি নেই, ননদ নেই— কার বা করি ডর
আগে খাই পান্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর।

বাঙালির পারিবারিক জীবনে সবচেয়ে বিতর্কিত এবং জটিল সম্পর্ক শাশুড়ি-বধূর। শাশুড়ি ও বধূ উভয়েই কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। একে যেন অপরের শত্রু। শাশুড়িও যেন বউয়ের কিছুই সহ্য করতে পারে না। বউয়ের প্রতি তার তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উচ্চারিত হয়। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

বউ নয় ত হীরে।
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ী
আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।

শাশুড়ির মুখে অলক্ষুনে বউয়ের সমালোচনা।

কুরূপা বধূর নিন্দা শাশুড়ির উক্তিতে:

সেই কড়ি ক্ষয়
তবু বউ সুন্দর নয়।

নিঃসঙ্গ শাশুড়ির ক্ষোভ প্রকাশ পায় প্রবাদে:

বেটা বিয়োলাম বউকে দিলাম
মেয়ে বিয়োলাম জামাইকে দিলাম
আপনি হলাম বাঁদি, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি।

কিংবা

হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে আনলাম বাঁদি
সে হল গিন্নি, আর আমি বসে রাঁধি।

বউকে শাসনে রাখার জন্য শাশুড়ির চেষ্টার অন্ত থাকে না। তাই শোনা যায়:

বউ জব্দ কিলে, হলুদ জব্দ শিলে।

শাশুড়িও যে একদিন গৃহবধূ হিসেবে নিজের সংসারে কঠিন বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, হয়তো বা নিজে বধূ হিসেবে তার শাশুড়ির

কাছে কটূক্তির শিকার হয়েছিলেন। এই বোধ থেকেই সম্ভবত পুত্রবধূর উপর এহেন ব্যবহার, বিতৃষ্ণা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হয়। বউ সম্পর্কে শাশুড়ির মন্তব্য কত নিষ্ঠুর হতে পারে নীচের প্রবাদটিই তার প্রমাণ দেয়:

বউ না রে, বউ না— গরল ডাকিনী।
দিনের বেলা মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী।

শাশুড়ির সঙ্গে ননদ ও জার প্রসঙ্গও বধূর কটূক্তিতে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে:

জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ি মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর ॥

মেয়ের প্রতি আনুগত্য অধিক, অথচ বউয়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ—

পদ্মমুখী ঝি আমার শ্বশুর বাড়ি যায়
আর উনোনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায়।

বউয়ের কপালে ভাল খাবারও জোটে না, ভাল খাবার যদি বউ খায় তবে তাকে নির্যাতিত হতে হয়:

বউমা, ক্ষীর রইল খাবে;
যদি খাবে তো যমের বাড়ি যাবে।

সংসারে স্ত্রীর কাছে স্বামী সবচেয়ে আপনার জন। সেই স্বামীর কাছে স্ত্রী যখন অবহেলিত হয়, তখন স্ত্রী অভিমানক্ষুব্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে ভোলে না। প্রবাদে সে বলে:

ক. এত করে করি ঘর তবু মিন্‌সে বাসে পর।

—স্বামীর অবহেলার বিরুদ্ধে স্ত্রীর প্রতিবাদ।

খ. যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি।

—অর্থাৎ স্বামীর নির্মমতার বিরুদ্ধে অভিমানক্ষুব্ধ প্রতিবাদ।

গ. যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।

—স্বামীর অবহেলার বিরুদ্ধে স্ত্রীর ধিক্কারজনিত প্রতিবাদ।

ঘ. কাজে কুড়ে খেতে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে-ফুঁড়ে।

—কাজ কম করে, খায় বেশি অথচ মুখে মারমুখী বচন।

ঙ. যার জন্য করলাম জো, সেই বলে পৈথানে শো।

—যার জন্য সব কিছু করে স্ত্রী, সে-ই তাকে ভালভাবে থাকতে দেয় না।

চ. যার কাছে ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা।

—যার উপর আস্থা, সেই তাকে কষ্ট দেয় বেশি।

ছ. ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।

—এমনি খেতে দেয় না, অথচ খাটিয়ে নেয়।

জ. ঢেঁড়ো শাক সিজাব কত, হাবা ভাতারকে বোঝাব কত।

—যে বোকা তাকে শত বোঝালেও কিছু বোঝে না।

ঝ. পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিন রাতে।

—কঠিন বা কড়া লোকের হাতে পড়ে সারাদিনরাত নোংরাতেই কাটাতে হয়।

ঞ. অবুঝে বুঝাব, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে ॥

—যে বোঝে না, তাকে কিছুই বোঝানো যায় না, ঢেঁকি যেমন ধান ভানা ছাড়া কিছু বোঝে না।

আমাদের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ি-ননদ ও বধূর সম্পর্ক প্রায়শই বিরূপতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে। সংসারের কর্ত্রীত্ব নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে বধূর বিরোধ ঘটে। এ বিরোধে পুত্রেরও একটি ভূমিকা আছে। শাশুড়ির ধারণা যে পুত্র পুত্রবধূর পক্ষে। পুত্রের স্ত্রৈণতা তাই উপহসিত হয়:

কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই,
গিন্নির পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই।

পুত্রের প্রতি মায়ের যতই টান থাকুক না কেন, পুত্রের টান স্ত্রীর প্রতি বেশি:

মা মরে পুতের লাগি
পুত মরে বউয়ের লাগি।

আবার একই শাশুড়ির ভিন্নরূপ দেখা যায় নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ ছেলেকে তুষ্ট রাখার জন্য বউকে যত্ন করা—

বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।

এহেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ, শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের শিকার হয়ে বধূ কতদিন চুপ করে থাকতে পারে। আর তখনই নানাবিধ ভড়ং-ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বধূর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তীব্র প্রতিবাদের সুর। প্রতিবাদ কখনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে, কখনও সমাজের বিরুদ্ধে। যেমন—

ক. কুকুর মারে ত হাঁড়ি ফেলে না।

কুকুর হাঁড়ি (মাটির হাঁড়ি) উচ্ছিষ্ট করলে হাঁড়িটি নষ্ট করা উচিত, কিন্তু তার বদলে হাঁড়িটি রক্ষা করে শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা শুধুমাত্র ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

খ. ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়
চালকুমড়ো কেন বাকি রয়।

ভস্মলেপন করলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, সন্ন্যাসীর পরিচয় মানসিকতার মধ্যে। প্রকৃত সন্ন্যাসীর এহেন বাহ্য ভণ্ডামির প্রয়োজন হয় না।

গ. ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের তরে কান্না।

ঘরের মা'র যেখানে ভাত জোটে না, সেখানে বাইরের মা'র জন্য কান্না ভড়ং ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘ. গরু মেরে জুতো দান।

গো হত্যা করে জুতো দান করলে তার মধ্যে কোনও পুণ্য অর্জন করা যায় না। এও এক ধরনের ভণ্ডামি।

ঙ. ঘট গড়তে পারে না, মেটের বায়না চায়।

কিংবা,

ছুঁচ গড়তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়।

—এই ধরনের প্রবাদগুলিতে অযোগ্যকে উপহাস করা হয়েছে।

কতকগুলি প্রবাদে বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে, কপটতার বিরুদ্ধে, নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে, যে-কোনও কাজ ভণ্ডুলকারীর বিরুদ্ধে, গৃহিণীর অনাচারের বিরুদ্ধে, অবিবেচনার বিরুদ্ধে, অযোগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন,

ক. ঘরে নেই ভাত, জমিদারী ঠাট।

—বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত।

খ. ঘরে নেই চাউল পাত, চড়িয়ে দে ঘি-ভাত।

—মিথ্যা চালাকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

গ. ঘরে নেই ধান এক সলি, আড়াই হাত মরাই তুলি।

—ফুটানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঘ. ঘরে শুধু শাক-সজনা, বাইরে তবু বাবুয়ানা।

—বাবুয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঙ. ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।

—বাবুয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

চ. ঘরে নেই অষ্টরম্ভা, বাহিরেতে কোঁচা লম্বা।

—এটি বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ছ. ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।

—বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

জ. ঘরে ভাত নেই, দোরে চাঁদোয়া।

—বাবুয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঝ. পেট জ্বলে ভাতে, সোনার আংটি হাতে।

—খেতে পায় না অথচ বাবুয়ানা, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঞ. হাতে নেই কড়ি. নাম বাড়াচ্ছে সদাগরি।

—বাবুয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ট. ঘরে নেই ভাত, দুয়ারে বাজে ঢাক।

—বাবুয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঠ. চোখের চামড়া নেই।

—নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ড. মুখে খুব মিঠে, নিম নিসিন্দা পেটে।

—মুখে মধু হৃদয়ে বিষ অর্থে প্রযুক্ত।

ঢ. কাম নাই কাম করে, ধান চাইলে এক করে।

—নিষ্কর্মার প্রতি ধিক্কার বা প্রতিবাদ।

ণ. ঘরের ধন ফেলে পরের ধন আগলান।

—অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ত. বউ ভাঙলো সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নী ভাঙলো নাদা ও কিছু নয় দাদা ॥

—তুচ্ছ কারণে বউয়ের প্রতি লাঞ্ছনার প্রতিবাদ।

থ আপনার বেলায় ভাতকাপড়।
পরের বেলায় লাথি চাপড়।

—নিজের স্বার্থ ষোলআনা দেখা, পরের বেলায় অবহেলা।

দ. ইটটী পড়িলেই পাটকেলটী পড়ে।

—অর্থাৎ মার দিলে মার খেতে হয়।

ধ. কথাতে সাউ শুঁড়ি
কথাতে বাটপাড়ি।

—অর্থাৎ শাশুড়ির বিরুদ্ধে বউয়ের প্রতিবাদ।

স্ত্রৈণ পুত্রের আচরণও প্রতিবাদের লক্ষ্য হতে দেখা যায়—

গরু ছাগল বেচে ভাতার
গড়ায় মাগের গলার হার।

শাশুড়ির বিরুদ্ধে স্বামীকে কুমন্ত্রণা দিতেও বধূকে দেখা যায়। শাশুড়ি স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন, বলেন:

কলির বউ ঘর ভাঙানী।

এখানে মায়ের প্রতি অবহেলা ও বউয়ের প্রতি মনোযোগের আধিক্য লক্ষণীয়। কোনও প্রবাদে মা'র প্রতি পুত্রের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর শোনা যায়—

মা বেচে খায় কলমী শাক।

আদিখ্যেতা দেখলেও প্রতিবাদ জানাতে হয়—

ঘর নেই দুয়ার বাঁধে
মাগ নেই ছেলের জন্য কাঁদে।

আবার, গৃহিণীর অনাচারও প্রতিবাদের বিষয় হয়ে ওঠে—

ঘর বাসি দোর বাসি
গিন্নি করেন পঞ্চগ্রাসী।

ননদিনীও কিছু কম যায় না ভ্রাতৃবধূর প্রতি নির্দয় ব্যবহারে, তাই ননদিনীর সম্পর্কে বধূর ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায়—

ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী।

ননদিনীর প্রতি বধূর বিদ্বেষটুকু গোপন থাকে না—

ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায় ॥

এমনকী দেবরের সঙ্গে রসিকতা প্রসঙ্গে ননদের প্রতি খোঁটা দিতে ছাড়েনি ভ্রাতৃবধূটি—

দেওরা রে দেওরা এর বেওরা কি।
নন্দাই-এর কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি ॥

হিসেবি শাশুড়ির চালাকি ধরতে পেরে বধূও তার ধূর্ততার পরিচয় দেয়—

শাশুড়ি যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ ॥

শাশুড়ির প্রতি বধূ এতটাই তিতিবিরক্ত যে শাশুড়ির মৃত্যু তার কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। সে চায় শাশুড়িবিহীন সংসার:

শাশুড়ি মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।

আবার শাশুড়ির নামে মিথ্যা দোষারোপ করতেও বউ কিছু কম নয়—

শাশুড়ি মারেন গুঁতা, বউ বেটী পেল ছুতা।

যে পর্যন্ত একা স্ত্রী থাকা যায় সে পর্যন্ত তার আর সৌভাগ্যের অন্ত থাকে না, কিন্তু সতিন আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমা স্ত্রীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পালা শুরু হয়ে যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রবাদটি—

একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল, আঁস্তাকুঁড়ের হলাম কুকুর ॥

স্বামীর অধিকতর প্রিয় পত্নীর কপালে স্বর্ণনির্মিত অলংকার জোটে, কিন্তু হতভাগিনী, অপেক্ষাকৃত অনাদরের পত্নীরা অলংকার লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এই বঞ্চনার কথা তো চিরকাল চাপা থাকে না, একদিন-না-একদিন তা প্রকাশ পায়-ই। তখন বঞ্চিত পত্নী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলে ওঠে—

এও জানি সেও জানি, কিছু নাইকো বাকি।
সতীনে দিলে সোনার গয়না, মোরে দিলে ফাঁকি ॥

আবার এ হেন সৌভাগ্যবতী সতিন যদি অভিমানিনী হয়, কোনও কারণে খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে, তখন হতভাগিনী পত্নীকে সাংসারিক কাজকর্ম তো সব করতেই হয়। তায় আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো স্বামীর মন রাখতে অভিমানিনী সতিনের খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়—

খলসে মাছ দিয়ে আজ রাঁধলাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধরে তোল ॥

যে হতভাগ্য রমণীকে সতিন নিয়ে ঘর করতে হয়, তার দাম্পত্য জীবন যে কতখানি মর্মান্তিক হয়, তা আজকের দিনে সতিন-প্রথা যখন অচল তখন ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। কিন্তু তবু, বাংলা প্রবাদে সতিন সম্পর্কে বিরূপতার গভীরতা থেকে বোধহয় আমরা তার কিছুটা অন্তত উপলব্ধি করতে পারি। একটি প্রবাদে সতিন নিয়ে যাকে ঘর করতে হয়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

একাধিক প্রবাদেই সতিন সম্পর্কে রোষ প্রকাশিত হয়েছে বড় বেশি অকপট ভাষায়। যেমন—

ক. কাঁটা কাঁটা কাঁটা
সতীনের মুখে ঝাঁটা।
বঁটি বঁটি বঁটি, সতীনকে ধরে কুটি।

খ. অশত্থ কেটে বসত করি,
সতীন কেটে আলতা পরি।

তাই দেখা যায় যে, সেকালে সতিন-প্রথা যখন প্রচলিত ছিল তখন মেয়েদের ঐকান্তিক কামনা ছিল একটি, আর তা হল—

ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না।

তবু অনেককে সতিন নিয়ে ঘর করতে হয়। তাই সতিন সম্পর্কিত প্রবাদ:

জল দেখলে মুত সরে, সতীন দেখলে বিষ চড়ে।

কিংবা,

সতীনের কাছে সাজা, পতির কাছে মজা।

প্রয়োজনের সময় খাতির করা, আর প্রয়োজন ফুরোলে তাকে ভুলে যাওয়া— মানুষের এ ধরনের গুণপনার শেষ নেই, অর্থাৎ যার কাছে সে কাজ পেল তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধও তার থাকে না, এহেন স্বার্থপর মানুষের প্রতি নিন্দাসূচক প্রবাদ উচ্চারিত হতে দেখা যায়—

আদর কাজের বেলা
তারপর অবহেলা।

কিংবা

কাজের বেলা কাজি
কাজ ফুরালে পাজি।

ছিদ্রান্বেষী মানুষের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রতিবাদ প্রবাদের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়—

আপন ছিদ্র জানে না পরের ছিদ্র খোঁজে।

কিংবা,

আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি।

সংসারে কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের সমালোচনায় মুখর হলেও নিজের সমালোচনায় সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। এ ধরনের মানুষের প্রতিও প্রতিবাদের সুর উচ্চারিত হয় প্রবাদের মধ্য দিয়ে—

আপনার মুখ আপনি দেখ।

কিংবা,

আপনি নেঙাই পরকে ভেঙাই।

আর একদল মানুষ আছে অলস অর্থাৎ নিষ্কর্মা। এদের প্রতি ধিক্কারসূচক প্রবাদ—

কাজের মধ্যে দুই
খাই আর শুই।

কিংবা,

কাজের বেলা ভাগে
খাবার বেলা আগে।

কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণগত অসংগতিকে লক্ষ্য করেও প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—

তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকে
তবু আবার করবে বিয়ে।

বিচার ব্যবস্থায় অনেক সময় বিচারের নামে প্রহসন চলে। একের অপরাধে অন্যের শাস্তি পাওয়া— এই ধরনের অন্যায় বিচারের প্রতিও প্রতিবাদ জানানো হয় প্রবাদের মধ্যে দিয়ে—

দই খেলেন রমাকান্ত
বিচারের বেলায় গোবর্ধন।

সমাজে পণপ্রথা আজও রয়েছে, কন্যাপক্ষই পণপ্রথার শিকার হয়। পণপ্রথার প্রতি বরের পিতার বিরুদ্ধে প্রবাদে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে:

কনের বাপ ব'সে ব'সে চোখের জলে ভাসে
বরের বাপ ব'সে আছে পাঁচশ' টাকার আশে ॥

বর্তমানে ব্রাহ্মণদের আদর্শচ্যুতির প্রতি প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়—

বামুন দক্ষিণা ধরে
ঢেঁকির নামে পূজা করে।

এমন অসংখ্য প্রবাদ আমাদের সাংসারিক জীবনে ছড়িয়ে আছে যেগুলির মাধ্যমে নারী তার প্রতিবাদ জানিয়েছে তির্যক ভঙ্গিতে এবং তীব্র কটু ভাষায়। যে নারী একদিন ছিল—

কানে গুঁজলাম তুলো,
পিঠে বাঁধলাম কুলো।
তোরা যত পারিস্ বল
যত পারিস্ কিলো ॥

নানা অত্যাচার, বঞ্চনার শিকার হয়ে সেও এক সময় প্রবাদে বলে:

হই গিন্নি, না ছুঁই হাঁড়ি।

তথ্যসূত্র

১ মজুমদাব, মানস, লোকসাহিত্য পাঠ ১৯৯৯, পৃ. ২৬

বাংলা প্রবাদের গঠনকৌশল

মানব সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পৃথিবীর সবদেশেই প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছিল সার্বিক জীবনচর্যার অনুষঙ্গে চলতি বাক্‌রীতির আধারে। এ এক স্বতঃ-উৎসারিত যদৃচ্ছাকৃত দুর্লভ বাক্যরত্ন। বাক্-শিল্পে তো বটেই, লিপির শিল্পেও তা অন্যতম উপকরণ। প্রাচীন ছড়ার মতো প্রবাদ-প্রবচনও 'মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।'[১] আর এগুলির মহিমা এমনই যে 'চিরত্বগুণে' বহু প্রাচীন হয়েও সর্বদাই নতুন। এই ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের নিত্য প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কতশত পরিত্যক্ত বিস্মৃতি বিচ্যুত পদার্থ সকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।"[২] জনগণের চেতনায় ভাসমান এইসব 'পদার্থ'ই কোনও কোনও প্রজ্ঞাবান বিচক্ষণ রসিক ব্যক্তির মানসদেশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় জেগে উঠে বিশেষ বাক্‌রীতিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে কৌতুক-রসিকতা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, মন্তব্য-টিপ্পনীর আকারে। জনগণের সাধারণ বুদ্ধিসুদ্ধি থেকেই সৃষ্ট এইসব আপ্তবাক্য সমূহ জনশ্রুতির মাধ্যমে কালক্রমে প্রবাদের রূপ পেয়েছে। এদিক থেকে প্রবাদ-প্রবচন হল জনগণোক্তি।

প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক পূর্ণ বাক্য কিংবা পদ। প্রবাদের গঠনরীতির বৈশিষ্ট্য কম নয়। গঠনশৈলীর দুটো দিক— একটি অন্তরঙ্গ এবং অন্যটি বহিরঙ্গ। প্রবাদের গঠনশৈলীতেও এই দুটি দিক লক্ষ করা যায়। বিষয়ের উপস্থাপনারীতি হল প্রবাদের অন্তরঙ্গ বিষয়। গঠনশৈলীর বহিরঙ্গের আওতায় প্রবাদ হল একটি ভাবের প্রকাশক বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। ক্রিয়ার অবস্থা বা ভাব অনুসারে প্রবাদবাক্যের শ্রেণীবিভাগ আছে:

এবারে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে প্রবাদের গঠনশৈলীগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রবাদ যেহেতু বাক্-নির্ভর শিল্প এবং লোকের মুখ-ফেরতা হয়ে প্রচারিত, তাই আঞ্চলিকতার কারণে এর গঠনশৈলীও হয় ভিন্নতর। অনেক সময় 'লৌকিক অভিব্যক্তি'র ওপর নির্ভর করে তার রূপাবয়ব। বৃহত্তর বঙ্গের অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত বাংলা প্রবাদগুলির 'উচ্চারণগত, রূপপ্রকরণগত ও শব্দপ্রকৃতিগত' পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে এইসব অঞ্চলের 'ভাষার মূলপ্রকৃতি বাংলাই, যদিও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিভক্তি প্রত্যয়ের ব্যবহার ও বাক্যগঠন রীতিতে আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট।'[৩] হাজার বছর আগে প্রচলিত 'চর্যাগীতি'তে প্রাপ্ত 'বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ্ঠ বলন্দে' বাংলা প্রবাদটি সংস্কৃত ভাষাতেও পাওয়া যায়— 'বরং শূন্যাশালা নচ খলু বরং দুষ্ট বৃষভঃ'। দুটি প্রবাদে শব্দপ্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও বাক্যগঠন রীতিতে খুব বেশি অমিল নেই। অথচ অর্বাচীন প্রবাদটি পাওয়া যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন বাক্যগঠন রীতিতে— 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' আধুনিককালে 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকে প্রবাদটি সাহিত্যিক রূপ পেল আরও স্পষ্টভাবে— 'দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' শব্দপ্রকৃতিতেও কি পার্থক্য হল না? প্রাচীনকালে প্রাপ্ত প্রবাদ দুটির একটিতে আছে 'বৃষ' আর একটিতে 'বলদ', আধুনিক কালে পুংলিঙ্গ শব্দ দুটির অর্থ প্রসারিত হয়ে দাঁড়াল 'গরু' অর্থাৎ গাইও হতে পারে বলদ বা বৃষও হতে পারে।

বহু বছর ধরে লোকের মুখে মুখে ঘোরা প্রবাদগুলি এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে বিচিত্ররূপ ধাবণ করে। অঞ্চলবিশেষে বা একই অঞ্চলে বিচিত্র পাঠান্তর পাওয়া যায়। তখন আদিম মূল রূপটির সন্ধান করে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। চর্যাগীতি আবিষ্কৃত না হলে উক্ত বাংলা প্রবাদটির প্রাচীন রূপের সন্ধান আজ অধরাই থেকে যেত। কাল এবং অঞ্চলভেদে প্রবাদের পাঠান্তর এইভাবে বিশ্লেষণ হওয়ার অপেক্ষা রাখে। তার থেকে অনুসন্ধান করা যেতে পারে লোকভাষার নিদর্শন।

বাংলা ভাষার মতো নমনীয় ভাষা খুব কম দেখা যায়। আর এই নমনীয়তার ফলে তার গ্রহণশক্তির পরিধি ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে। বাংলা ভাষায় অবলীলায় প্রবেশ করেছে বহু প্রাদেশিক ও বিদেশি শব্দ এবং পদসমুচ্চয়। একই কারণে বাংলা প্রবাদমালায় সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সংস্কৃত হিন্দি

মৈথিলি এমনকী বিদেশি প্রবাদও। সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থে এমন অজস্র প্রবাদের সন্ধান দিয়েছেন। 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'শুভস্য শীঘ্রম' প্রভৃতি সংস্কৃত খণ্ডপ্রবাদ বাংলায় যেমন সহজে ঢুকে পড়েছে, তেমনি হিন্দি প্রবাদ 'বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া' কিংবা 'পহলে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারী' দিব্যি চলে যাচ্ছে বাংলায়। এই ধরনের কিছু প্রবাদ আবার মিশ্ররীতির কিংবা বাংলায় প্রবেশের সময় একটু-আধটু পোশাক পালটে নিয়েছে। সুশীলকুমার দে দেখিয়েছেন— 'কা কস্য পরিদেবনা' বাক্যটি বাংলায় 'কা কস্য পরিবেদনা' হয়ে অধিকতর সচল ও সুবোধ্য হয়েছে। আবার সংস্কৃত বাংলা মিশেলে সৃষ্টি হয়েছে সংকর প্রবাদ— 'যস্মিন্ দেশে যদাচার/ গামলা চড়ে গঙ্গাপার'।[৪] কিংবা হিন্দি-বাংলার বিমিশ্রণে সৃষ্ট 'তেরি-মেরি বাঙালি/ কদুশাকের কাঙালি।' একাধিক বিদেশি ও প্রাদেশিক শব্দমিশ্রিত প্রবাদও আছে: 'কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল।'

বাগ্‌ধারা বা রীতিগত বাক্যাংশ বা চলতি কথার বিশিষ্ট বাগ্‌রীতি (Idioms and Phrases)-কে অনেকে প্রবাদ বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু বিশিষ্ট বাংলা প্রবাদ সংগ্রাহক এমন কিছু 'প্রবাদমূলক চল্‌তি কথা'কে প্রবাদ হিসেবেই নিজের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া', 'মাথা মুড়িয়ে তেল ঢালা', 'তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা' কিংবা, 'সাতেও নেই পাঁচেও নেই' প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রবাদের দৃষ্টান্ত। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) লিখতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমনতর বেশ কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। (দ্র. পরিশিষ্ট)। অন্যপক্ষে অনেক পূর্ণাঙ্গ প্রবাদ বিশেষ বাক্‌ভঙ্গিতে অর্ধেক বা অংশবিশেষ উচ্চারিত হয়েই কাজ চালিয়ে নেয়। আমরা বলি 'ভবি ভোলবার নয়'। এটি পূর্ণাঙ্গ প্রবাদ কিন্তু নয়; এর সমগ্র রূপটি হল— 'তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়।' কিংবা ছড়ার আকারে প্রাপ্ত একটি প্রবাদ হল:

আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত ॥
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত ॥

কিন্তু প্রয়োগভঙ্গিতে বেশির ভাগ সময় পুরো প্রবাদটি বলার দরকার হয় না— কেননা মূল কথাটির ব্যঞ্জনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শেষ লাইনে— 'যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত',— এই বাক্যাংশে। এই ধরনের প্রবাদকেই

বলা হয়ে থাকে খণ্ডপ্রবাদ। সমগ্র প্রবাদটির হয়তো চল নেই, কিন্তু থেকে গেছে তার খণ্ডাংশ।

বাংলা প্রবাদের ভাণ্ডারী ড. সুশীলকুমার দে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, 'প্রবাদগুলি সাধারণতঃ চল্‌তি ভাষায় পাওয়া যায়।'[৫] এই চলতি ভাষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'বাংলার অন্তঃপুর, হাট-বাজার, মাঠ-ঘাটের ভাষা'; এর 'প্রকাশভঙ্গী বাংলার নিজস্ব সংস্থার ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক পদ্ধতি।'[৬]

এই চারিত্রধর্ম ও প্রকৃতিযুক্ত বাংলা ভাষাকে রবীন্দ্রনাথও 'চল্‌তি ভাষা' রূপে অভিহিত করেছেন। তবে এর আরও কয়েকটি নাম দিয়েছিলেন তিনি— 'প্রাকৃতভাষা', 'কথ্যভাষা', 'আটপৌরে ভাষা'। 'বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ' এবং ওকার প্রবণতা এ ভাষার মেরুদণ্ড। এই ভাষার ভাব প্রকাশের রীতি-পদ্ধতি, ভাব-ভঙ্গি যুগ যুগ ধরে বাঙালির চেতনায় মজ্জাগত বলেই জীবনসম্ভব প্রবাদ-প্রবচনগুলির যথার্থ ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পেরেছে। আর জীবনঘনিষ্ঠ বলেই প্রবাদের ভাষা বেশ জোরালো। 'কত হাতি গেল তল, মশা বলে কত জল'— প্রবাদটির বাক্‌রীতিতে যে জোরালো মেজাজ, তার শক্তি নিহিত আছে কিন্তু ভাষার প্রকৃতিতে। সহজ অর্থ এবং প্রয়োগগ্রাহ্যতার কারণেই বাংলা প্রবাদ লোকপ্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'চলতি বাংলা ভঙ্গিপ্রধান ভাষা।'[৭] আর বাংলা প্রবাদের সফলতা তার প্রযুক্তির উপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ কোন ভঙ্গিতে তা প্রকাশ পেল। এদিক থেকে বাংলা প্রবাদের যোগ্য বাহক হয়েছে তার আটপৌরে ভাষা। সমুজ্জ্বল কৌতুকরস, ধারালো ব্যঙ্গের চাবুক, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ এপিগ্রামিক প্রয়োগে এক একটি প্রবাদ যেন ছোটগল্পের সমাপ্তির মতো মর্মে 'লঘুলফে'র মার!' 'যুবকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী'— এই ছোট্ট একটি কথার ধার মারাত্মক, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ যেমন আছে তেমনি আছে হাস্যরসের ফোয়ারা। অথচ যার সম্পর্কে প্রবাদটি প্রযুক্ত, তার চরিত্রের কত না-বলা কথাই না বলে দিচ্ছে!

বাঙালির বাক্‌রীতিতে আছে তুলনার মধ্য দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের স্বাভাবিক প্রবণতা। বাংলা প্রবাদের অর্থ-তাৎপর্য, সংকেত ও ব্যঞ্জনাগুলি তাই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আলংকারিক প্রয়োগে। এক্ষেত্রে শব্দালংকার ও অর্থালংকার দুয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার হসন্তযুক্ত

ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে শব্দালংকারের পারিপাট্য বাংলা প্রবাদকে কীভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে প্রথমে তা দেখা যাক—

অনুপ্রাস অলংকার

অনুপ্রাস প্রবাদকে স্মৃতিসহায়ক, শ্রুতিসুখকর করে তোলে। যেমন:

ক. কাজের নামে কাজী,
অকাজ পেলেই রাজি।

—এখানে 'জ' বর্ণটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটি অনুপ্রাস অলংকারের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

খ. ওল, কচু, মান।
তিনই সমান ৷৷

—প্রবাদটি অন্ত্যানুপ্রাসের ঝংকারে ঝংকৃত।

আবার,

গ. ঝি নষ্ট ঠাটে বাটে
বউ নষ্ট ঘাটে ঘাটে।

ঘ. অন্ধের নড়ি
কৃপণের কড়ি।

—উক্ত প্রবাদ দুটিও অন্ত্যানুপ্রাসেব উদাহরণ।

যমক অলংকার

প্রবাদে যমক অলংকারেরও ব্যবহার দেখা যায়। যেমন·

ক. কুল ত নয় কুলের আঁটি
নরম নয় দাঁতে কাটি।

এখানে 'কুল' শব্দটি দু'বার দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত--- 'কুল' শব্দের একটি অর্থ বংশ ও আরেকটি অর্থ কুল ফল।

খ. কথাতে হাতী পায়
কথাতে হাতীর পায়।

—এখানে 'পায়' শব্দটি দু'বার দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত— প্রথম 'পায়' শব্দ ক্রিয়াপদ অর্থে এবং দ্বিতীয় অর্থটি 'পদ' অর্থে ব্যবহৃত।

শব্দালংকারের পরেই আসে অর্থালংকারের কথা। অর্থালংকারের অন্তর্গত উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগও প্রবাদে লক্ষ করা যায়। যেমন,

উপমা অলংকার

বাংলা প্রবাদে উপমা অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

ক. জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

এখানে উপমেয় পিতার সঙ্গে উপমান জ্যেষ্ঠভ্রাতার তুলনা করা হয়েছে। 'সম' তুলনাবাচক শব্দ। সাধারণ ধর্ম না থাকায় লুপ্তোপমা অলংকার হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা অলংকার

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের দুটি ভাগ— বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। প্রবাদে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের দুটি বিভাগেরই প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। যেমন,

ক. এক মায়ের এক পুত
খায় দায় যেন যমের দূত।

এখানে উপমেয় এক পুত্রের সঙ্গে উপমান 'যমদূতের' তুলনা করা হয়েছে এবং সংশয়বাচক শব্দ 'যেন'। সুতরাং এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত:

খ. অমানুষের বোল
তিত্ পটলের ঝোল।

এখানে উপমেয় 'বোলের' সঙ্গে উপমান 'ঝোলের' তুলনা করা হয়েছে। সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ নেই। সুতরাং এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

সমাসোক্তি অলংকার

প্রবাদে সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগও ঘটতে দেখা যায়। যেমন:

ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে
তুমি বড় ফুটো।

এখানে জড় পদার্থ 'ঝাঁঝরি'র উপর বাক্‌শক্তির আরোপ হয়েছে। সুতরাং এটি সমাসোক্তি অলংকারের উদাহরণ।

অতিশয়োক্তি অলংকার

ক. অকালে খেয়েছো কচু
মনে রেখো কিছু কিছু।

উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্য এখানে 'কচু' উপমান উপমেয় 'তুচ্ছবস্তু'-কে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলায় অতিশয়োক্তি অলংকার হয়েছে।

—এখানে 'কচু' শব্দটি দ্বারা তুচ্ছ জিনিস বোঝাচ্ছে।

খ. আপনার চরকায় তেল দাও।

এই প্রবাদে 'চরকা' অর্থে 'কাজ' বোঝানো হয়েছে। অভেদত্বের কারণে উপমান 'চরকা' উপমেয় 'কর্ম'-কে গ্রাস করায় অতিশয়োক্তি অলংকারের দৃষ্টান্ত হয়েছে প্রবাদটি।

রূপক অলংকার

প্রবাদে রূপকের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন:

উঠান সমুদ্র পার হওয়া।

—এখানে 'উঠান' উপমেয় ও 'সমুদ্র' উপমান— এদের মধ্যে অভেদকল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং রূপক অলংকারের দৃষ্টান্ত। যেহেতু একটি উপমেয়র একটি উপমান তাই এটি নিরঙ্গরূপক।

ব্যাজস্তুতি অলংকার

বাংলা প্রবাদে ব্যাজস্তুতি অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন:

ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার।
বিইয়েছেন এক বাঁদর অবতার।

এখানে প্রশংসার ছলে ঠাকরুণের নিন্দাই করা হয়েছে। সুতরাং এটি ব্যাজস্তুতি অলংকারের দৃষ্টান্ত।

ছড়ার আকারে যে প্রবাদ পাওয়া যায়, তা অবশ্যই মেয়েলি ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া নয়। এর প্রকৃতি ভিন্ন। 'ভাঙা-চোরা' পদ-বিন্যাসে গড়ে উঠেছে বাংলা প্রবাদের ছন্দ ও মিল। প্রতিদিনের জীবনচর্যায় কেজো গদ্য ভাষা যখন ভাবের ভাষা হয়ে ওঠে, তখন তাকে ছন্দে দুলিয়ে দিয়ে শ্রোতার কর্ণে বাজিয়ে তোলা সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য। এইভাবেই বাংলা প্রবাদমালায় 'অর্থহীন ধ্বনি'তে গড়ে উঠেছে অজস্র সব 'অর্থবান ছবি'। মানসপটে চিত্ররচনা করেছেন অজ্ঞাত সব প্রবাদশিল্পী।

বাংলা প্রবাদ কোনওটা মিলযুক্ত ছন্দে, কোনওটা বা গদ্যে তির্যক বাক্‌ভঙ্গিতে উপস্থাপিত, কোনওটা আবার গদ্যেপদ্যে মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরও কিছু বেরিয়ে পড়ে।"[৯] চলতি বাংলার প্রাকৃত ছন্দে বাঁধা প্রবাদগুলি তাই তাদের আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে গভীরতর ভাবের মুক্তি ঘটিয়ে দেয়। ছন্দের বাঁধনটা বাইরের রূপমাত্র।

আমরা আগেই বলেছি বাংলা প্রবাদগুলি পাওয়া গেছে চলতি ভাষায়। প্রবাদের কথা না বললেও চলতি ভাষার সমধর্মী সাহিত্য সংরূপগুলির কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। "চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্য মহলের বাইরে তাদের বস্‌তি।... চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।"[১০]

বাংলা প্রবাদের ছন্দরূপ গড়ে উঠেছে এই চলতি ভাষার ছন্দকে আশ্রয় করেই— রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন প্রাকৃত ছন্দ, লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ। ছন্দ-বিজ্ঞানীরা বলেন দলবৃত্ত ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। অসমতল ঢেউখেলানো এই ভাষায় সব কথা সমান ওজনের নয় বলেই পথ মাঝে মাঝেই বন্ধুর। দ্রুত উচ্চারণে প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে তাকে সমান করতে হয়। তাই মুক্তদল ও রুদ্ধদল সমান ওজনের একমাত্রা হলেও তার ব্যতিক্রম দেখা দেয় প্রায়শই। তখন প্রয়োজনের খাতিরে মুক্তদল বা রুদ্ধদল প্রলম্বিত উচ্চারণে দুই দলমাত্রাও হয়। কয়েকটি প্রবাদের ছন্দ নির্ণয় করে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে:

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ক. নতুন নতুন | খইয়ের মোয়া | মচর মচর | করে |
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
পুরোনো হলে | খইয়ের মোয়া | নোয়াইয়া | পড়ে |

দ্রুত লয়ের এই দলবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রতি পূর্ণ পর্বে চার মাত্রা এবং পঙ্‌ক্তি শেষে অপূর্ণ পর্বে দু'মাত্রা। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'পুরোনো' স্বাভাবিক উচ্চারণে তিন মাত্রা হয় কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে ধ্বনিসংকোচের কারণে (পুর্‌নো) দু' মাত্রা হয়েছে। আবার ওই পঙ্‌ক্তিতেই 'নোয়াইয়া' স্বাভাবিক উচ্চারণে তিন মাত্রা হয়। কিন্তু উচ্চারণ প্রসারণে (নো আ-ই আ) চার মাত্রা হয়েছে। প্রবাদটির ছন্দপ্রকৃতি দ্বিপদী পয়ার। প্রথম পদে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা মোট চোদ্দো মাত্রা হওয়ায় (৪ | ৪ ‖ ৪ | ২ = ১৪) প্রবাদটি পয়ারের দৃষ্টান্ত হয়েছে।

প্রাকৃত বাংলার সবচেয়ে পুরনো ছন্দপ্রকৃতি পয়ার ছাঁদের। ডাক ও খনার বচন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সেকথা প্রমাণও করেছেন[১১] রবীন্দ্রনাথ। প্রবাদ-প্রবচনগুলিতেও পয়ারের দৃষ্টান্ত অজস্র:

১ ১ ১ ১ ১ ১
খ. শুনলে কথার | ছন্দ
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
হাঁড়ি ভেঙে | মাছ পালাল ‖ ঝোল রইল | বন্ধ |

এই প্রবাদটিও দলবৃত্ত রীতির দ্বিপদী পয়ার। 'রই-ল' দু' মাত্রার স্থানে প্রসারিত উচ্চারণে তিনমাত্রা হয়েছে।

দলবৃত্ত রীতির প্রবাদে ছন্দবৈচিত্র্যও দেখা যায়। তখন পঙ্‌ক্তির মাঝে থেকে যায় অপূর্ণ পর্ব:

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

গ. ব-উ ভাঙলো | সরা, ‖ গেল পাড়া | পাড়া |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

গিন্নী ভাঙলে | নাদা, ‖ ও কিছু নয় | দাদা |

আবার ষোলো মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিও প্রবাদে দেখা যায়:

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ঘ. মায়ের গলায় | দিয়ে দড়ি, ‖ বউকে পরাই | ঢাকাই শাড়ি |

(৪। ৪।।৪।৪ = ১৬)

ভগ্ন প্রবাদগুলির বেশির ভাগই ছয়, আট বা বারো মাত্রার:

১ ১ ১ ১ ১ ১

ঙ. ক্ষীরের হাঁড়ির | মাছি | (৪। ২ = ৬)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

চ. ক্ষীরের ভেতর | হীরের ছুরি | (৪।৪ = ৮)

বিভিন্ন সময়ে মুখের প্রবাদ সাহিত্যে প্রযুক্ত হয়ে উচ্চমর্যাদার আসন লাভ করে। তখন প্রবাদের রূপাবয়ব বেশ সুসজ্জিত। শেষোক্ত প্রবাদটি গোপাল উড়ের গানে এইভাবে পাই:

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

আমি কি ভাব | বুঝতে পারি ‖ তাই ভেবে যাই | বলিহারি |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ক্ষীরের ভিতর | হীরের ছুরি ‖ জানব কেম্‌নে |

দলবৃত্ত চৌপদী ছন্দে আট মাত্রার প্রবাদটি চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে। বাংলা প্রবাদগুলি প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনিতে কেবল বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণপ্রবণতায় শ্রুতিসুখকর হয়ে ওঠেনি, হয়েছে বাংলা প্রবাদের বিচিত্র

গঠনরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কথার মার-প্যাঁচ এবং শব্দের সঙ্গে অর্থের তির্যক উপস্থাপনা রীতিতে। 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়' প্রবাদটির সৃষ্টিকর্তা শব্দের জাগলিং করে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। এবারে বাংলা প্রবাদের এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

পুনরাবৃত্তির প্রয়োগরীতিও প্রবাদে লক্ষণীয়। যেমন—

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।

বৈপরীত্যের আশ্রয়েও প্রবাদ পরিবেশিত হয়। যেমন—

অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।

আবার সমিল প্যাটার্নের প্রবাদও দেখা যায়। যেমন—

তাস দাবা পাশা, তিনে সর্বনাশা।

কিংবা,

যেখানে গেরস্থের বাসা, সেখানে অতিথির আশা।

এগুলি দ্বিপদী পঙ্ক্তির মতো, দ্বিতীয় পঙ্ক্তি শেষে এসে অর্থটি পূর্ণতা পাচ্ছে। এ যেন একটুকরো লেখা-আলেখ্য।

পঙ্ক্তি দুটি সমিল, এখানে মিল অন্তিমে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছন্দে ও মিলে প্রায় সমান ওজন ও মাপের দুটি পঙ্ক্তি মিলে এ জাতীয় প্রবাদের সংগঠন। তবে সবসময় যে সমান মাপ বা ওজনের পঙ্ক্তিপদান্ত মিলে দ্বিপাক্ষিক ভারসাম্য রচনা করে তা নয়। কখনও কখনও একটি শব্দকে একদিকে রেখে, বাকি অংশটিকে অন্যদিকে রাখা হয় এবং শব্দটির সঙ্গে বাকি অংশের পদান্ত মিল প্রতিষ্ঠিত। যেমন:

চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।

কিংবা,

ধোবা, পরের কাপড় শোভা।

শব্দান্তের সঙ্গে পরবর্তী বাক্য বা বাক্যখণ্ডের অন্তিম মিলের আর একটু সম্প্রসারিত দৃষ্টান্ত দেখা যায় কতকগুলি প্রবাদে। যেখানে শব্দ/বাক্য— এই

দুটি পক্ষ নয়, মিলের দুটি পক্ষ হল বাক্যখণ্ড এবং বাক্য। কিন্তু এ দুটি ছন্দের থেকে সমান দৈর্ঘ্যের নয়, প্রথমটি ছোট, পরেরটি বড়।

যেমন:

শুনলে কথায় ছন্দ,
হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল রইল বন্ধ।

আবার উলটো দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। যেমন:

আগে হাঁটুনি, পান বাঁটুনি, বউয়ের ধাই
এই তিনে যশ নাই।

সমিল প্রবাদের মিলে সচ্ছলতা বা আধিক্যও বেশ চোখে পড়ে। যেমন:

আপন পোলা খায়, ঘর পানে চায়।
পরের পোলা খায়, বন পানে চায় ॥

অধিকাংশ প্রবাদই যেহেতু দীর্ঘকাল আগে উদ্ভূত, তাই তার ভাষার মধ্যেও খানিকটা প্রাচীনত্বের লক্ষণ থেকে যায়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বদলায়ও বটে, নইলে প্রবাদ জীবিত থাকতে পারে না। যেমন:

একসময়ে যা ছিল—

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

কালক্রমে তা—

'নেই মামার চেয়ে' হতে পারে।

প্রবাদে নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

এক পুত পুত নয়
এক চোখ চোখ নয়,
এক কড়ি কড়ি নয়।

—এখানে নেতিবাচক অর্থাৎ নঞর্থক বক্তব্য উপস্থাপনায় 'পুত', 'চোখ', 'কড়ি'-র পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

প্রবাদের শব্দভাণ্ডারে কিছু অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন:

ভেঙে মারতে সোনার কাঁড়।

কিছু প্রবাদে ধ্বনিতত্ত্বগত প্রয়োগ দেখা যায়। প্রবাদে অপিনিহিতির ব্যবহার ঘটে। যেমন:

ক. আমি কি নাচন জানি না?
জাইন্যা নাচন করি না।

—প্রবাদটি অপিনিহিতির উদাহরণ। কারণ 'জাইন্যা' শব্দে 'ই' আগেই উচ্চারিত হয়েছে।

খ. মাইগ্যা যাচ্যা যাই, বার দুয়ারে না যাই।

এখানে 'মাইগ্যা' শব্দটি উচ্চারণ করার সময়ে 'ই' আগেই উচ্চারিত হয়েছে।

গ. দশদিন চোরের একদিন সাউধের।

—এখানেও 'সাউধে'র 'উ' আগেই উচ্চারিত।
প্রবাদের বাগ্‌ভঙ্গিতে ক্রিয়াপদহীনতা লক্ষ করা যায়। যেমন:

ক. থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়।

খ. অন্ধের নড়ি কৃপণের কড়ি।

গ. বামন হয়ে চাঁদে হাত।

ঘ. সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. গরবে বেটি আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে।

খ. সহজে রাধা কলঙ্কিনী বুক চিতিয়ে হাঁটে।

প্রবাদের বাগ্‌ভঙ্গিমায় যুগ্ম অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

ক. হেসে হেসে কথা কয় এ হাসি ত ভালো নয়।

খ.   ধরে বেঁধে পিরিত আর ঘষে মেজে রূপ দুদিন থাকে।

প্রবাদে নামপদ, ক্রিয়াপদের বিশিষ্টার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

নামপদের ব্যবহার

ক.   হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

খ.   কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর।

ক্রিয়াপদের ব্যবহার

ক.   যে পাত পাতে সে হাত পাতে।

খ.   ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।

সমার্থক শব্দ

ক.   দাতার দেখে দান, বখিলের ফাটে প্রাণ।

খ.   নাম বেরল যাঁর পোঁদ ফাটল তার।

অ-সমার্থক প্রবাদ

ক.   বড় ঘরের বড় কথা গরিবের ছেঁড়া কাঁথা।

খ.   বড় ঘরের বড় কথা বললে কাটা যায় মাথা।

বিষয়ভাবনার অনুকূল যুগল পদবন্ধের ব্যবহার প্রবাদের গঠনশৈলীর অন্যতম বিশেষত্ব। প্রত্যেক চরণে যুগল পদবন্ধের সমিল এবং অমিল পদবন্ধের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

সমিল যুগল পদবন্ধ

ক.   এককালে অনুরাগী
     আর এককালে বৈরাগী।

খ.   চোয়ের মার কুটকুটি
     অন্ধকার ঘুরঘুটি।

অমিল যুগল পদবন্ধ

ক. নাচে ভাল,
পাক দেয় উলটো।

খ. যার মুখে বিষ,
তার জিব চেরা।

শব্দবিশেষের দ্বিত্বমূলক ব্যবহার

গঙ্গাগঙ্গা ভাগীরথী পাপ নেই এক রতি।

সংলাপধর্মিতা

প্রবাদের মধ্যে একই ব্যক্তি প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা। এর কোনওটি কথোপকথনধর্মী এবং কোনওটা একোক্তিধর্মী। যেমন:

কথোপকথনধর্মী

ক. বউয়ের চলন ফেরন কেমন
না তুর্কি ঘোড়া যেমন।

খ. বেগুন কেন খাঁড়া
না বংশাবলীর ধারা।

একোক্তিধর্মী

ক. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

খ. যেমন দাদা গুণমণি
তেমনি বউ রাসমণি।

রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবাদে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত, ব্যতিহার বহুব্রীহি, অব্যয়, নামধাতু, স্বরভক্তি, বিপরীতার্থক শব্দ, তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন:

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ধ্বনিরচিত, বিশেষ কোনও কোনও ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত।

যেমন— পিটপিট, ফরফর, যায় যায়, মিনমিন, ঝমঝম ইত্যাদি।

বহু প্রবাদে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

ক. অমাবস্যার পিদ্দিম টিপ্‌টিপ্‌ করে।

—এখানে 'টিপ্‌টিপ্‌' ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

খ. অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।

—এখানে 'চড়চড়' শব্দটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

অনুকার শব্দ

বাংলা প্রবাদে অনুকার শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

ক. আন সতীনে নাড়ে চাড়ে

বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।

—'নাড়ে চাড়ে' অনুকার শব্দের উদাহরণ।

খ. এক বিয়ের মাগ নাড়ে চাড়ে
দোজ বরের মাগ পুড়িয়ে মারে।

—এখানে 'চাড়ে' শব্দটি অনুকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দদ্বৈত

একই শব্দ যখন একাধিকবার অবিকৃতভাবে পর পর ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে শব্দদ্বৈত বলে। বাংলা প্রবাদে শব্দদ্বৈতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

ক. একসাথে এলাম পাঁচভাই
শেষে দেখি ঠাঁই ঠাঁই ॥

খ. আটে পিটে নোয়া।
নিত্যি নিত্যি থোয়া ॥

—এখানে 'প্রত্যহ' বা 'প্রতিদিন' বোঝাতে 'নিত্যি নিত্যি' শব্দদ্বৈতের ব্যবহার করা হয়েছে।

বহুব্রীহি সমাস

বাংলা প্রবাদে বহু সমাসের ব্যবহারই লক্ষ করা যায়। এখানে উদাহরণ হিসেবে ব্যতিহার বহুব্রীহির ব্যবহার দেখানো হল। যেমন:

ক. কানাকানির পর জানাজানি।

খ. ঠেলাঠেলির ঘর খোদায় রক্ষা কর।

সন্ধিবদ্ধ পদ

কয়েকটি সন্ধিবদ্ধ পদও প্রবাদে লক্ষ করা যায়। যেমন:

কালের নেই কালাকাল।

কাল + অকাল = কালাকাল

প্রত্যয়

তুচ্ছার্থে 'টা' এবং গৌরবার্থে 'টি'র প্রয়োগ ঘটে। বাংলা প্রবাদে প্রত্যয়ের বহু ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি,
বেড়ায় যেন গোপালটি।
ওদের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।

—এখানে নিজের ছেলের গৌরবার্থে 'টি' এবং অন্যের ছেলেকে তুচ্ছার্থে 'টা' প্রযুক্ত হয়েছে।

নামধাতু

প্রবাদেও নামধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

ক. যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।

—এখানে নামধাতু হল 'ধ্যায়'।

খ. যেমন হাতি যেমন খাবে, তেমন হাতি তেমন নাদবে।

—এখানে 'নাদবে' হল নামধাতু।

স্বরভক্তি

বাংলা প্রবাদে স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। যেমন:

ক. কাজীর কাছে হিঁদুর পরব।
পর্ব > পরব।

খ. লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে।
গ্রাস > গেরাস।

তৎসম শব্দ

বাংলা প্রবাদে তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

ক. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

খ. সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

গ. ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ।

ঘ. নষ্ট নারীর পরিচয় বুদ্ধিগুণে সতী হয়।

তদ্ভব শব্দ

প্রবাদে তদ্ভব শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

ক. টক ঝাল কড়া ভাতার।

খ. বামুন মুচ্ছুদ্দি ধোপা গোমস্তা এদের নেই বুঝ অবস্থা।

দেশি শব্দ

প্রবাদে প্রচুর দেশি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন:

ক. চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো।

খ. সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।

গ. অভিমানী দুয়ো নেটিপেটি সুয়ো।

ঘ. অকালে নোয়াইলে বাঁশ বাঁশ করে টাস টাস।

বিদেশি শব্দ

বাংলা প্রবাদে প্রচুর বিদেশি শব্দের (আরবি, ফারসি, ইংরেজি) ব্যবহার ঘটতে দেখা যায়। যেমন:

ক. *কাজির* গরু *খোদা* রাখাল।

খ. *মোল্লার* দৌড় *মসজিদ* পর্যন্ত।

গ. ইয়ং বেঙ্গল খুদে *নবাব*।

ঘ. ইস্তক পুণ্যাহ্ নাগাৎ *আখেরি*।

বিপরীতার্থক শব্দ

বহু প্রবাদে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন:

ক. অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।

—এখানে বিপরীতার্থক শব্দ— পিরীত ও বিচ্ছেদ।

খ. আগে সঞ্চয় পরে ব্যয়।

—এখানে একজোড়া বিপরীতার্থক শব্দ রয়েছে 'আগে' ও 'পরে' এবং 'সঞ্চয়' ও 'ব্যয়'।

সংখ্যাবাচক শব্দ

বহু প্রবাদে সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। এই সংখ্যার ব্যবহার মূলত ব্যাপকতা ও প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহৃত। যেমন:

ক. কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী **চোদ্দ** টাকা।

খ. কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ বসে আছে **পাঁচশ** টাকার আশে ॥

গ. কানা কালা কুঁজো খোঁড়া গোদের অন্ত নাই।
তিনশো বিরাশি বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই।

ঘ. এয়োস্ত্রী **শতেক** স্ত্রী।

ঙ. কড়িও ছয় বুড়ি, দইও চাপ চাপ।

পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদরা প্রবাদের গঠনশৈলী সম্পর্কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একটি পদ্ধতি। এ্যালান ডান্ডেস প্রবাদের আরোপিত বর্ণনামূলক উপরের দুটি বিষয়— 'topic' এবং 'comment'-এর উল্লেখ[১২] করেছেন। এই topic ও comment হল প্রবাদের একক ভিত্তি। যেমন—

ক. নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

এখানে প্রবাদের দুটি অংশ আছে— নাচতে না জানা এবং উঠোন বাঁকা। 'নাচতে না জানা' হল বিষয়, আর 'উঠোন বাঁকা' হল মন্তব্য।

খ. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

—প্রবাদে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও' অংশটি বিষয় এবং 'ধান ভানে' অংশটি মন্তব্য।

আবার, ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কি বিশ্বের ভাষাসমূহের গভীর কাঠামোতে শৃঙ্খলার ও ঐক্যের কথা বলেছেন।[১৩] তাঁর মতে বিশ্বের লোকমনের ও লোকভাবনার সমতা প্রবাদের বিষয়ে ও গঠনে সমতা এনেছে।

জি. বি. মিলনার চতুরঙ্গ গঠনরীতি প্রবাদের দুটি প্রধান অঙ্গ এবং চারটি গৌণ অঙ্গের কথা বলেছেন।[১৪]

এ্যালান ডান্ডেস মিলনারের পদ্ধতি অনুসরণে অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদকে oppositional এবং non-oppositional দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।[১৫] এ দুটি ভাগের উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন:

ক. গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

খ. খোঁড়া পা খালে পড়ে।

—এ দুটি প্রবাদ opposition-এর উদাহরণ।

আবার Non-opposition-এর উদাহরণ হল:

ক. গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।

খ. কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ।

—প্রবাদদুটির পক্ষদ্বয় 'হ্যাঁ', অথবা 'না' হতে পারে অর্থাৎ পক্ষদ্বয় পরস্পরবিরোধী।

প্রবাদের আঙ্গিক গঠনের বিচার-বিশ্লেষণ চিন্তা ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে বিবেচিত হতে পারে। প্রবাদ বুদ্ধিপ্রসূত সাহিত্য প্রকরণ। লোকসমাজে প্রচলিত বিচারবুদ্ধি ও সামাজিক যুক্তির ছাপ আছে। প্রবাদকারের মনের জগতে যেসব প্রক্রিয়া কাজ করে পি ডি গুডউইন (Paul D. Goodwin) এবং জে ডবলিউ ওয়েনজেল (Josep W. Wenzel) সেসবকে সূত্রবদ্ধ করেছেন।[১০] অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ এঁদের মতামতকে সমর্থন করেছেন।[১১] এই মতের সমর্থনে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল:

১. চিহ্ন (Sign)

বাংলা প্রবাদের আঙ্গিক নির্মাণে বিশেষ চিহ্ন প্রভাবিত করে। যেমন:

শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

—প্রবাদে গোঁফ চিহ্নরূপে কাজ করেছে।

২. সংখ্যা (Number)

বাংলা প্রবাদে সংখ্যার স্থান লক্ষ করা যায়। যেমন:

এক ঢিলে দুই পাখি মারা,

কিংবা,

সাত ঘাটের কানাকড়ি।

—প্রবাদ দুটিতে সংখ্যাব ব্যবহার লক্ষণীয়।

৩. কার্যকারণ (Cause and Effect)

বাংলা প্রবাদে কার্যকারণ সূত্রে যুক্তিপ্রবণ লোকমনের ছাপ আছে। যেমন,

ফেল কড়ি মাখ তেল।

কিংবা,

পেটে খেলে পিঠে সয়।

—প্রবাদ দুটিতে যুক্তিপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪. সমতুলতা (Parallel)

বাংলা প্রবাদে দুটি প্রসঙ্গের তুল্যমূল্য গুরুত্ব লক্ষণীয়। যেমন:

সাপ হয়ে কাটে
ওঝা হয়ে ঝাড়ে।

কিংবা,

মারি ত গণ্ডার লুটি ত ভাণ্ডার।

প্রবাদ দুটিতে দুটি প্রসঙ্গের তুল্যমূল্য গুরুত্ব দেখানো হয়েছে।

৫. সাদৃশ্য (Analogy)

অনেক বাংলা প্রবাদে সাদৃশ্য চেতনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। যেমন:

তুমি বেড়াও ডালে ডালে
আমি থাকি পাতায় পাতায়।

কিংবা,

হেলে ধরতে পারে না
কেউটে ধরতে যায়।

—এখানে সমমাপের দুটি বিষয়কে একসূত্রে বাঁধা হয়েছে।

৬. সাধারণীকরণ (Generalization)

বাংলা প্রবাদে সাধারণীকরণের চেতনাও আরোপিত হয়েছে। যেমন:

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।

কিংবা,

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

—প্রবাদ দুটিতে সাধারণীকরণের চেতনা আরোপ করা হয়েছে।

৭. শ্রেণীকরণ (Classification)

বাংলা প্রবাদে শ্রেণীকরণও লক্ষ করা যায়। যেমন:

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

কিংবা,

সব শিয়ালের এক রা।

প্রবাদ দুটি শ্রেণীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮. কর্তৃত্ব (Authority)

কোনও কিছুর উপর প্রভাব খাটালে বা প্রভুত্ব আরোপ করলে কর্তৃত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়। যেমন:

সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।

কিংবা,

মিঠা কথায় চিঁড়া ভেজে না।

প্রথম প্রবাদটি কর্তৃত্বের ধারণা থেকে জন্মলাভ করেছে। ঘি তুলতে গেলে বাঁকা আঙুল দরকার অর্থাৎ সহজে কিছু না হলে চাপ প্রয়োগ করতে হয়—প্রবাদের এই নিহিতার্থে কর্তৃত্বের চেতনা লক্ষ করা যায়। আবার দ্বিতীয় প্রবাদটিও কর্তৃত্বের ধারণাপ্রসূত।

৯. প্রেরণা (Motivation)

বাংলা প্রবাদে প্রেরণাজাত যুক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন:

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

কিংবা,

পরের গোয়ালে ধোঁয়া দেওয়া।

—প্রবাদদুটিতে প্রেরণার যুক্তি লক্ষণীয়।

১০. সম্বন্ধযুক্ত জোড়শব্দ (Pairs)

প্রবাদেব মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত জোড়শব্দ নিয়ে কখনও সাদৃশ্য, কখনও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়, যেমন:

সময়ের এক ফোঁড়
অসময়ের দশ ফোঁড়।

কিংবা,

একের বোঝা
দশের লাঠি।

উল্লিখিত প্রবাদদুটিতে 'এক' ও 'দশ' জোড়শব্দ হিসাবে কাজ করেছে। প্রথম প্রবাদটি সাদৃশ্যবাচক এবং দ্বিতীয় প্রবাদটি বিরোধিতামূলক।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদের গঠনশৈলী বিষয়ে অশোককুমার দে-র সিদ্ধান্তগুলি[১৮] বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

ক. প্রবাদ একটি ভাবের প্রতীক।

খ. ভাবের অখণ্ডতার প্রতীক 'বাক্য'-এর পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রধান বাক্য' কখনও এক চরণ, কখনও বা দ্বি বা ত্রি চরণ বিশিষ্ট একেকটি বাক্য, আর সব প্রবাদবাক্যই এক বাক্যিক রচনা— কোনওটা সরল বাক্য আর কোনওটা যৌগিক বাক্য।

গ. প্রবাদগুলি অনাধুনিক জনপদ বাংলার বিভিন্ন লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গিমা এবং লৌকিক বাংলা ভাষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

ঘ. ছড়ায় বাঁধা অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ ছোট ছোট মেয়েলি বাগ্‌ভঙ্গিমাই প্রকারান্তরে প্রবাদের কাব্যভাষার দৃষ্টান্ত। লৌকিক গদ্যে রচিত প্রবাদও আছে।

ঙ. রসিক মনের ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলে প্রবাদবাক্যের ভাষা সহজ ও ঘরোয়া এবং মননের ভারে ভারাক্রান্ত নয় বলে উপস্থাপনার ভঙ্গিমাও সরল ও একমুখী।

চ. বাক্‌সংক্ষিপ্তি প্রবাদের বাগ্‌ভঙ্গিমার বিশেষত্ব। সে কম কথায় বলে বেশি।

পরিশেষে বলা যায়, প্রবাদের আকার-প্রকার, অর্থগত বৈশিষ্ট্য থেকে লোকজনের শৃঙ্খলা ও পরিমিতির পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ এলোমেলোভাবে প্রবাদ রচিত হয় না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করেই প্রবাদ রচিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য, ১৩৭৮, পৃ. ৭

২. ঐ, পৃ. ৭-৮

৩ দে, সুশীলকুমার বাংলা প্রবাদ, ১৪০৮, দ্র. ভবতোষ দত্ত ও তুষার চট্টোপাধ্যায় লিখিত তৃতীয় সংস্করণের 'নিবেদন'।

৪ দে, সুশীলকুমার: বাংলা প্রবাদ, ১৪০৮, 'ভূমিকা', পৃ. ৪২

৫. ঐ, নিবেদন পৃ. ১৫

৬. ঐ, ভূমিকা পৃ. ২৫

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশম, খণ্ড, পৃ. ১০৬৬

৮ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্প (শেষকথা), দ্র গল্পগুচ্ছ, (৪র্থ খণ্ড) পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৭৫১

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: ছন্দ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দশম খণ্ড, পৃ. ৯৯৪

১০. বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ঐ পৃ. ১০৩৭

১১. ঐ পৃ. ১০৩৮

১২. আহমদ, ওয়াকিল: বাংলা লোকসাহিত্য: প্রবাদ-প্রবচন, ঢাকা, ১৪০১, পৃ. ২১

১৩. ঐ, পৃ. ২২

১৪. ঐ, পৃ. ২২

১৫. ঐ, পৃ. ২৩

১৬. ঐ, পৃ. ২৪

১৭. ঐ, পৃ. ১৪-১৬

১৮. দে, অশোককুমার: লৌকিক প্রবাদ: গঠনশৈলী, দ্র. জোয়ার ৩৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা [মালদহ থেকে প্রকাশিত], পৃ. ৪২

বাংলার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বর্গের সঙ্গে প্রবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন কিংবা লোককথা, গীতিকা বা গীতি, কিংবদন্তি ইত্যাদির সমধর্মিতা বা জীবন-অভিজ্ঞতা প্রসূত বক্তব্যের একটা স্বাভাবিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ হচ্ছে মানব জীবনের অভিজ্ঞতার ও প্রাজ্ঞ মনস্কতার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ যার তুলনা অন্যত্র মেলে না। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বর্গের সঙ্গে প্রবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উদাহরণ সহ সূত্রাকারে তার রূপরেখা তুলে ধরা যেতে পারে।

ক. প্রবাদ ও ধাঁধা

যে বাক্য দ্বারা একটিমাত্র ভাব রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হয়, তাকে ধাঁধা বলে। আর প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সরস প্রকাশ। আঙ্গিক ও গঠনভঙ্গির দিক থেকে প্রবাদের সঙ্গে ধাঁধার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। রচনা ও বহিরঙ্গের গঠনে প্রবাদ ও ধাঁধার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এবারে ধাঁধা ও প্রবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে:

১. প্রবাদ ও ধাঁধা উভয়েই লোকসাহিত্যের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্গ।

২. গঠনভঙ্গির দিক থেকে প্রবাদ ও ধাঁধার প্রবল সাদৃশ্যহেতু বহু প্রবাদ সংগ্রহে প্রবাদরূপে কিছু কিছু ধাঁধাও সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন:

কিবা দেশের গুণ,
একই গাছে পান সুপারি
একই গাছে চুন।

—ধাঁধা হিসেবে এর উত্তর হল 'বটগাছ'। আবার কোনও কোনও ধাঁধার মধ্যে প্রবাদের গুণও লক্ষণীয়। যেমন:

ছাই ভিন্ন শোয় না
লাথি ভিন্ন উঠে না।

ধাঁধায় এর উত্তর 'কুকুর'। প্রবাদে অপদার্থ প্রকৃতির ব্যক্তিকে বোঝায়।

৩. প্রবাদ ও ধাঁধা উভয়ই গদ্য ও পদ্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে। যেমন:

গদ্যাশ্রয়ী—

প্রবাদ: ঘরে নেই খড়
ঢেঁকশালে পরচালা।

অর্থাৎ আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।

ধাঁধা: হাঁ আছে হুঁ নাই
মাথা আছে মগজ নাই। —পুতুল

পদ্যাশ্রয়ী—

প্রবাদ: খরতর নারী ঝরঝর ঝারি
চোর নফর পড় পড় ঘর।
তাক্ জাতি দূরত সর ॥

—মুখরা নারী, ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র, চোর-চাকর, পড়ন্ত ঘর তাদের থেকে দূরে সরে থাকতে হয়।

ধাঁধা: অগণন পাও তার
রাঙ্গা বরণ দেহ
সকল জাহহে তাহা
না বলিবে কেহ। —কেন্নো

৪. প্রবাদের উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতার পরিবেশন, জীবনের কর্মবহুল ক্ষেত্রটিতেই তার আধিপত্য। অন্যদিকে ধাঁধা প্রধানত অবসর বিনোদন, বুদ্ধির অনুশীলন ও কৌতুক সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

প্রবাদে অভিজ্ঞতার পরিবেশন:

ফাগুনে আগুন দিয়ে চৈতে দিয়ে মাটি—
বাঁশটি কহে উঠি উঠি।

—বাঁশ ঝাড়ে ফাল্গুনে আগুন দিয়ে চৈতে মাটি দিলে বাঁশ ভাল হয়।

ধাঁধাতে কৌতুক সৃষ্টি:

ধলা মিয়া হাটে যায়
নিত্য হাটে চিমটি খায়। —লাউ

৫. প্রবাদের ভাষা তীক্ষ্ণ, তীব্র, ব্যঙ্গ ও শ্লেষযুক্ত। কবিত্ব অপেক্ষা বৈদগ্ধই প্রবাদে অধিক। অন্যদিকে ধাঁধার ভাষা ধ্বনিময়, চিত্রময়, শ্লেষ ও তীক্ষ্ণতা বর্জিত।

প্রবাদে শ্লেষ, ব্যঙ্গ:

পারে না কচু কাটতে
আগে ধায় এঁড়ে কুটতে।

ধাঁধার চিত্রময়তা:

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। —আনারস

৬. প্রবাদ ও ধাঁধা প্রায়শই সংক্ষিপ্ত রচনা। সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই প্রবাদের ভাব এবং অর্থ প্রকাশিত হয়।

প্রবাদ: কানে জল দিলেই জল বেরোয়।

ধাঁধা: এতটুকু মিঠাই ঘর ভরে ছিটাই। —আলো

৭. ধাঁধার মধ্যে একটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, প্রবাদের মধ্যে বস্তুর পরিবর্তে একটি ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রবাদ: পাঁচ কাজে দিবা মন।
সব কাজে ঝন্ ঝন্।

ধাঁধা: অজগর নইকো আমি, এঁকে বেঁকে চলি
পথে পথে প্রাণী (পানি) খাই উগলে
আবার ফেলি। —রেলগাড়ি

৮. ধাঁধাতে সকলেই কৌতুক উপভোগ করে, কিন্তু প্রবাদে তা হয় না। প্রবাদে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার সুকঠিন সত্যই ব্যক্ত হয় সেখানে।

প্রবাদ: বেটায় রাখে নাম

বিটিত্ দ্যাখায় গ্রাম।

[গ্রামের গৌরব মেয়ে, বংশের গৌরব ছেলে।]

ধাঁধা: এটির মধ্যে ওটি দিয়ে
মাগ ভাতারে রইল শুয়ে,
বাইরেতে ছেলে যারা
হুটোপুটি করে তারা। —দরজার খিল

৯. ধাঁধার মধ্যে স্ত্রী সমাজের অধিকার অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু প্রবাদের মধ্যে নারীর জীবনচিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রবাদ: বউটি ভাল বটে,
টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।

ধাঁধা: বলি ভাল মানুষের ঝি,
তোমার ব্যাপারখানা কি?
দিতে গিয়ে রয়ে গেলে
আরে ছি-ছি-ছি। —ঘোমটা দেওয়া

—স্ত্রী সমাজের অধিকার সীমিত হলেও স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে ধাঁধা প্রচলিত।

১০. ধাঁধা ও প্রবাদ উভয়ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের অনুশীলন হয়।

প্রবাদ: নদীর যেমুন জোয়ার ভাটা
মাইয়্যার যৈবন পানের বোঁটা।

অর্থাৎ জোয়ারের পরে ভাটার মতোই নারীর যৌবনও ক্ষণস্থায়ী, পানের বোঁটা শুকিয়ে গেলে পানের মতোই ঝরে যায়।

ধাঁধা: ঘরের মধ্যে ঘর নাচে কনেবর —মশারি

—উত্তরটি মস্তিষ্কের অনুশীলন প্রসূত।

১১. ধাঁধার মধ্যে অনেক সময় যে উপমা-রূপক ব্যবহৃত হয় তা কাব্যগুণসমৃদ্ধ, কিন্তু প্রবাদে ধাঁধার এই কাব্যগুণ প্রকাশ পায় না।

প্রবাদ: পোলা বেচ পুরী বেচ
খাজনা দিয়া আগহচ (আগে)।

—অত্যন্ত বাস্তবতার নিদর্শন।

ধাঁধা: উপরে মাটি, নীচে মাটি,
মধ্যে সুন্দর বেটি। —হলুদ

—এটি লুপ্তোপমার উদাহরণ।

১২. বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে ধাঁধা ও প্রবাদ সমগোত্রীয় রচনা। এমন কোন বিষয় বা ব্যাপার নেই যা নিয়ে ধাঁধা ও প্রবাদ সৃষ্টি হয়নি।

প্রবাদ: বিধির নেকা জীবন জোড়া
যেমন সহিস তেমুন ঘোড়া।

—প্রবাদটি দার্শনিক উপলব্ধিজাত যা বিষয়বৈচিত্র্যের উদাহরণ স্বরূপ।

ধাঁধা: ক. দুই হাত তুলিয়া, মধ্যে দিলাম ভরিয়া
কাজটি দিলাম সারিয়া। —চুলের কাঁটা

খ. লগে (সঙ্গে) গেলো
লগে আইলো
বাজারে গি
পেট ভরলো। —তেলের বোতল

—ধাঁধা দুটিতে অতি সামান্য বা তুচ্ছ জিনিসও স্থান পেয়েছে।

১৩. ধাঁধার প্রকাশভঙ্গি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই-ই হতে পারে, কিন্তু প্রবাদের প্রকাশভঙ্গি প্রত্যক্ষ।

প্রবাদ: (কর্মবিমুখ নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গোক্তি):
যদি বলে পাকের কথা, তবেই ওঠে মাথার ব্যথা।

ধাঁধা:

প্রত্যক্ষ: কাঁচা খাও পাকা খাও খাইতে মিষ্টি,
আমি যদি খেতে বলি চটে গিয়ে কর অনাসৃষ্টি। —কলা

পরোক্ষ: এ পারেতে বুড়ি মরে,
ও পারেতে গন্ধ ছাড়ে। —কাঁঠাল

১৪. রচনার দিক দিয়ে প্রবাদ ধাঁধার চেয়েও অধিক যুক্তিনিষ্ঠ।

১৫. ধাঁধায় অনেক সময় পদপূরণ বা চমক দেওয়ার জন্য অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর বাক্য থাকে, কিন্তু প্রবাদে ভাবশৈথিল্য, অর্থবিচ্যুতি বা বাক্যবিলাস নেই বললেই চলে।

প্রবাদ: কোদাল কটি কলাই দাঁতি
ঘর ভাঙানোর হাতি।

প্রবাদটিতে কোদাল কোমরী ও কলাই দাঁতি ঘর ভাঙে বলার মধ্যে কোনও বাক্যবিলাস নেই বা অর্থবিচ্যুতি ঘটেনি।

ধাঁধা: রাজার বাড়ির মেনাগাছটি ম্যান ম্যানিয়া চায়,
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরও খাইতে চায়।
—শিল-নোড়া

—ধাঁধাটিতে 'রাজার বাড়ির মেনাগাছে'র প্রসঙ্গটি অবান্তর।

১৬. অভিজ্ঞতায় নিষিক্ত সত্যকথন প্রবাদের ধর্ম, কিন্তু ধাঁধায় সত্যকথন ও অতিকথন দুই-ই আছে।

প্রবাদ: রাঁধুনীর সঙ্গে পিরীত থাকলে ভোজনেতে সুখ।

ধাঁধা: দুই মুখে কথা কয় থাপ্পড় যদি খায়,
নয় মাসের পেট নিয়ে মারার কথা কয়।
জ্যান্ত লোকের কাঁধে উঠে যদি পৈতা দিলে,
কথার জবাব না দিলে তোমার মাথা হবে ধলা। —ঢোল

—ধাঁধাটিতে সত্যকথন ও অতিকথন দুই-ই আছে।

১৭. প্রবাদ আকারে ছোট, কিন্তু বক্তব্যে বৃহৎ। ধাঁধা আকারে ছোট হলেও বক্তব্যে বৃহৎ নয়।

প্রবাদ: এক হাতে তালি বাজে না।

ধাঁধা: হাঁড়ার ভিতর কাড়া (মহিষ) গোঁসায়। —ঘুঙুর

১৮. অন্যথাবৃত্তি ধাঁধায় চলে, কিন্তু প্রবাদে অন্যথাবৃত্তি অচল।

প্রবাদ: মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই।

ধাঁধা: হাস্‌তি হাস্‌তি যায় নারী, পর পুরুষের কাছে
লইবার কালে কান্দাকাটি, মধ্যে গিলি হাসে।
—চুড়ি পরা

১৯. ধাঁধার বর্ণনা তাৎপর্যবাহী, প্রবাদের বক্তব্য অর্থবাহী।

প্রবাদ: ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ধাঁধা: গাঙ্গপারের বুড়ী নাও ধান কুটে,
কাঁকলিতে পাড় দিলে কেক্কাৎ করি উঠে। —ঢেঁকি

—ধাঁধাটির 'ঢেঁকি'র কল্পনায় একটি স্বচ্ছ জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। মানবজীবন সম্পৃক্ত ধাঁধায় 'ঢেঁকি'কে করেছে ইঙ্গিতবহ। আর প্রবাদে ঠিক উলটো ব্যাপার— ঢেঁকির স্বভাব দ্বারা মানবস্বভাবকে সংকেতিত করেছে।

২০. ধাঁধা ও প্রবাদ উভয়ই ব্যঞ্জনাধর্মী।

প্রবাদ: মেয়ের নাম ফেলী,
পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।

কিংবা, মেয়েছেলে কাদার ঢেলা,
ধপাস করে জলে ফেলা।

—প্রবাদটির মধ্যে ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

ধাঁধা: হরিণের লেজ নাই
শিকারীর পা নাই
যে দেখে তার মাথা নাই। —কাঁকড়া

—ধাঁধাটিতে হরিণ ও শিকারির মধ্য দিয়ে কাঁকড়াকে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে।

২১. ধাঁধায় আছে বর্ণনার লালিত্য, আর প্রবাদে আছে অর্থের মহিমা।

প্রবাদ: বাপ্-মার আশুবাদ
খা-বাচা ঘি ও ভাত।

অর্থাৎ বাপ-মায়ের আশীর্বাদ থাকলে ঘি-ভাত জোটে। প্রবাদটির মূল অর্থই এখানে প্রধান।

ধাঁধা: গাছের নাম হিরা, কতক হয় পান সুপারী,
কতক হয় জিরা। —কদম গাছ

ধাঁধাটি বর্ণনার লালিত্যে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

২২. বর্ণনার গুণে ধাঁধা সাহিত্যধর্মী, তার প্রবাদ তথ্যমাত্র।

প্রবাদ: যেতদিন কড়ি,
তেতদিন ছড়ি।

—প্রবাদটি তথ্যের বর্ণনা অর্থাৎ কড়ি থাকলেই ছড়ি ঘোরানো যায়।

ধাঁধা: বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার
জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার।
জখন পুরুষ তাহে হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান ॥ —ডিম

—এটি ডিম সম্পর্কিত একটি সাহিত্যিক ধাঁধার উদাহরণ।

২৩. প্রবাদ ও ধাঁধা উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থের সূত্র ধরে কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়।

প্রবাদ: যও জানে যাতে জানে
যে পিষে সে জানে।

—(যও-যব) যার যন্ত্রণা সেই জানে।

ধাঁধা: ফুল হয় শতশত, ফল হয় বারোডা
পাক্‌লি এ্যাকটা। —দিন, মাস, বছর

২৪. প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত, ধাঁধাও তাই।

প্রবাদ: সম্বল রেখে খেয়ো,
বেলা থাকতে বাড়ি যেয়ো।

—সংসার ক্ষেত্রে এই কথাটির গুরুত্ব অনেকখানি। এ ধরনের প্রবাদ ঐতিহ্যাশ্রিত।

ধাঁধা: পাঁচজনে তুলে দিলে বত্রিশ জনের পরে
সকলকে একজনে টেনে নিলে ঘরে।

—পাঁচ আঙুল, বত্রিশ দাঁত ও জিভ

—প্রত্যেক মানুষই খাদ্য গ্রহণ করে। এই রীতি মানুষের জীবনে অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে। এই ধরনের ঐতিহ্য তাই ধাঁধাতেও লক্ষ করা যায়।

২৫. ধাঁধা ও প্রবাদ উভয়ই জনশ্রুতিমূলক হয়েও সমকালীন।

প্রবাদ: সরগোচালি বউ।
কামে নি দেয় মন।

—সরগোচালি অর্থাৎ পাড়াবেড়ানো। এ ধরনের প্রবাদ বহু শোনা যায় যা সব সময়ে সমকালকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়।

ধাঁধা: দুই চাল এক বাতি
বলে দাও তার নাম কি? —কলাপাতা

—ধাঁধাটি জনশ্রুতিমূলক হয়েও সমকালীনতা রক্ষা করেছে।

২৬. বহু ধাঁধাকে প্রবাদে কিংবা প্রবাদকে ধাঁধাতে পরিণত হতে দেখা যায় তবে একইভাবে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের অর্থ আলাদা।

প্রবাদ: দুই ভাই এক বাড়িতে প্রায়ই
বিবাদ বিসম্বাদে বাস করে।

ধাঁধা: এক উঠানে দুই ভাই
কেউ না কারে দেখতে পায়। —চোখ

—উভয়েরই অর্থ আলাদা।

২৭. একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর আত্মার মর্মস্থল থেকে ধাঁধা বেরিয়ে আসে বলে তাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

ধাঁধা: এক বাড়ির তিন বউ
এক পালানে রান্না থোও। —উনুন

প্রবাদ: এক বাড়ির তিন বউ হলে তাতে একান্নবর্তী পরিবারের অন্তরঙ্গতার ছবি পাওয়া যাবে।

২৮. প্রবাদ লোকসাহিত্য ধারায় ক্ষুদ্রতম রচনা। সাধারণত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত বাক্যে প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি।

প্রবাদ:

ক. পিরীতের না ডাঙায় চলে।

খ. গরু মেরে জুতা দান।

গ. অতি চালাকের গলায় দড়ি,
অতি বোকার পায়ে বেড়ি।

ধাঁধা: ধাঁধাতে একটিমাত্র বাক্য আছে।

যেমন:

কথায় আছে কাজে নাই। —ঘোড়ার ডিম

দুই চরণের বাক্যও ধাঁধাতে লক্ষ করা যায়। যেমন:

মুখ আছে তার মাথা নাই,
পেট আছে তার পা নাই। —বোতল

২৯. অন্ত্যমিল বিশিষ্ট ও ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের ধাঁধা ও প্রবাদের সংখ্যাও অনেক। যেমন:

প্রবাদ: বাকি বাক্য বাটপাড়ি—
এই তিন নিয়ে দোকানদারি।

ধাঁধা: আট পা ষোল হাঁটু,
জাল বুনাইছে বুড়া টাটু। —মাকড়সা

৩০. ধাঁধা বুদ্ধি ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত; এতে জাতির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। আর প্রবাদে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধি, নিটোল নীতিবাক্য, নৈতিকতার অলিখিত বিধি প্রকাশিত।

৩১. ধাঁধা বস্তুধর্মী ও জীবনবাদী রচনা, এতে জাতির ইহজাগতিক চেতনার প্রকাশ আছে, প্রবাদও ধাঁধার মতো বস্তুধর্মী ও জীবনবাদী রচনা।

প্রবাদ: পাঁচ কাজে দিবা মন
সব কাজ ঝন্‌ঝন্‌।

ধাঁধা: হাত পা তার ইটের সমান
অতি পুর ছাল তার পেটে বাড়ে মান। —গম

—গম বিষয়ক এই ধাঁধাটি বস্তুবাদী ও জীবনবাদী রচনা।

৩২. কৌতূহল ও কৌতুকবোধ থেকে ধাঁধার জন্ম, এতে জাতির সরস জীবনীশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রবাদে কৌতুকবোধ থাকলেও এর জন্ম কৌতূহল ও কৌতুকবোধ থেকে নয়, তবে ধাঁধার মতো প্রবাদেও জাতির সরস জীবনীশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রবাদ: বউ য্যান স ছুরি
না মানে শাশুড়ী বুড়ী।

—প্রবাদটিতে রূপসী বউয়ের দেমাকে সরস জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ধাঁধা: তিনি ত চললেন
দিয়া কেন রাখ না?
না দিলে যাবে না।

কাহিনিটি হল এক কৃষাণের তিন ছেলে ছিল। তিনজনেই ছিল বিবাহিত। একদিন প্রথম ছেলের ঘরে সন্ধ্যা দেবার সময় তৈলহীন কুপিটি নিবু নিবু করছিল। ঠিক এমনি সময় জনৈক পথচারী ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন মেজো ছেলের বউ বলে উঠল, 'তিনি ত চললেন'। প্রথম পুতের বউ তখন উত্তরে বলল, 'দিয়া কেন রাখ না?' কথার পিঠেই তখন তৃতীয় পুতের বউ বলে উঠল, 'না দিলে যাবে না।' এদিকে তো বেচারা পথচারী ভেবে নিয়েছিল নিশ্চয় পুরুষকামিনী স্ত্রীলোক তিনটি তাকে দেখে এরূপ করছে। আসলে কুপিটির তেলকে কেন্দ্র করেই পথচারীকে ধাঁধা লাগাবার জন্য তিন বউ ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করল। কী নির্ভেজাল রসিকতা!

৩৩. প্রবাদ উপমা, বক্রোক্তি, বিরোধিতা, অতিশয়োক্তি অলংকারের সহায়তায় প্রকাশিত হয়। ধাঁধায় সাধারণত উপমা-রূপক অলংকারের প্রকাশ দেখা যায়।

প্রবাদ: কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো।

এর উপমা প্রয়োগ, সহজ প্রকাশভঙ্গি ও তির্যক ব্যঞ্জনা যেমন জীবনমুখী, তেমনি সরস এর কৌতুকবোধ।

ধাঁধা: এরাও মা ঝি,
ওরাও মা ঝি,
আনছে তিনটা সাজি,
সমানে ভাগ কর কাজী। —মা, মেয়ে, নাতনি

ধাঁধাটি রূপক অলংকারের একটি সার্থক উদাহরণ। এখানে 'মা' ও 'ঝি'র দু'বার প্রয়োগ ও তিনটা সাজির মধ্যে একটা অভেদারোপ ঘটেছে। অতএব এটি রূপক।

৩৪. ধাঁধা প্রাচীন হয়েও চিরকালীন, প্রবাদও ধাঁধার মতো সর্বকালীন।

প্রবাদ: বউ জব্দ কিলে, হলুদ জব্দ শিলে
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।

জব্দ সম্পর্কে উপমাত্মক এই ধরনের প্রবাদের সর্বকালীনতা স্বীকার্য।

ধাঁধা: একটা বুড়ির তিনটি মাথা। —উনুন

গৃহজীবনে উনুনের প্রয়োজনীয়তা কারও অজানা নয়। ধাঁধার রাজ্যে এরকম বহু জিনিস আছে যাদের নিয়ে কৌতুক করে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। তাই ধাঁধা চিরকালীন বা সর্বকালীন।

খ. প্রবাদ ও ছড়া

প্রবাদ ও ছড়ার মধ্যে মিল ও অমিল উভয়ই লক্ষ করা যায়। "ছেলেভুলানো ছড়াতে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মায়েদের যে কল্পনাবহুল স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন, তাহার উল্টো-দিকের বাস্তবচিত্রই প্রবাদের অনতিরঞ্জিত ছড়ায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মূর্তিমান হইয়াছে।"[১] অর্থাৎ ছড়া ও প্রবাদ বিপরীতধর্মী। প্রবাদ ও ছড়ার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল:

১. প্রবাদ ও ছড়া উভয়েই মুখের ভাষা বা চলতি ভাষাকে আশ্রয় করে থাকে।

প্রবাদ: বড়ো বউ রাঁধে যেমন-তেমন, মেজো বউ রাঁধে ছাই,
নতুন বউ রান্না করে অমৃতসমান খাই।

ছড়া: হা-ডু-ডু পেয়ারা পাতা।
দুগালে দুটি ছেঁড়া জুতা ॥
এক হাত বোলতা তিন হাত শিং।
উড়ে যায় বোলতা ধাতিং তিং ॥
(হা-ডু-ডু খেলার ছড়া)

২. বর্ণনার তীক্ষ্ণতা ও ক্ষিপ্রতা উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

প্রবাদ: মুখের কথা কইয়া,
পাও ধারোগা বইয়া।

ছড়া: ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌।
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

৩. শ্বাসাঘাতের বিশিষ্টতা, অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

প্রবাদ: কাঁচায় না নোয়াইলে বাঁশ,
পাকলে করে ঠাস ঠাস।

ছড়া: আসুদ গাছে টিকটিকি লঙ্কা গাছে ছাই,
সরে যাও গো গুণের ভাশুর চাল ধুতে যাই।
পড়ে গেলাম ভাশুর হড়কানে,
তুলে ধর ভাশুর আমায় সাবধানে।

৪. ছড়া পদ্যাশ্রিত, কিন্তু প্রবাদ গদ্যাশ্রিত ও পদ্যাশ্রিত দুই-ই হয়।

প্রবাদ (গদ্যাশ্রিত): মার কাছে মামার বাড়ির গল্প।

প্রবাদ (পদ্যাশ্রিত):
আমের ফল ঝোপা ঝোপা
তিতিলির ফল বাঁকা।
বুড়া মাইয়া ভাতার ধরে
তাও পিন্ধে শাঁখা।

ছড়া: আম পাতা জোড়া
মারব চাবুক চড়বো ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া ॥

৫. ছড়ার তুলনায় প্রবাদের বিষয়বৈচিত্র্য অনেক বেশি; এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

প্রবাদ (বিষয়বৈচিত্র্য):

মা সম্পর্কে— চিঁড়ে বল মুড়ি বল ভাতের বাড়া নেই।

মাসি বল পিসি বল মায়ের বাড়া নেই।

বধূ সম্পর্কে— কাজ নেই বউ কাজ করে।
ধানে চালে এক করে।

কন্যা সম্পর্কিত— মেয়ে নয়তো সাত বেটা, মেয়ের বিয়ের করব ঘটা।

শাশুড়ি সম্পর্কিত— মায়ের পেটের ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার।

ননদ সম্পর্কিত— ভাইয়ের বউয়ের বাপের বাড়ি দাসদাসী খাটে।
সেই গরবে বেটি আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে।

খ. সমাজজীবন:

কুটুম্ব প্রসঙ্গে— এমন কুটুম্ব কোথায় পাই, গাদা খান থুয়ে লেজ খানা খাই।

গ. পিরিত প্রসঙ্গ:

নতুন নতুন খইয়ের মোয়া মচর মচর করে,
পুরনো হলে খইয়ের মোয়া নেতাইয়া পড়ে।

ঘ. সিদ্ধান্তমূলক প্রবাদ:

আপনার বেলায় আঁটি সুঁটি
পরের বেলায় চিমটি কাটি।

৬. ছড়া: ছড়ায় বিষয়বৈচিত্র্য কম। ছেলেভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, ব্রতের ছড়া ইত্যাদি বিষয়ক ছড়া পাওয়া যায়, তবে প্রবাদের মতো তত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়।

ক. ছেলেভুলানো ছড়া—

কেঁদ না রে সোনামণি
কাঁদলে গলা ভাঙ্গবে।
রাত পোহালে বাঁশি দেব,
যত সোনার লাগবে।

খ. খেলার ছড়া—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি।
কমলা পুলির টিয়েটা।
সূয্যি মামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই।[২]

ছড়া আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত দুই-ই হতে পারে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রবাদ বলে কিছু নেই।

প্রবাদ: আনুষ্ঠানিক প্রবাদ নেই। অনানুষ্ঠানিক প্রবাদই বেশি, যেমন:

(নৈতিক অধঃপতন বিষয়ে)

আনাগোনা, হাসি, ভালো নয়গো মাসি।

ছড়া (আনুষ্ঠানিক):

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা,
কে পূজেরে দুপুর বেলা।
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।
হয়ে পুত্র মরবে না,
পৃথিবীতে ধরবে না। (পুণ্যিপুকুর ব্রত)

অনুষ্ঠান বর্জিত ছড়া:

আখবাড়ির ধারে,
ট্যাংরা মাছ নড়ে।
শালুক পাতা সলতে,
পিদিম কেন জ্বলছে।

নাখছাবিটা হারিয়ে গেল,
সদা মনে পড়ছে।

৭. প্রবাদে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং তীব্র সমালোচনাই প্রধানত লক্ষ্য থাকে, ছড়াতে তা থাকে না। ছড়ায় সোজাসুজিভাবে বলা হয়।

প্রবাদ: পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায় ॥

ছড়া: রাগ করো না শাশুড়ি গো আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও তবে দাঁড়াই কোথা যেয়ে।

৮. ছড়ার মধ্যে বিশ্বাস, প্রবাদের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পায়।

প্রবাদ: জমি কিনো কান্দর,
বউ কিনো বান্দর।

ছড়া: তাই তাই তাই
মাসির বাড়ি যাই।
মাসির বাড়ি ভারি মজা
কিল চড় নাই।

—এখানে মাসির প্রতি বিশ্বাসের সুর ধ্বনিতে হয়েছে।

৯. ছডায় যা শাশ্বত সত্য, প্রবাদে তা শাশ্বত সত্য নয়।

প্রবাদ: মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস করে জলে ফেলা।

ছড়া: আমরা দুটি ভাই,
কে দেবে ফোঁট (ফোঁটা) কপালে—
ভাইফোঁটা তাই নাই।

১০. রূপায়ণের দিক দিয়ে প্রবাদ সংক্ষিপ্ত, ছড়া দীর্ঘতর।

প্রবাদ: উপবাসী প্রাণ, করে আনচান।

ছড়া: আদুড় বাদুড় চাল্‌তা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে,

টোপর মাথায় দে।
তোরা দেখতে যাবি কে?
চামচিকিতে বাজনা বাজায়
খ্যাংরা কাঠি দে ॥

১১. কোনও কোনও প্রসঙ্গে ছড়াও প্রবাদের অনুরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে দুটি ছড়া ও প্রবাদের উল্লেখ করা যায়। যেমন:

প্রবাদ: শাশুড়ি নেই ননদ নেই, কার বা করি ডর,
আগে খাই পান্তাভাত শেষে লেপি ঘর।

ছড়া: শাউড় নাই ননদ নাই কারে করমু ডর।
আগে বাড়মু ভিজ্যা ভাত পাছে মুছমু ঘর ॥

—এখানে শাশুড়ি ও ননদ সম্পর্কে বধূর যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা প্রবাদেরই অনুরূপ। উপরিউক্ত প্রবাদ ও ছড়াটি উক্তিমূলক। ছড়া ও প্রবাদ দুইয়ের মধ্য দিয়েই শাশুড়ি-ননদ ও বধূর সম্পর্কে জটিলতার প্রকাশ।

১২. রচনার দিক দিয়ে ছড়া শিথিলবদ্ধ; কিন্তু প্রবাদ দৃঢ়সংবদ্ধ।

প্রবাদ: কিসের মাসি, কিসের পিসি
কিল ছাড়া কি ভাতে বসি।

ছড়া: ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো,
খাট নেই পালং নেই
চোক্ পেতে বসো।
বাটা ভরে পান দেবো
গাল পুরে খেও,
খোকার চোখে ঘুম নেই
ঘুম দিয়ে যেও।

গ. প্রবাদ ও গীতি-গীতিকা

১. প্রবাদ বাস্তবজীবনের দার্শনিক অভিব্যক্তি। মানুষের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রার কর্ম, আচার, ব্যবহার ও মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সংযোগের সেতু হল প্রবাদ। তির্যক ব্যঙ্গ ও চরিত্র সংশোধনের নানাবিধ জীবন প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রবাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য প্রবাদ রচনার দিক থেকে সংক্ষিপ্ততম। যদিও ছন্দ প্রকরণ প্রবাদে দুর্লভ নয়। কিন্তু প্রবাদ গাইবার জন্য রচিত হয় না।

২. গীতি ছন্দ-সুরের সহযোগে পরিবেশন করবার জন্য রচনা করা হয়। তাল-মাত্রা-মিড়-গমক-মূর্চ্ছনা ইত্যাদি গীতির আঙ্গিক। শব্দ ও স্বরক্ষেপণ সংগীতের প্রধান প্রকরণ। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে প্রবাদ জীবনবোধের গভীরতম সত্যকে সংক্ষেপে মানুষের কাছে সংবেদন করে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগের উপর প্রবাদের সার্থকতা নির্ভর করে। বাস্তবজীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্যই প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ প্রকৃতি মানুষের শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়কে আঘাত করে না, মর্মস্থলকেও বিদ্ধ করে। ছড়া, কবিতা, গীতি বা গীতিকার চলন একটু লঘুচালের, ভাষাও চপল এবং হালকা চালের। পক্ষান্তরে বাংলা প্রবাদের ভাষা, গঠনের প্রক্রিয়ায় তৎসম, তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশি। আর এই শব্দগুলির ওজন ও মাত্রা গীতিকার তুলনায় অনেক বেশি।

৩. প্রবাদে ছন্দের প্রয়োজন অনিবার্য নয়। অধিকাংশ প্রবাদই এক **পঙ্‌ক্তি**নির্ভর। যেমন— টাকা কথা বলে। পক্ষান্তরে গীতি ও গীতিকায় কোনও অনুভূতিকে এক পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দু'-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে।

এক সত সুন্দরী কান্দে চরণ ধরিয়া।
এতে ধর্ম্মি রাজা না যাও ছাড়িয়া ॥
না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দির ঘর ॥
(মাণিকচন্দ্র রাজার গান)

একাধিক পঙ্‌ক্তিরও প্রবাদ পরিলক্ষিত হয়। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

অভদ্রা বর্ষাকাল, হরিণী চাটে
বাঘের গাল।
শুন হরিণী তোরে কই, সময়গুণে
সবই সই।

হরিণী ও বাঘের সম্পর্ক হচ্ছে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। কিন্তু মানব সমাজেও এমন বিশেষ মানব-মানবী আছে, এমন সমাজ আছে যেখানে মানুষই মানুষকে গ্রাস করে।

কিন্তু এক পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট অনেক প্রবাদ আছে যেখানে জীবনসত্য গভীরভাবে প্রকাশিত যেমন:

ক. বুদ্ধি যার বল তার।

খ. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

গ. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

ঘ. ধন জন পরিবার কেহ্ নয় আপনার।

ছন্দের উপস্থিতি ইতস্তত প্রবাদে পরিলক্ষিত হলেও গীতিসুলভ প্রবাদ পরিবেশন করবার রীতি বাংলায় অনুপস্থিত। প্রবাদে রোমান্টিক কল্পনা প্রকাশের অবকাশ নেই। কিন্তু গীতি বা গীতিকায় প্রেম ও প্রণয়ের চিত্র যেমন রোমান্টিক কল্পনানির্ভর, তেমনি বাংলার মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা গীতিকাগুলি গায়েনরা সুর করেই গাইতেন বা পরিবেশন করতেন। প্রবাদ ও গীতিকার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য একটাই।

প্রবাদ সমাজমনস্তত্ত্ব নির্ভর সৃষ্টি, প্রাজ্ঞ মনস্কতার ফসল। অথচ লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির রচনারীতি ও পরিবেশনা একটু ভিন্নরূপের ও মাত্রার। ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রবাদের গতিশীলতা ও সংবেদনশীলতা অন্যান্য রচনার তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, তির্যক ও ব্যঙ্গাত্মক। গীতিগীতিকা ও লোককথা মূলত গল্পনির্ভর বা কাহিনীনির্ভর রচনা। চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই লোককবি কখনও কখনও খণ্ড প্রবাদ তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে এটা বলা চলে যে আমাদের লোককবি বা প্রাজ্ঞমানুষ তাঁদের নানা কর্ম-চিন্তা জীবনের

ঘাত-প্রতিঘাত থেকে দার্শনিক সত্য আহরণ করে প্রবাদের মতো স্বল্পাক্ষর বিশিষ্ট রচনার রূপায়ণ ও পরিবেশন করেছেন। এখানেই প্রবাদ ও অন্যান্য রচনার আঙ্গিকগত পার্থক্য পরিস্ফুট।

তথ্যসূত্র

১. দে, সুশীলকুমার: বাংলা প্রবাদ, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ২৯

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সংগৃহীত ছেলেভুলানো ছড়া (১৩০২): সম্পাদনা ও সংকলক অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায়, ২৭নং ছড়া, পৃ. ২৪

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের প্রয়োগ ও ব্যবহার

নির্বাচিত দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ

ভারতীয় সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা বিপুল সংখ্যক প্রবাদের সন্ধান পেয়ে থাকি। কালিদাস, শূদ্রক কিংবা বাণভট্ট এঁদের প্রত্যেকের কাব্য, নাটক ও উপাখ্যানে ইতস্তত প্রবাদের ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে নারী চরিত্রের কথোপকথনে। কালিদাস ভদ্রেতর চরিত্রে যথেষ্ট লৌকিক আচার-আচরণ ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে তাঁর সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদ লোকজীবনমুখী। বৈদিকোত্তর ভারতবর্ষে জনজীবনকে আশ্রয় করে সাহিত্যের প্রকাশ ঘটেছে বেশি। উপরন্তু মাতৃতান্ত্রিক জনজাতির জীবনে প্রবাদ অনিবার্যভাবে মনের ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ব্যবহৃত একটি প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে:

গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ।

বাংলায় তুলনীয় প্রবাদটি হল: গোদের উপর বিষফোঁড়া।

অনুমান করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে এক দার্শনিক প্রাজ্ঞমনস্কতার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে রাজদরবারের কবিরা এই জনজীবনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে যুক্ত ছিলেন বলেই তাঁদের সাহিত্যে প্রবাদের সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে। আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে সংস্কৃত অনুরাগী বাঙালি কবিরাও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। 'গাথাসপ্তশতী' কিংবা 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' এই প্রবাদ কিংবা

প্রবচনের সরস ব্যঞ্জনা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাহিত্য বা সাহিত্যশিল্প জনজীবনমুখী ছিল সেই সময়। সেইজন্য সমাজের নিম্নভূমিতে বসবাসকারী সাধারণ দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রার মধ্যেও অনেক সুললিত প্রবচনের প্রচলন পাঠককে বিস্মিত করে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা কিংবা রূপক যেমন এঁদের সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এঁদের এই শিল্প-ঐতিহ্য কিংবা বাচনভঙ্গি সমাজের নিম্নভূমি থেকে উচ্চমার্গীয় সাহিত্য অর্থাৎ দরবারি সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছিল। এর প্রধান কারণ হল সাহিত্য ও শিল্পের ঐতিহ্য জনজীবনের গভীরে চিরস্থায়ী আশ্রয় নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্গীয় মানুষের যোগাযোগের নিবিড়তার ফলে এক অখণ্ড সাহিত্যবৃত্ত সমাজে গড়ে উঠেছিল, যদিও অর্থনৈতিক তারতম্য সে যুগের জীবনযাত্রায় ব্যাপকভাবে প্রকটিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই লৌকিক ঐতিহ্য স্থান থেকে স্থানান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এক অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হয়েছিল। এই ঐতিহ্য প্রবাদে লোকচক্ষুর অন্তরালেই ঘটে থাকে এবং এর সর্বজনীন স্বীকৃতি সমাজজীবনে অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজের এই প্রকৃতিকে বলা হয় "Social persistence" বা সামাজিক সঞ্চরণশীলতা।

প্রাক্-আধুনিক বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কতকগুলি বিষয়ের সঞ্চরণশীলতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। যেমন লোকবিশ্বাস, লোকাচার, মন্ত্র-তন্ত্র, শৈল্পিক সৃষ্টির ভাষাগত কিংবা বস্তুগত ক্ষেত্রে যে প্রকাশশৈলী তা অক্ষয় ও অমর হয়ে প্রবহমান। সেইজন্য আধুনিক বা প্রাক্-আধুনিক কবিমণ্ডলী বা শিল্পীরা তাঁদের স্ব স্ব সমাজক্ষেত্রে গোষ্ঠীসংস্কৃতির ধারাকে বহন করে চলেছেন। হয়তো কোথাও ঐতিহ্য বা প্রকাশশৈলীর অখণ্ডতা বিরাজমান, আর কোথাও বা এই প্রকাশশৈলীর ঐতিহ্য চূর্ণ হয়ে সাহিত্যের লীলাক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত হয়। নানা সামাজিক কারণে কিংবা অভিঘাতে এই বিচ্ছুরণ অনিবার্যভাবে ঘটে যায়। কারণ এই ঐতিহ্য বিচ্ছুরণ হল জীববিজ্ঞানের ভাষায় জৈবিক জিনোম অথবা Culture Gene।

বাঙালির সমাজজীবনে প্রচলিত বহু প্রবাদ বাংলা সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। হাজার বছর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের যখন প্রথম জন্ম হয়, তখনই তার মধ্যে সাহিত্যিক প্রবাদরচনার সূত্রপাত ঘটে। 'বৌদ্ধগান ও

দোহা'র মধ্যেও বহু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় এগুলিই প্রথম সাহিত্যিক প্রবাদ। এইসব প্রবাদগুলি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল:

বৌদ্ধগান ও দোহা

১. হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ। (৩২ নং পদ)

অর্থাৎ হাতের কঙ্কণ আছে কিনা তা দেখাবার জন্য দর্পণের দিকে না তাকানো।

২. অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (৬ নং পদ)

অর্থাৎ হরিণ তার নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রুস্বরূপ।

৩. হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী। (৩৩ নং পদ)

অর্থাৎ হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথি আসে।

৪. দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়। (৩৩ নং পদ)

অর্থাৎ দোয়ানো দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে।

৫. সরস ভণন্তি বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ্য বলন্দেঁ। (৩৯ নং পদ)

অর্থাৎ দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। (দুর্জনের সঙ্গে বসবাস অনাকাঙ্ক্ষিত)[১]

উপরি-উক্ত প্রবাদগুলির মধ্যে বেশ ক'টি প্রবাদ এখনও শব্দের একটু রদবদল হয়ে মুখে মুখে প্রচলিত থেকে আজও টিকে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বহু সাহিত্যিক প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তার সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকল। (দানখণ্ড, ৭৮ নং পদ)

অর্থাৎ বানরের হাতে যেমন ঝুনা নারকেল। বানর ঝুনা নারকেল খেতে পারে না। এটি ব্যঙ্গার্থে বলা হয়েছে।

এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিভিন্ন খণ্ডে অনেক প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন:

তাম্বুলখণ্ড

যে থানে শুঁচী না জাএ। তথাঁ বাটিআ বহাএ ॥ (২৯ নং পদ)

অর্থাৎ যেখানে সূচ প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে রজ্জু ঢোকানো, যেটা অসম্ভব ব্যাপার।

দানখণ্ড

১. ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ। (৪১ নং পদ)

অর্থাৎ ভাগ্যের লিখন খণ্ডানো যায় না।

২. দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।

আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ (৪৮ নং পদ)

অর্থাৎ বেল পাকলে কাকের কিছু যায় আসে না, কারণ বেল শক্ত বলে কাক খেতে পারে না।

৩. আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী। (৯৬ নং পদ)

অর্থাৎ হরিণ তার নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রুস্বরূপ।

নৌকাখণ্ড

মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞি না সাম্বাএ চুরী (১৬১ নং পদ)

অর্থাৎ রুদ্ধ ভাণ্ডারে চোর প্রবেশ করতে পারে না।

ভারখণ্ড

হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই। (১৯৪ নং পদ)

অর্থাৎ হাত বাড়ালেও চাঁদকে স্পর্শ করা যায় না।

ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড

দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে। (২১৪ নং পদ)

অর্থাৎ চোর সাধুর ধন দেখে চুরি না করে পুড়ে মরে।

বৃন্দাবনখণ্ড

পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত। (২২৮ নং পদ)

অর্থাৎ পাত পেতে কেন ভাত দাও না। ব্যঞ্জনার্থ: আশাহত হওয়া।

যমুনান্তর্গত কালীয়দমন খণ্ড

যার কান্ধ বসে দোষর মাথা। (২৫৬ নং পদ)

অর্থাৎ যার কাঁধে দুটি মাথা রয়েছে সেই কেবল রাধার সঙ্গে কথা বলতে পারে।

বাণখণ্ড

মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না লএ পীতরে ॥ (২৯১ নং পদ)

অর্থাৎ মরণ বাণ মারার ফলের কথা বলা হয়েছে।

বংশীখণ্ড

দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ। (৩২৯ নং পদ)

অর্থাৎ ভাগ্যের লিখন খণ্ডানো যায় না।

রাধাবিরহখণ্ড

যে ডালে করো মো ভরে।
সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে ॥ (৩৯২ নং পদ)[২]

অর্থাৎ যে ডালে আশ্রয় লাভ করা যায় সে ডাল ভেঙে পড়ে আশাহত হওয়া।

বৈষ্ণবপদাবলী: বিদ্যাপতি

হরিণী জাগায় ভাল কুটুম্ব বিবাদ।[৩]

রামায়ণ: কৃত্তিবাসী

১. পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।

অর্থাৎ পিপীলিকার পাখা উদ্গমের বিশেষ সময় বা ঋতু আছে। আলো দেখলে পিপীলিকা সেদিকেই ছুটে যায়। সব আলোই দাহিকাশক্তিমুক্ত নয়। প্রদীপের আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই পিপীলিকার মৃত্যু হয়। অথচ পিপীলিকা জানে না এ আগুন তাকে দগ্ধ করবে।

২. দৈবের লিখন কভু না যাবে খণ্ডন।

অর্থাৎ ভাগ্যের লিখন কখনও খণ্ডানো যায় না।

৩. বামন হইয়া হাত বাড়াইলা চাঁদে।[৪]

অর্থাৎ বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো।

মহাভারত: কাশীরাম দাস

১. অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ—এ তিনের রেখো না চিন।

আগুন, অসুখ ও ঋণের চিহ্ন অর্থাৎ শেষ রাখতে নেই।

২. পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।

অর্থাৎ নিজের দোষ না দেখে অপরের নিন্দা করা।

৩. ব্যাঘ্র নাহি জন্ম লয় মৃগীর উদরে।

অর্থাৎ মৃগীর গর্ভে বাঘ জন্ম নেয় না।

৪. স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন।[৫]

অর্থাৎ অভিভাবকবিহীন জীবন যাপন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়: মালাধর বসু

১. নির্ধন পুরুষের ভয় নাহিক সংসারে।

২. কর্ণধার বিনে কভু নৌকা নাহি যায়।

৩. জননী জঠরে দুঃখ না যায় খণ্ডন।[৬]

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ: বিজয়গুপ্ত

১. দৈবের নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।

অর্থাৎ দৈবের নির্বন্ধ কখনও খণ্ডন করা যায় না।

২. বিনে শুদ্ধিতে ঘরে গেলে লোকে না বলে।[৭]

অর্থাৎ, বিনা শুদ্ধাচারে গৃহে প্রবেশ করলে লোকনিন্দার ভয় থাকে।

পদ্মাপুরাণ: নারায়ণ দেব

বালকের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দেখি পাকা বেল ॥[৮]

অর্থাৎ অসম্ভব ব্যাপার।

মনসামঙ্গল: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

১. বিপত্ত্যের কালে কেহ নাহি মিলে সখা।

অর্থাৎ বিপদের কালে কোনও বন্ধু মেলে না।

২. বামন হৈয়া চাহ ধরিতে আকাশ।[৯]

চণ্ডীমঙ্গল: মুকুন্দ চক্রবর্তী

১. জন্ম লভিলে আছে অবশ্য মরণ।

অর্থাৎ জন্মালে মরতে হবে।

২. দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ।

অর্থাৎ, দুধভাতে শত্রু পোষা উচিত নয়। দুধ দিয়ে কেন কালসাপ পোষ?

৩. আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।

অর্থাৎ নিজের সম্মান নিজের কাছে।

৪. দারিদ্র্যে কেহ না সম্ভাষে।

অর্থাৎ দরিদ্র মানুষকে কেউই আদর করে না।

৫. উচিত কহিতে আমি সবাকার অরি।[১০]

অপ্রিয় সত্যভাষী মানুষ সকলের সহযোগিতা হারায় এ কথাটিই প্রবাদে বিধৃত।

অভয়ামঙ্গল: দ্বিজ রামদেব

১. পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাঠারী।

২. জনম লভিলে তবে অবশ্য মরণ।[১১]

চৈতন্যচরিতামৃত: কৃষ্ণদাস কবিরাজ

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধিম।[১২]

শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন. রামেশ্বর

১. বামন হইয়া হাত বাড়ায়্যাছি চাঁদে।
আপনে আশিস করে প্রাণ যদি কান্দে ॥[১৩]

শিবায়ন: রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র

গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে শ্মশান নিবাস।

অর্থাৎ গৃহস্থের শ্মশানে বাস করা সাজে না।

২. পোড়া ঘায়ে পড়ে যেন লবণের ছিটা।

৩. স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হেন কহে বেদে।[১৪]

শ্রীধর্মমঙ্গল: ঘনরাম চক্রবর্তী

১. পুত্র বিনা গৃহে যে পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল ॥

২.	ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।
একযোগে থাকিলে অবশ্য ধরে বল ॥[১৫]

ধর্মমঙ্গল: মানিকরাম গাঙ্গুলী

১.	না পারে খণ্ডিতে লোক যা থাকে কপালে।

২.	জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।[১৬]

ধর্মমঙ্গল: রূপরাম চক্রবর্তী

১.	অসত্য সমান পাপ নাহিক সংসারে।

২.	কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন।[১৭]

গোর্খবিজয়

শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি।[১৮]

অন্নদামঙ্গল: ভারতচন্দ্র

সাহিত্যিক প্রবাদের সর্বোত্তম রূপকার ভারতচন্দ্র রায়। প্রবাদগুলিতে তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

১.	নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

২.	কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।

৩.	বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।[১৯]

পদাবলী: রামপ্রসাদ সেন

১.	মাথা নাই মাথা ব্যথা।

২.	কিল খেয়ে কিল চুরি।

৩.	খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কালসাপ।[২০]

শূন্যপুরাণ: রামাইপণ্ডিত

কে জাব কে জাব ভাই ভবনদীপার।
আড়াঅ বাঘর ভঅ জলত কুম্ভীর।[২১]

সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী কাব্য: দৌলত কাজী

১. কৃপণের ধন যেন মূর্খের যৌবন।

২. পুরুষ ভ্রমরা জাতি সম্ভ্রম না এড়ে।
যেই ফুলে মধু পায় তথা গিয়া পড়ে।

৩. কাণ্ডারী বিহীন নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয়।[২২]

পদ্মাবতী: আলাওল

১. পড়শী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।

২. আগে দুঃখ সহিলে পশ্চাতে সুখ পায়।
বিধি যাহা করে কভু খণ্ডন না যায় ॥

৩. কেবা খণ্ডাইতে পারে যে আছে করমে।[২৩]

লায়লী মজনু কাব্য: দৌলত উজির বাহ্‌রামখান

১. যেই তরু ফলিব অঙ্কুরে ভাল হএ।

২. কাকের মুখে যেন সিন্দুরিয়া আম।

৩. মৃতের উপরে খড়্গা উচিত না হএ।[২৪]

উল্লিখিত কাব্যগুলিতে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিগণ মৌখিক প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭)

দাশরথি রায়ের পাঁচালিতেও বহু প্রবাদ পাওয়া যায়।

ক. মুখে মধু অন্তরে বিষ।

অর্থাৎ ভিতরে এক, বাইরে আর এক।

মুখে মধু অন্তরে বিষ,
তুমি উনিশ, আমি বিষ।

খ. একে মনসা, তাতে ধুনোর গন্ধ।

অর্থাৎ এমনিতে ক্ষিপ্ত তার উপরে ফোড়ন কাটা।

আমার এ কি দশা, *একে মনসা, তাতে ধুনোর গন্ধ*।[২৫]

গোপাল উড়ে (আনুমানিক ১৮১৯-১৮৫৯)

গোপাল উড়ের টপ্পায় বেশ কিছু প্রবাদ পাওয়া যায়। যেমন—

ক. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

অর্থাৎ এক কষ্টের উপর আর এক কষ্ট।

কিংবা, ক অক্ষর গো-মাংস।

অর্থাৎ মূর্খ বা নিরক্ষর।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আর দিও না।
পেটে নাই বিদ্যার অংশ, *ক অক্ষর গো-মাংস*।

খ. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

অর্থাৎ লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই অথচ লাভের জন্য আশা করা।

—গাছে কাঁঠাল গোপেতে (গোঁফে) তেল তাতে কি আর আশা আছে।[২৬]

উল্লিখিত উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হয়েছে। কেবলমাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেই নয়, আধুনিক যুগের সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন লেখকের নাটক, কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নকশা এবং পত্রসাহিত্য থেকে নেওয়া বেশ কিছু নির্বাচিত প্রবাদের উদাহরণ তুলে ধরা হল। প্রথমে প্রবন্ধসাহিত্য, এরপর নাটক, কাব্য, উপন্যাস-গল্প-নকশা সাজিয়ে প্রবাদগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ কবা হল। আধুনিক যুগের লেখকদের কালানুক্রমিকভাবে ভাগ না করে বিষয়ভিত্তিক ভাগ করেছি, কেবলমাত্র মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—এঁদের সব রচনা একত্রে দেওয়া

হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয় আছে বলে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আলোচনা করে পরে উপন্যাস-গল্পের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের পরে দিয়েছি। তাই এইগুলির মধ্যে মধুসূদনের নাটক-প্রহসন ও কাব্য, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ধরনের গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রবন্ধ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প একত্রে এবং সাম্প্রতিক কয়েকটি গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রবাদ, প্রবচন ও বাগ্‌ধারা ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হল:

উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)

দুধে-আলতা রঙ।

অর্থাৎ উজ্জ্বল সুগৌরবর্ণ।

—কুলীনগ্রামে হরিহরবাবুর একটি কন্যা আছে সেটি উপযুক্ত। যেমন নাকমুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন *দুধে আলতায়* গোলা আর কর্ম্মও তেমনি। [কথোপকথন][২৭]

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬১-১৮৩৪)

১. গড্ডলিকা প্রবাহ

অর্থাৎ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া।

—প্রায় লোকেরা *গড্ডলিকা প্রবাহ* ন্যায়ে বা অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ে বা এ সংসারান্ধকূপে পড়ে। [প্রবোধচন্দ্রিকা]

২. বামন হইয়া চাঁদে হাত। [প্রবোধচন্দ্রিকা]

অর্থাৎ ছোট হয়ে বড়কে ধরার সাধ বা ইচ্ছা বা যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করার ইচ্ছা।

—তোর এত বড় কথা *বামন হইয়া* চাঁদে *হাত*। [প্রবোধচন্দ্রিকা][২৮]

টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)

১. এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে।

অর্থাৎ একের জিনিস অপরকে চাপানো।

—কতক সাহেবকে দিতাম, কতক আপনি লইলাম, তারপরে এর *মুণ্ডু ওর ঘাড়ে* দিয়া হরবর করিতাম। [আলালের ঘরের দুলাল]

২. অরণ্যে রোদন করা।

অর্থাৎ নিষ্ফল আবেদন।

—আমাদিগের কেবল *অরণ্যে রোদন করা।* [আলালের ঘরের দুলাল][২৯]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

উভয় সংকট।

অর্থাৎ এমন অবস্থা যাতে দুদিকেই বিপদ।

—এই লোকাবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যদি অমূলক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, অথবা নিরপরাধ জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক বিমোচন করি, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার ন্যায় *উভয় সঙ্কটে* পড়ে নাই। [সীতার বনবাস][৩০]

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মান।

অর্থাৎ হীন বংশে মহতের জন্ম।

—বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো, *কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে* লাগ্‌লে। নবো মুন্সী, ছিরে বেণে, পুঁটে তেলি রাজা হলো। [হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা][৩১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

অর্থাৎ প্রাচীন বা প্রাচীনার অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান।

—শ্লেষ্মার দল বলেন *পুরানো চাল ভাতে বাড়ে,* পিত্তের দল বলেন পুরোনো চাল রোগীর পথ্য! ['সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা' প্রবন্ধ][৩২]

মীর মশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

বিড়াল তপস্বী।

অর্থাৎ অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি সাধুতার ভাণ দেখালেও তা মিথ্যা ভাণ মাত্র।

—সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব! *বিড়াল তপস্বী,* কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলবী জগতে অনেক আছে,—অনেক দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। [বিষাদসিন্ধু][৩৩]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

অহিনকুল সম্বন্ধ।

—অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে চিরশত্রুতার সম্পর্ক।

—সভ্যতার সহিত কবিত্বের খাদ্য-খাদক বা *অহি-নকুল সম্বন্ধ* রহিয়াছে। সভ্যতা কবিতাকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। [নানাকথা][৩৪]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩)

১. ঢাকে কাঠি পড়া।

অর্থাৎ কোনও আচার অনুষ্ঠানের সূচনা করা।

—ইহাই ধর্ম্মের ঢাক, ধর্ম্মের ঢাকে *কাঠি পড়িলে* কুৎসা নিন্দা দেশময় ছড়াইয়া পড়িত, একটা পরগণার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস করিতে পারিত না। ['ধর্ম্মঘট প্রবন্ধ']

২. হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।

অর্থাৎ গোপন কথা সর্বসমক্ষে ফাঁস করা।

—ফাট্‌ল হাটে হাঁড়ি,
ছড়াল কুচ্ছার ভুড়ি ও নাড়ী,
দূর দূর ছোঁড়া ও ছুঁড়ী ॥" ['হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা প্রবন্ধ'][৩৫]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অতির গতি' প্রবন্ধে 'অতি লোভ, দর্প, দান, মান এবং 'অতি' শব্দ প্রয়োগে অতি বক্তাদের প্রসঙ্গে এবং অতির বিপক্ষে কয়েকটি প্রবাদ-বচন-প্রবচনের উল্লেখ করেছেন:

১. অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

অর্থাৎ অহংকার পতনের মূল, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

২. অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

অর্থাৎ বেশি লোভ করলে তার সব কিছু নষ্ট হয়।

৩ অতি বাড় বেড় না ঝড়ে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ অহংকার করলে তার পতন হয়।

৪. অতি বড় রূপসী না পায় বর
অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।

অর্থাৎ অতি সুন্দরী যেমন বর পায়, তেমনি অতি ঘরণীও উপযুক্ত ঘর পায় না।

৫. কথার ঢেঁকি—কাজে ছাই।

অর্থাৎ কাজের চেয়ে কথা বেশি বলা।

৬. অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

অর্থাৎ যারা অতিরিক্ত ভক্তি দেখায় তারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তিহীনা।

৭. অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক কোনও কিছু করতে গেলে বিশৃঙ্খলা ঘটে।[৩৩]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)

১. হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা।

অর্থাৎ বাংলা রূপকথায় বর্ণিত রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড দেবার পন্থা।

—রাজ্যের কতকগুলি জল্লাদ হৈ হৈ করিয়া গিয়া ঘেসেড়ার বাড়ী, সূপকারের বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া রাণীর পোড়ার মুখী দুই বোনকে *হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা* দিয়া পুতিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিল। (ঠাকুরমার ঝুলি, [কিরণমালা])

২. হবু চন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

অর্থাৎ স্থূল বুদ্ধি রাজা ও নির্বোধ মন্ত্রী।

—হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী। (নামকরণই প্রবাদ) [হবুচন্দ্ররাজা গবুচন্দ্রমন্ত্রী, দাদামশায়ের থলে][৩]

বামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)

উত্তম মধ্যম দেওয়া।

অর্থাৎ গুরুতরভাবে প্রহার করা।

—শুভাচার্য্য।...এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে, *উত্তম-মধ্যম* হইবার ও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। [কুলীনকুলসর্বস্ব][৮]

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

নাটক ও প্রহসন

১. কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করা।

অর্থাৎ চরম অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া।

—"তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ত হতভাগাকে রেখেচিস্। আমি হলে এতদিনে *কুলোর বাতাস দিয়ে* বিদায় *কত্তেম*।" [একেই কি বলে সভ্যতা]

২. গতস্য শোচনা নাস্তি।

অর্থাৎ যা অতীত হয়েছে তার চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

ভক্তপ্রসাদ। আরে, যা হয়েছে বয়ে গিয়েছে, সে কথা আর কেন?

বাচস্পতি। সেতো গিয়েইছে,—*গতস্য শোচনা নাস্তি*—সে তো এমনেও নেই, অমনেও নেই। [বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ]

৩. পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।

অর্থাৎ পরের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়া।

বিদূষক। "...*পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে* খাওয়া বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পুরেন কেন?" [শর্মিষ্ঠা]

৪. বিষকুম্ভ, পয়োমুখম্।
বাংলায়: উদরে বিষ, মুখে মধু।

অর্থাৎ মুখে মিষ্ট কথা বলে কিন্তু অন্তরে অনিষ্টকারী।

নারদ। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, এঁকি? এর যে *উদরে বিষ, মুখে মধু*। [পদ্মাবতী]

৫. কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর তাড়াতে পারলেই হলো।

অর্থাৎ অযোগ্যের দ্বারা কার্য সিদ্ধি হলেই ভাল।

মদনিকা।...এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখিনা, তাতে কিভাব দাঁড়ায়। হাঃ হাঃ হাঃ! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হ'ল বয়ে গেল কি? *কাঠের বিড়াল হোক্ না কে, ইঁদুর ধরতে পারলেই হয়*। [কৃষ্ণকুমারী][৩৯]

সুকুমার রায় (১৮২৭-১৯২৩)

ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়

অর্থাৎ কোনও জিনিস গোপন করার প্রয়াস।

—মতলব যদি ভালোই হবে, তবে এত *ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়* কেন? [চলচ্চিত্ত-চঞ্চরি, ব্যঙ্গনাটক][৪০]

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

১. কীটস্য কীট।

অর্থাৎ অতি নগণ্য ব্যক্তি।

সাধুচরণ। আমি কোন্ *কীটস্য কীট* যে. সাহেবকে কয়েদ করবো? [নীলদর্পণ]

২. ঠক বাঁচতে গাঁ উজাড়।

অর্থাৎ জগতে সাধু ব্যক্তি অতি বিরল।

—সকল দেবতাই সমান, *ঠক বাঁচতে গাঁ উজার*। [নীলদর্পণ]

৩. নিজের চরকায় তেল দেওয়া।

অর্থাৎ অনধিকার চর্চায় কালক্ষেপ না করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা।

—তোমার নিজের *চরকায় তেল দেহ*। [নীলদর্পণ]

৪. জোর যার মুল্লুক তার।

অর্থাৎ যার শক্তি আছে, সে বলপ্রয়োগে যা ইচ্ছা অধিকার করতে পারে।

এখন *জোর যাব মুল্লুক তার,* টানাটানি করে নিতে পারে। [জামাই বারিক]

৫. অকাল কুষ্মাণ্ড।

অর্থাৎ অপদার্থ বা অযোগ্য।

—বাবা তুমি বোকারাম *অকাল কুষ্মাণ্ড,* [সধবার একাদশী]

৬. আকাশকুসুম

অর্থাৎ কাল্পনিক ও অসম্ভব বস্তু।

—সে আমার *আকাশ-কুসুম* বোধ হয়। [লীলাবতী]

৭. অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।

অর্থাৎ কোনও ঘৃণাজনক পদার্থের বর্ণনাস্থলে এরূপ বলা হয়।

—মহারাজ, দক্ষিণদেশের মেয়েরা গাত্রে সর্বত্র হরিদ্রা লেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায় যে *অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে পড়ে*। [নবীন তপস্বিনী][৪১]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

কান খাড়া করা।

অর্থাৎ কোনও শব্দ শুনিবার জন্য একাগ্রভাবে অপেক্ষা করা।

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে!

বিদূষক। তাতে *কান খাড়া* রেখেছি! শ্রীমধুসূদন নগর দ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মরত। [জনা][৪২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

বারো মাসে তের পার্বণ।

অর্থাৎ অনবরত উৎসব।

—তেনার বাড়ীতে *বারমাসে তের পার্বণ* হয়। [অলীকবাবু][৪৩]

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

১. ধান ভানতে শিবের গীত।

অর্থাৎ কোনও বিশেষ কথাবার্তার মধ্যে অন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা।

—খাসা ভাই, *ধান ভানতে শিবের গীত*। [নবযৌবন]

২. চোরকে বলে চুরি করতে গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

অর্থাৎ দুমুখো নীতি অবলম্বন করা বা দুই দিক বজায় রাখা।

—*চোরকে চুরি করতে বলে গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে*। [খাস দখল]

৩. ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

অর্থাৎ উভয় দিক নষ্ট হওয়া।

—*ধরি মাছ না ছুঁই পানি,* তবেই বুদ্ধি বলে জানি। (কালাপানি)[৪৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

১. এই মারে তো এই মারে।

অর্থাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে প্রতিপক্ষকে প্রহার পর্যন্ত করতে উদ্যত।

—পরিচারিকা। তোমার বাপ না ভাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপুটি ঝগড়া। এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি। কুরুক্ষেত্তর! *এই মারে তো এই মারে!* [প্রতাপসিংহ]

২. কার ঘাড়ে দুটো মাথা।

অর্থাৎ গুরু অপরাধ করার দুঃসাহস কারো হয় না।

ভিক্ষুক। *কার ঘাড়ের উপরে দুটো মাথা আছে বাবা,* যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে? [চন্দ্রগুপ্ত][৪৫]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭)

কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা।

অর্থাৎ কোনও বৃহৎ কাজে সামান্য ব্যক্তিরও সাধ্যমত সাহায্য দান।

উৎপল। কি রে মাকুড়ী? কি করবি? ঘরে ফিরে যাবি?

মকরী। তাছাড়া আর উপায় কি! *কাঠবিড়ালী যতটুকু সাগর বাঁধতে পারে, তা বেঁধেছে*—আমাদের করবার কাজ হয়ে গেছে। [কিন্নরী][৪৬]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

১. যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥ [নীলকর (গীত)]

অর্থাৎ এক কষ্টের উপর আর এক কষ্ট বা দ্বিগুণ কষ্ট পাওয়া।

২. ফেরে হাটে ঘাটে বাটে মাঠে, [দুর্ভিক্ষ]

অর্থাৎ যত্রতত্র।

৩.	ঘরের ঢেঁকি, কুমির হয়ে,
ঘটায় কত অঘটন। [দুর্ভিক্ষ]

অর্থাৎ ঘরের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসও বিপদ ঘটায়।

৪.	মিছিমিছি খেঁটে গেল ভূতের বেগার। [দেহঘর]

অর্থাৎ অহেতুক পরিশ্রম করা।

৫.	হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে। [আত্মবিলাপ][৪৭]

অর্থাৎ গোপন কথা প্রকাশ্যে বলা।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

১.	যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

অর্থাৎ যে রক্ষাকর্তা তারই দ্বারা অনিষ্ট সাধন।

কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি;—"পালিতে কি এ বিপুল জগৎ
সুজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে *যে রক্ষক সে'জন?*
হইবে ভক্ষক [তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য]

২.	তৃণ জ্ঞান করা।

অর্থাৎ তৃণের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করা।

—"ত্রিশূলীর বরে—বলী রক্ষঃ, *তৃণজ্ঞান করে দেব"*-গণে। [মেঘনাদবধ কাব্য]

৩.	মণিহারা ফণি।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে শোকে আত্মহারা।

"কোথা মোর গুণমণি? মণিহারা আমি গো ফণিনী।" [ব্রজাঙ্গনা কাব্য][৪৮]

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৮)

ঝাল ঝাড়া।

অর্থাৎ রূঢ় বচন প্রয়োগে মনের সঞ্চিত উষ্মার উপশম করা।

"বাহিরে ইঁহারা সহিয়ে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে পিষিত হন,
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি *ঝাল ঝাড়িয়ে* লন।" [বঙ্গসুন্দরী][৪৯]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

হাল ছেড়ে দেওয়া।

অর্থাৎ ঝড় তুফানের সময় হাল ছেড়ে দিলে বিপদ অনিবার্য।

ছুটেছে ফোয়ারা হর্ষে মাতোয়ারা
শূন্যে চড়ি উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা
না পেয়ে লাগাল *ছেড়ে দিয়ে হাল*
মনোদুঃখে অধোমুখে কাঁদি হয় মারা [স্বপ্নপ্রয়াণ][৫০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প ও পত্রসাহিত্য থেকে কয়েকটি প্রবাদের উদাহরণ তুলে ধরা হল।

১. দিনে (দুপুরে) ডাকাতি।

অর্থাৎ দুঃসাহসিক চুরি বা জুয়াচুরি।

"স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ কথা কেমন ক'রে করিব স্বীকার!
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্মপ্রাণ জাতি।"
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—*দুপুরে ডাকাতি*।"
[সোনার তরী, হিং টিং ছট]

২. পিত্ত জ্বলে যাওয়া।

অর্থাৎ সহসা ক্রোধান্বিত হওয়া।

মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা",
দরজার পাশে দাঁড়ায়ে সে হাসে, দেখে *জ্বলে যায় পিত্ত*।
[চিত্রা (পুরাতন ভৃত্য)]

৩. কোমর বাঁধা

অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প, উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহ উদ্যোগ করা।

"ওঠ, ওঠ, ভাই জাগো,
মনে মনে খুব রাগো।
আর্যাশাস্ত্র উদ্ধার করে,
কোমর বাঁধিয়া লাগো।" [মানসী, ধর্মপ্রচার]

৪. সবুরে মেওয়া ফলে।

অর্থাৎ ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায়।

"কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।" [চিঠি, সংযোজন, কড়িকোমল]

৫. তেত্রিশ কোটি দেবতা

অর্থাৎ হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি।

"এক বই পিতা নাই, তাঁরি নাম ভুলি,—
দেবতা তেত্রিশকোটি, গড় করি সবে।" [রাজা ও রাণী]

৬. মান্ধাতার আমল

অর্থাৎ অতি প্রাচীন কাল।

সর্দ্দার। কোন বুড়ো রে?

চন্দ্রহাস। সেই যে *মান্ধাতার আমলের* বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না। [ফাল্গুনী]

৭. দু'চোখে দেখতে না পারা।

অর্থাৎ আদৌ পছন্দ না করা।

তিনকড়ি।...যে অবধি তোমাকে দেখেছি সেই অবধি আপন বাপ দাদা খুড়ো কাউকে *দু'চক্ষে দেখতে পারিনে*। এত ভালবাসা। [বৈকুণ্ঠের খাতা]

৮. মধুরেণ সমাপয়েৎ।

অর্থাৎ সকল ব্যাপারের মনোরম পরিসমাপ্তি বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসচি রসিক বাবু?
রসিক। *'মধুরেণ সমাপয়েৎ!'* [চিরকুমার সভা]

৯. অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

অর্থাৎ অহংকার পতনের মূল। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

পথিকের সংলাপ। *অতিদর্পে হত লঙ্কা*।[প্রকৃতির প্রতিশোধ: দ্বিতীয় দৃশ্য]

১০. পেটে খেলে পিঠে সয়।

অর্থাৎ একদিক দিয়ে লাভ হলে অন্যদিকে ক্ষতি সহ্য হয়।

বনমালীর উক্তি: *পেটে খেলে পিঠে স*য়। [হাস্যকৌতুক. পেটে ও পিঠে]

১১. রামরাজত্ব

অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক রাজার সুশাসনে সুখসমৃদ্ধিশালী রাজ্য।

—"আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে *রামরাজত্ব* হইবে।

১২. কনে দেখা মেঘ।

অর্থাৎ গোধূলি লগ্নের সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল পাত্রী দেখার উপযুক্ত সময়।

"...তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে *কনে দেখা মেঘ*। গঙ্গার জল লাল আভায় টলমল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা

আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে।" [চার অধ্যায়]

১৩. বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো।

অর্থাৎ অস্থানে মূল্যবান জিনিসকে ফেলে দেওয়া, যার সুফল নেই।

—আশালতার উক্তি: *বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো*। [চোখের বালি]

১৪. সাতপাকের বিয়ে একুশ পাকেও খোলে না।

অর্থাৎ হিন্দু বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য, কোনও অবস্থাতেই যা ছিন্ন হয় না।

—'সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

...শ্যামা বলে উঠল, "...তা পছন্দ না হলেই বা কি, *সাতপাক* যখন ঘুরেছে তখন একুশ পাক উল্টো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না। [যোগাযোগ]

১৫. মরার বাড়া গাল নাই।

অর্থাৎ চরম দুর্দশা বা অধঃপতনের পর আর অধিক অমঙ্গল হতে পারে না।

—*মরার বাড়া গাল নাই*। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার বিচার কিছুই থাকবে না। [গোরা]

১৬. সোনার চাঁদ।

অর্থাৎ রূপে গুণে পরম সুন্দর পুরুষ বা নারী।

—সেই *সোনার চাঁদ* ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। [শেষের কবিতা]

১৭. পেটে খিদে মুখে লাজ।

অর্থাৎ মনে মনে ইচ্ছা আছে, তথাপি বাইরে অনিচ্ছা প্রকাশ।

—"তার চেয়ে বল না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে! এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? *পেটে খিদে মুখে লাজ*।" [নষ্টনীড়]

১৮. একটা আষাঢ়ে গল্প।

অর্থাৎ গল্পের শিরোনামটাই প্রবাদ [একটা আষাঢ়ে গল্প]

১৯. তুর্কি নাচন নাচা।

অর্থাৎ অস্থিরভাবে দেহ বা অঙ্গচালনা কিংবা আরবী ঘোড়ার মতো চঞ্চল নৃত্যশীল ভঙ্গি ও গতি।

—খানিকবাদে একটা আকাশের গর্জন শোনা গেল...তারপর বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝড়-বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা *তুর্কি-নাচন নাচতে* আরম্ভ করে দিল। [ছিন্নপত্র]

২০. কাকে নিয়ে গেল কান, তো কাকের পিছে ধাবমান।

অর্থাৎ অপরের কথা অসম্ভব হলেও নির্বিচারে বিশ্বাস করা।

—ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে, *কাকে তাঁদের কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে,* তা'হোলে কানে হাত না দিয়ে তাঁরা *কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন।* [য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র]

২১. কানে মন্ত্র দেওয়া।

অর্থাৎ গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া।

—নয়নতারা তাঁহার স্বামীর *কানে মন্ত্র দিতে* লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না...এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। [গল্পগুচ্ছ: প্রতিহিংসা][৩১]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

১. চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।

অর্থাৎ পরের উপর আক্রোশ মিটাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজে ক্লেশ স্বীকার করা।

—আর, তুই নিজে কি এম্‌নি সন্ন্যাসিনীই রইবি, হায় রে শ্বেতবসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল! *চোরের সঙ্গে ঝগড়া করে ভুঁইএ ভাত খাবি* নাকি? [বাঁধন-হারা]

২. রক্ত হিম হওয়া।

অর্থাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া।

—আমার যেটুকু কৃতকার্যের জন্য আমি দায়ী অন্তত সেটুকু শুনলেই তোমার *রক্ত হিম হয়ে যাবে*। [কুহেলিকা][৫২]

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রবাদ তার নিজস্ব অর্থে কবিতার চরণের অনুষঙ্গী হয়েছে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

অর্থাৎ ধর্ম সর্বত্রগামী।

বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে ন'ড়ে চলে ধীরে
সূর্যসাগর তীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কতো কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'লো রক্তে উপেক্ষায়
বুকের সন্তান তবু নবীন সঙ্কল্পে আজো আসে।।
[মনোসরণি, সাততি তারার তিমির][৫৩]

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)

১. পেটে নয় (খেলে) পিঠে খায় (সয়)।

অর্থাৎ উপযুক্ত ফল যদি পাওয়া যায়, সেটা জানা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়।

আধখানা পিঠাই খেতে যেন মিঠাই।
আস্ত যে খেতে চায় *পেটে নয় পিঠে খায়*।
[দুই বেড়াল ও এক বাঁদর]

২. কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।

অর্থাৎ কারও ভালো, কারও মন্দ।

বাঁকুড়াতে *পৌষমাস*
গড়বেতায় *সর্বনাশ*। ['জনরব', দ্বিতীয় দৃশ্য][৫৪]

জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬)

১. শাঁখের করাত।

অর্থাৎ উভয় সংকট। যেতে কাটে আসতে কাটে।

চারিদিক হতে উঠিতেছে সুর, ধিক্কার! ধিক্কার!
শাঁখের করাত কাটিতেছে তারে লয়ে কলঙ্ক ধার!
[নক্সী কাঁথার মাঠ।]

২. সাত ঘাটের জল এক করা।

অর্থাৎ প্রবল শক্তির কথা।—

সাত ঘাটে জল এক করে সে ভরতে পারে ঘড়া।
[সোজন বাদিয়ার ঘাট]

৩. ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

অর্থাৎ শক্তিমানের উপরেও শক্তি আছে।

ফাঁদ রাগিয়া বলিল—"তুই *ঘুঘু দেখিয়াছিস* কিন্তু *ফাঁদ দেখিস নাই*।" ['ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি' গল্প]"

বিষ্ণু দে (১৯০৮-১৯৭৯)

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

অর্থাৎ নিজে বাঁচলেই হল বা স্বার্থমগ্ন নিজের প্রাণকেই ভালবাসে।

চাচার আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র। ['১৯৩৭ স্পেন', পূর্বলেখ]"

বিনয় ঘোষ (কালপেঁচা) (১৯১৭-১৯৮০)

হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া।

অর্থাৎ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা।

—কলকাতা শহরে মেছুনীর প্রতাপ দিন দিন যে কিভাবে বেড়ে চলেছে

তা শহরের বাঙালী বাবুরা নিশ্চয়ই *হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন*। [কালপেঁচার নক্‌শা, 'কলকাতার মেছুনী'][৫৭]

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮)

নেড়া একবারই বেলতলায় যায়।

অর্থাৎ জীবনের অভিজ্ঞতা মানুষকে সতর্ক করে।

—*নেড়া শুনি বেলগাছতলায় একবার মাত্র যায়*। ['চতুরঙ্গ কবিতা'][৫৮]

সলিল চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৫)

ভিটেয় ঘুঘু চরানো।

অর্থাৎ সর্বনাশ করা।

—আমার *ভিটেয় চরলো ঘুঘু* ডিম দিল তোমাকে। ['নাকের বদলে নরুন পেলাম' কবিতা][৫৯]

এর মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়—সম্পূর্ণ বাক্যটি অবলম্বনে। একই বস্তু একজনের ক্ষতি করলেও অন্যজনের উপকার করছে।

গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০)

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

অর্থাৎ নিজের খেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা।

—এই, প্রিসিডেন্ট সেক্রেটারীরা যেসব ঝক্কির বোঝা কাঁধে ফেলে ধেই ধেই নৃত্য করছে তা বুঝি সেই *ঘরের খেয়ে বাগানের মোষ তাড়ানো?* ['কলকাতার সার্বজনীন', রঙ্গব্যঙ্গ গল্প][৬০]

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

ভুঁইফোঁড়।

অর্থাৎ হঠাৎ জেগে ওঠা।

"সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত *ভুঁইফোঁড়*। ['মধ্যবিত্ত '৪২' কবিতা][৬১]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৮—)

১. যত গর্জে, তত বর্ষে না।

অর্থাৎ মিথ্যা আস্ফালন।

যত গর্জে, তত বর্ষে না।
দুমদাম বোমা ফাটিয়ে
বৃষ্টি এখন পালাচ্ছে। ['জল তবুও' কবিতা]

২. মতিভ্রম।

অর্থাৎ ভুলপথে যাওয়া।

সবই স্বপ্নমায়া *মতিভ্রম* নাকি? [এসো বর্ষা, আলগোছে পা ফেলে][৬২]

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

সাপের পাঁচ পা দেখা।

অর্থাৎ দর্পে বা অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।

—"বর্তমানে এদেশের স্ত্রী-পুরুষ *সাপের* পাঁচ হঠাৎ দেখেছে যেমন।" [জনৈক সহিসের ছেলে বলছে][৬৩]

মতি নন্দী (১৯৩১—)

১. মড়া কখনও ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায়?

অর্থাৎ অবাস্তব চিন্তা বা কল্পনা।

—তোরও খেয়াল নেই, কী বললি। *মড়া কখনও ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়?* ['বিজলীবালার মুক্তি' গল্প]

২. শকুনের চোখ থাকে ভাগাড়ের দিকে।

অর্থাৎ যার যে দিকে লোভ বা আগ্রহ সে সেদিকেই ছোটে।

—চোখ বড় করে অনি বলে, '*শকুনের চোখ থাকে ভাগাড়ের দিকে* ['বুড়ো লোকটি' গল্প][৬৪]

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২—)

১. খোল নলচে পাল্‌টে।

অর্থাৎ পুরনো জিনিস পালটিয়ে নতুন করা।

> —যাবে *খোল-নলিচা পালটে*, বিচার করবে নিচু জনে'
> কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
> মিত্র বাবুমশায়। [বাবুমশাই]

২. জাঁতায় পিষে মারা।

অর্থাৎ কষ্ট দেওয়া।

জিতব? না কি নিদেনকালের *জাঁতায় পিষে* মরব এবার? [অন্ধবিলাপ][৮৮]

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫)

১. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

অর্থাৎ যে অর্ধমৃত তার উপর অত্যাচার করা।

—তোমাকে বিষাক্ত করি—এমনকি *ঘা দিই খাঁড়ার*
মড়ার ওপরে, কেন ভালবেসেছিলাম একদা? [চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৯৩ নং]

২. পিঠে কুলো বাঁধা।

অর্থাৎ সব রকমের সহ্য ক্ষমতা।

—সবাই বলতো *পিঠে একটা কুলো বেঁধে* নাও। [হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, 'এবার আসি'][৮৯]

জয় গোস্বামী (১৯৫৪—)

জিলিপির প্যাঁচ।

অর্থাৎ জটিল মানসিকতার লোক।

—সবই তো ধুলার খেলা, সমস্তই *জিলিপির* প্যাঁচ। [আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো: প্রলাপ লিখন][৯০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

১. আষাঢ়ে গল্প

অর্থাৎ অলীক ও অবিশ্বাস কাহিনি।

—ফুলমণি তখন এক *আষাঢ়ে গল্প* ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ছিল। ক্ষণ পরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তাহার পর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিত হইয়া দাঁত কপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। [দেবী চৌধুরাণী]

২. আসন-পিঁড়ি হইয়া বসা।

অর্থাৎ বাবু হয়ে বসা।

—নিমি তখন *আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া* মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। [আনন্দমঠ]

৩. আসন টলা

অর্থাৎ কৃপা বা সাহায্যপ্রার্থীর জন্য চিত্ত চঞ্চল হওয়া।

—কমলমণি সূর্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহার শেষ এই, "একবার এসো!
কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই, একবার এসো।" কমলমণির *আসন টলিল*। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। [বিষবৃক্ষ]

৪. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খড়ের প্রাণ যায়।

অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তির স্বার্থের দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

গোবিন্দলালকে লেখা ব্রহ্মানন্দের পত্রে:
"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খড়ের প্রাণ যায়।" [কৃষ্ণকান্তের উইল]

৫. মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে।

অর্থাৎ শত্রুর মৃত্যুতে কপট শোক।

—সূর্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। একথা শুনিয়া এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন, আর বলিবেন, '*মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে*।' [বিষবৃক্ষ]

৬. বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।

অর্থাৎ তরুণীর সংসর্গ বৃদ্ধ পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর।

চঞ্চলকুমারী। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা!

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "*বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্*।" [রাজসিংহ]

৭. যার কর্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।

অর্থাৎ যে কাজে যে অভ্যস্ত তারই সে কাজ করা শোভন ও সহজ হয়, অপরের পক্ষে তা ক্লেশকর।

শ্যাম। এদিকে নাকি নবাবী ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে, মৃন্ময় আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ? *যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।* [সীতারাম]

৮. ছেঁদো কথা।

অর্থাৎ কৌশলপূর্ণ সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী।

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইব?

রাজচন্দ্র। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই?

আমি। *ছেঁদো কথা* ছাড়িয়ে দেও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?

৯. ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি?

অর্থাৎ অর্থের জোগান দিতে পারলে অনুচরের অভাব হয় না।

উপেনবাবুর উদ্দেশে ইন্দিরার উক্তি: *ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব* হয় না। [ইন্দিরা]

১০. অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (মারা)

অর্থাৎ ফলাফল কি হবে না বুঝে আন্দাজে কিছু বলা বা কোনও কাজ করা।

—এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়ারি কাজটুকু করিয়াছিল।... অবশ্য, স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল *অন্ধকারে ঢিল মারা*৷ তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এই রূপ *অন্ধকারে ঢিল মারা*৷ [কৃষ্ণচরিত্র]

১১. আড়ামোড়া ভাঙা।

অর্থাৎ আলস্য ভাঙা।

—কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার *আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া* হাই তুলিল। [কমলাকান্তের দপ্তর, পলিটিক্স]

১২. পোয়াবারো।

অর্থাৎ আশাতিরিক্ত সৌভাগ্য।

এদিকে ঈশানবাবুও...পেন্সন লইয়া...সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন; মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার *পোয়া-বারো* পড়িয়া গেল।

পোয়া-বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। [মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত][৮]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)

জল স্পর্শ বা জল গ্রহণ না করা।

অর্থাৎ সামান্য কিছুও আহার (জল পর্যন্ত নয়) না করা।

—বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে *জলগ্রহণ করিব ?*" [পালামৌ][৯]

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করা।

অর্থাৎ নির্দয়ভাবে প্রহার করা।

—"আচ্ছা, সাজ্ তোর এক কলিকা তামাক, যদি ভাল হয় তবে কিছু বলবো না, মন্দ হলে তোর *হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় করবো!*" [স্বর্ণলতা][১০]

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

সশরীরে স্বর্গলাভ।

অর্থাৎ আশাতীত সুখ বা সৌভাগ্য লাভ।

—"ইহার বাড়া কি সম্মান আর আমাদের আছে? আমরা পথের কাঙালী, আপনাদের কুটুম্বিতাও আমাদের *সশরীরে স্বর্গলাভ!* [সমাজ][১১]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)

ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।

অর্থাৎ যারা বর্বর তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মানুষের মতো দেখে না।

—"*ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ*"—যে-জাতির ইষ্টমন্ত্র, সে কি কখনও অজ্ঞান হয়। ['মান' নক্সা][১২]

রাজশেখর বসু [পরশুরাম] (১৮৬০-১৯৬০)

কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে।

অর্থাৎ নীচ ব্যক্তিকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে শেষে অসম্মান করে।

—*লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,*—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিংএ বাসা বাঁধিয়াছে। [কজ্জলী][১৩]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

আঁকু পাঁকু করা

অর্থাৎ উদ্‌বেগের আতিশয্যে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা বা ছটফটানি।

—মা, নিজের দোষে কষ্ট পাও কেন? বউরা রয়েছে, সবাই রয়েছে, কেউ ছেলে মানুষ নয়, ওরা করছে কর্ম্মাচ্ছে, কেন তুমি এত *আঁকু পাঁকু কর* বল দিখিনি? [রমাসুন্দরী][৭৪]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

১. কা-কস্য পরিবেদনা।

অর্থাৎ কারও প্রতি কারও সমবেদনা নেই।

—হর্ রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোর হয়ে গেল, কিন্তু *কা-কস্য পরিবেদনা!* কর্তারা আছেন শুধু রেল গাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান্ করে নিয়ে যেতে। [শ্রীকান্ত]

২. কামিনী-কাঞ্চন।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের প্রধান উপকরণ নারী ও ধনৈশ্বর্য।

—সংসারে *কামিনী-কাঞ্চনই* যে সকল অনর্থের মূল, বৈরাগ্যই যে পরম বস্তু, এই সত্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই তাহার সম্প্রতি সাধনার বস্তু। [চরিত্রহীন]

৩. তালপাতার সেপাই।

অর্থাৎ কৃশকায় ক্ষীণজীবী মানুষ।

—মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরাটি বোধ হয় দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। *তালপাতার সেপাই*। [দত্তা]

৪. বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই।

অর্থাৎ বৃহৎ কাষ্ঠে শুচি-অশুচি বিচার করবার প্রয়োজন নেই।

—বন্দনা...বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। *বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই;* আপনার জাত যাবে না। [বিপ্রদাস]

৫. ইটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়।

অর্থাৎ অপরের সঙ্গে অসদ্‌ব্যবহার করলে তার কাছেও অনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা করা উচিত।

ভবানী...ধীরভাবে বলিলেন,—"আমি কার সর্বনাশ করেছি মা?" বধূ কহিল—"যাদের করেছ তারাই গাল দিচ্ছে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমি বা করব কি। *ইট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়*—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা।" [বৈকুণ্ঠের উইল]

৬. আড়ালে রাজার মাকেও ডাইন বলে।

অর্থাৎ ভয়ে বা শ্রদ্ধায় কোনও ব্যক্তিকে সাক্ষাতে নিন্দা না করলেও অসাক্ষাতে তা নির্ভয়ে করতে হয়।

—গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বল্‌বেই। তুমি বল্‌বে *আড়ালে রাজার মাকেও ডাইন বলে;* কিন্তু ভগবান আছেন। নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনিও রেহাই দেবেন না। [পল্লীসমাজ]

৭. কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

অর্থাৎ এমন সঙ্গতিহীন যে কিছু আদায় হবার সম্ভাবনা নেই।

—ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণ পিসিমা বললেন আর *কাটলেও রক্ত নেই কুটলেও মাংস নেই*। আমি দুঃখী মানুষ আর টাকা কড়ি কিছুই দিতে পারব না। [শুভদা]"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)

অগস্ত্য যাত্রা

অর্থাৎ চিরকালের জন্য বিদায়।

রাজবালা বলিল—কবে ফিরবে?

বীরেন......বলিল—এই আমার *অগস্ত্য-যাত্রা,* তোমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। [দুই তার]"

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)

অবুঝকে বুঝাবে কতো, বোধ নাহি মানে।

অর্থাৎ যে উপদেশ গ্রাহ্য করে না তাকে উপদেশ দিতে যাওয়া বৃথা।

—বন্ধু বুঝিলেন, পাতিব্রত্য-সাগরে ডুবিয়া এ ছেলেটির পরলোক ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে,—ইহার উদ্ধারের আর পন্থা নাই। *'অবুঝকে বুঝাব কত'*—এই সুনীতির অনুসরণে সেই হিতকামী নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন। [মা]"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭১)

১. অধিকন্তু ন দোষায়।

অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হলে কোনও দোষ বা ক্ষতি হয় না।

—দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তারেরা বলেন বটে, আর হজমের গোলমাল হবে না, আমি কিন্তু মশায়, *অধিকন্তু ন দোষায়* ভেবে আফিং খানিকটা ক'রে আরম্ভ করেছি। [কালিন্দী]

২. অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়্‌চড়্ করে।

অর্থাৎ অনভ্যস্ত অবস্থায় পড়লে লোকের ক্লেশ হয়।

—পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। '*অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্ করে*', পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। ......শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। [রসকলি]

৩. কথার মত কথা

অর্থাৎ সারবান, মুল্যবান কথা।

—*একটা কথার মত কথা* বলেছে বটে। [হাঁসুলী বাঁকের উপকথা]

৪. মাছের মায়ের পুত্রশোক।

অর্থাৎ যার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক নেই তার জন্য কপট শোক।

—কাদু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। চোখ তাহার ছল ছল করিতেছিল। কমল তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, ওমা এ যেন নতুন কাণ্ড। বৌএর শোকে ননদ কাঁদে, *মাছের মায়ের কান্না*। [না]

৫. কারে পড়লে বাঘা ফড়িংও খায়

অর্থাৎ বিপত্তিকালে ভাল-মন্দ বিচার থাকে না।

—অন্ধকার একটু ঘন হইতেই মাঠে আসিয়া একটা আকের ক্ষেতে ঢুকিয়া বসিযা বসিয়া আক চিবাইতে আরম্ভ করিল। মিষ্টরস তাহার ভাল লাগে না—খানিকটা মদ হইত! মনে করিয়াই সে হাসিল—*'কারে পড়িলে বাঘা ফড়িংও খায়'*, [বেদেনি][৮]

গিরিবালা দেবী (রায়) (১৮৯১-১৯৮৩)

১. ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে।

অর্থাৎ যার যা কাজ সে তাই-ই করে।

—অবুঝকে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে, *ঢেঁকিকে বুঝাব·কত, নিত্য ধান ভানে*। [রায়বাড়ী]

২. মনে বিষ, মুখে মধু

অর্থাৎ মুখে মিষ্টি কথা বললেও অন্তরটা বিষে ভরা।

—*মনে বিস, মুখে মধু*, কত রঙ্গ-জান জাদু। [রায়বাড়ী][৯]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

১. আকাশ থেকে পড়া।

অর্থাৎ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, এখনই রওনা হওয়া দরকার। ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো একেবারে *আকাশ হইতে পড়িল*,.........। [আরণ্যক]

২. আকাশ পাতাল।

অর্থাৎ অসংলগ্ন চিন্তা।

—বিস্ময় বিমূঢ়, চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা *আকাশ-পাতাল* হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটি বুঝিলেন। ।........। [পথের পাঁচালী]

৩. কুটো নাড়া (ভেঙ্গে দুখান করা)

অর্থাৎ অলস ও কর্মবিমুখ ব্যক্তি।

—অতবড় মেয়ে সংসারের *কুটোগাছটা ভেঙে দুখান* করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন। [পথের পাঁচালী][১০]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)

আম্‌তা আম্‌তা করা।

অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধা সংকোচ বোধ করা।

—কমলা দেবী সুজনকে বললেন, 'সুজন কাল সকালে জিরিয়ে একটু আসতে পারবে?' একটু *আম্‌তা আম্‌তা করে* সুজন উত্তর দিলে, 'কাল সকালে একটু কাজ ছিল।' [অন্তঃশীলা][১১]

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯-১৯৭১)

সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্যা।

—অনেক পড়াশুনা করেও অজ্ঞতা।

—তুমি দেখছি মহামূর্খ! তুমি *সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে* এখনও বুঝতে পারলে না *সীতা কার ভার্যা* ? ['মানিকের ফ্যাসাদ' গল্প][১২]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৭)

আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

অর্থাৎ মূল বস্তু অপেক্ষা তা থেকে উৎপন্ন বস্তু অধিক প্রিয়।

".........দাদার বাইয়ের কথা বলছিলাম—নাতিকে একরাশ রংচঙে জামাকাপড় পড়িয়ে........."

"......নাতি হবে, মানুষের কত বড় একটা সাধ, কথায় বলে *আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি*।" [স্বর্গাদপি গরীয়সী][৮৩]

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) (১৮৯৯-১৯৭৯)

উপর চালাক।

অর্থাৎ যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যধিক চালাকি দেখাতে চায়।

—নিলয়কুমার *উপর চালাক* গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তা শুনিলে, দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোন শাঁস নাই। [জঙ্গম][৮৪]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)

১. অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।

অর্থাৎ যার রসজ্ঞান নেই তার সঙ্গে আলোচনা করা চরম দুর্ভোগমাত্র।

—বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ একথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিষেধ মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন দুরন্ত কর্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে?.... ....ভল্লু জানিত কাকা বুঝিবেন না। *অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং*—তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। ['ভল্লু সর্দার', কাঁচামিঠা]

২. ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি

অর্থাৎ অতি অল্পক্ষণের বৃষ্টি।

—আকাশে মেঘ আরও ঘন হইয়াছে, মাঝে মাঝে চড়বড় করিয়া দু-চার ফোঁটা *ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি* ঝরিয়া পড়িতেছে।[৮৫]

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)

ঢাকাই সাক্ষী।

অর্থাৎ অপরাধীর দোষ ঢাকবার বা স্খলনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতি।

—অমূল্য বলে, বই আমি এনেছি। ও দোষী কিসে?

পাঁচকড়ি তাড়া দিয়ে ওঠেন। *ঢাকাই সাক্ষী* দিতে হবে না তোকে। তোর বাংলা পরীক্ষা—তুই কেন আনতে যাবি জ্যামিতির বই! [নবীনযাত্রা][৮৬]

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৮০)

১. ঘোড়ার ডিম।

অর্থাৎ অবাস্তব বা কিছুই না বা অলীক বস্তু।

ঐ উনি যা বললেন—একেবারে মর্গির মতোন।
আস্ত ঘোড়ার ডিম । পেড়ে দিলেই হল—পারতে কি। [শিবরাম চকরবরতির মত কথা বলার বিপদ]

২. বিনা মেঘে বজ্রপাত।

অর্থাৎ আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত বিপদ।

—'বৎস, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে। নোবেল প্রাইজ তোমার জন্য।'
শরতের আকাশে (কিম্বা ভারতের?) যেন *বিনামেঘে বজ্রপাত!*[৮৭] [হরগোবিন্দের যোগবল]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৮৭৬)

১. অষ্টরম্ভা!

অর্থাৎ অসিদ্ধি বা ব্যর্থতা।

—কুঞ্জ কহিল, বলি, চাল ডাল কিছু এনেছ, না *অষ্টরম্ভা*! সেই কখন থেকে উনুন পেতে, জল তুলে, শুকনো পাতা কুড়িয়ে সব ঠিকঠাক করে বসে আছি। [আকস্মিক]

২. কান টানলেই মাথা আসে।

অর্থাৎ যাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাদের একটিকে আয়ত্তে আনতে পারলেই অপরটি আপনি আসে।

—"বাঃ অমি গেলে তুমিও যেতে বৈ কি সঙ্গে। *কান টানলেই ত' মাথা আসে*।" [ছিনিমিনি][৮৮]

সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪)

রথ দেখা কলা বেচা।

অর্থাৎ একটা কাজ করতে গিয়ে সেই সঙ্গে আর একটা কাজ করা।

—সমুদ্র বাংলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে, কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে *জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলাবেচার মত* করে—পুরীতে। [দেশেবিদেশে][৮৯]

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

দা-দেইজি।

অর্থাৎ নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজন।

—শুধু স্বামী ও শাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসারে করিতে হইবে। *দা-দেইজি* না থাকায় একরকম ভালই থাকিবে। [শৃঙ্খল][৯০]

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩)

অতি বড়ো সুন্দরী না পায় বর।

অর্থাৎ মায়ালতা বললে, রূপের কথা আর বোলো না, এ যেন শিমুল ফুল।

—গন্ধ নেই, শোভা আছে। *অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।* বুঝতেই পাচ্ছ বর জোটেনি। [অগ্রগামী][৯১]

আবুল ফজল (১৯০৬-১৯৮৩)

দু'মুখো সাপ।

অর্থাৎ দু'দিকেই কথা বলে।

—'দু' মুখো সাপ কোথাকার!' [রাহু][৯২]

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি

অর্থাৎ স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।

......দিনের মধ্যে কত গল্পই বা নিলু, তুই আমার সঙ্গে করিস? তাও কি, ঐ ঠ্যাঙ্গা মারা ঠ্যাঙ্গা মারা কথা না বললেই নয়? আবার হাসছিস, লজ্জা করে না! ছোটবেলা থেকেই একইরকম থেকে গেলি। *'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'*।' [জাগরী][২৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

১. কলা-বউ।

অর্থাৎ দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী অতিরিক্ত লজ্জাশীলা নারী।

—মামীর ঘোমটা ঘুচবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বললেন, ছি ছি, মামী হয়ে ভাগ্নের কাছে ঘোমটা টেনে *কলাবৌ* সাজবে? [অতসীমামী]

২. মাছের তেলে মাছ ভাজা।

অর্থাৎ বিনা ব্যয়ে বা যৎসামান্য ব্যয়ে কার্যোদ্ধার করা।

—আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে ধরা পুঁটির *(মাছের) তেলে ভাজা পুঁটি মাছ* দিয়া, দিনের পরে দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে— [পদ্মানদীর মাঝি][২৪]

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

ঢাক পেটানো।

অর্থাৎ কোনও কথা আড়ম্বর সহকারে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা।

আদর করে তুই বলতেন, হঠাৎ হঠাৎ নয়নাংশুর *ঢাক পিটিয়ে* যেতেন কখনো আমাকে একা পেলে। [রাত ভ'রে বৃষ্টি][২৫]

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)

১. কাঠ খড় পোড়ানো।

অর্থাৎ অনেক কষ্ট ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করা।

—অনেক *কাঠ খড় পুড়িয়ে,* অনেক চেষ্টা চরিত্র করে সুব্রত এই সুখনীড় ভবন-এর কোন একটু গভীর খাঁজের মধ্যে একখানি নীড় জোগাড় করে ফেলে এখন বড় আনন্দে আছে। ['সুখ সুখ মুক্তো' গল্প]

২.   হাড় পিত্তি জ্বলে যাওয়া।

অর্থাৎ চটে বা রেগে যাওয়া।

—গাপ করবে না? দেখেই তো *হাড় পিত্তি জ্বলে* গিয়েছিল। ['সুখ সুখ মুক্তো']

৩.   আলুথালু।

অর্থাৎ অবিন্যস্ত অবস্থা।

—*আলুথালু* কেশবাসে প্রায় ছুটে এসে ধপাস করে বসে পড়ে বলেন, এত করে বলি বেঁধে রাখবি কুকুরটাকে তা কিছুতেই যদি কথা শোনে। [পাতাচাপা গল্প][২৬]

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিতে বেশ কিছু লোক-উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ দুটি প্রবাদের উল্লেখ করা হল:

১.   অথৈ জলে।

অর্থাৎ মহাবিপদে পড়া।

—'দশ সের সূতা লইয়া যে *অথৈ জলে* পড়িল।' [তিতাস একটি নদীর নাম, নয়া বসত অংশে।]

২.   কুরুক্ষেত্র ঘটানো

অর্থাৎ নিদারুণ কলহের সূত্রপাত।

—'ব্রজলীলার দিনে কুরুক্ষেত্তর ঘটাইয়া লাভ নাই।' [তিতাস একটি নদীর নাম, নয়া বসত অংশে।][২৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি রাজা ও নির্বোধ মন্ত্রী।

—অন্যায় হয়ে গেলে কাউকে তো শাস্তি দিতেই হবে ভাই। *হবুচন্দ্র রাজার* বিচার এই কথাই বলে। চুরি করতে গিয়ে চোর যদি দেয়াল চাপা পড়ে মরে তা হলে কুমোরকে ধরে ফাঁসি দাও। আইনের মর্যাদা তো রাখতে হবে। [ভাঙ্গাবন্দর (কবর)][৯৮]

তপন রায়চৌধুরী (১৯২৬-)

মরণকামড়

অর্থাৎ প্রতিহিংসার শেষ এবং মরিয়া প্রচেষ্টা।

—কবে কোন সাপের ছানা কে মেরেছিল, মা সাপ তাকে সাতদিন অনুসরণ করে এক অমাবস্যার রাতে দিনক্ষণ দেখে *মরণকামড়* দেয়। [বাঙালনামা][৯৯]

সমরেশ বসু (১৯৩৪-১৯৮৮)

ঊনিশ বিশ।

অর্থাৎ দুটি অনুরূপ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য বা প্রায় সমান।

—সে তো মেয়ে মানুষ মাত্রই ভাল করে সকলের জানা, আর সকলেরই টেকনিক এক, *ঊনিশ আর বিশ*। [বিবর][১০০]

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৮)

বন থাকলে বৃষ্টি হবে।

অর্থাৎ বন বৃষ্টির উৎস।

—চারপাশে বন আর বন। *বন থাকলে বৃষ্টি হবে,* খনার বচন। এদিকে বষ্টি হয়েছিল, ধানও মন্দ হয়নি। [বীরে ডাকাত ও ছিরে ডাকাত][১০১]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০—)

১. জটা লোটা কম্বল।
ইয়ে হ্যায় সাধুকা সম্বল ॥

অর্থাৎ জটা লোটা কম্বলই হল সাধুর একমাত্র সম্বল।

—একটা দোঁহা গোছের হিন্দি প্রবচন আওড়ালেন।

"জটা লোটা কম্বল
ইয়ে হ্যায় সাধুকা সম্বল" ॥ ['সোনার পিদিম' গল্প]

২. শিবরাত্রির সলতে।

অর্থাৎ একমাত্র অবলম্বন।

—এখনও ভোল ফেরাতে পারেনি। কালী তারই ছেলে। *শিবরাত্রির সলতে*। ['সাক্ষীবট' গল্প]

৩. ডুমুরের ফুল।

অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু।

—তাঁর মুখের হাসির সঙ্গে *ডুমুরের ফুলের* উপমা দিতে হয়। ['তারাচাঁদের হাসি' গল্প][১০২]

শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার) (১৯৩২-২০০৪)

গঙ্গাপ্রাপ্তি।

অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা।

—'হাজার হাজার মানুষের *গঙ্গাপ্রাপ্তি* হয়, হাজার হাজার সেপাই কোম্পানির ফৌজ থেকে পালিয়ে যায়।' ['ঠগী' উপন্যাস][১০৩]

শংকর (১৯৩৩-)

১. হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।

অর্থাৎ গুপ্ত কলঙ্কের কথা বা গোপন কথা প্রকাশ করা।

—বললাম, "হাটে যখন আমাদের *হাঁড়ি ভেঙ্গেছে* তখন সোজা কথাটা দাঁড়াচ্ছে: বাংলা নাটকের চরিত্ররা প্রতিটা চল্লিশ শব্দের পর একবার না বললেই—হায়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্লড বোধহয়।" [দয়া করে বলবেন না, রসসাহিত্য]

২. বানচাল করা

অর্থাৎ পণ্ড করা।

—"কোনও অচেনা অশুভ শক্তি ওটা *বানচাল* করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।" ['ভাঁড়ে মা ভবানী' রম্য রচনা][১০৪]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১)

১. আইনের কচকচি।

অর্থাৎ বাধা নিষেধ আরোপ করা

—বুঝলে জোন্স—আর বেশিদিন তোমার সুপ্রিম কোর্টে *আইনের কচকচি* নিয়ে পড়ে থাকতে হবে না। ['সে' গল্প]

২. ফুলে ফাঁপা।

অর্থাৎ অহংকারে বড় হওয়া।

—জল খেয়ে খেয়ে মতিলাল তো *ফুলে ফেঁপে* একদম ঢোল। ['সেই মাছটা' গল্প][১০৫]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-)

১. কাঁচা বয়স।

অর্থাৎ অপরিণত বয়স।

—এই অরুণ তোর *কাঁচা বয়স*, বিয়ে তো করিস্‌নি, প্রেম ট্রেম, দু-একটা গল্প ছাড় না। ['খরা' গল্প]

২. তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা।

অর্থাৎ সহসা অত্যন্ত রেগে যাওয়া।

—তারপরই ওয়াচ টাওয়ারের নিচের দিকে তাকিয়ে বরুণা *তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল*। ['হরিণ শিশু' গল্প][১০৬]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-)

আকাশ-পাতাল ভাবা।

অর্থাৎ বিভিন্ন বা অসংলগ্ন কথা ভাবা।

—'কি বললে ক্ষণার হৃদয় কম্পাসের কাঁটা কেঁপে উঠবে তা *আকাশ-পাতাল ভেবেও* ঠিক করতে পারছিলাম না।' ['কাগজের বউ'][১০৭]

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬-)

১. যত দোষ নন্দ ঘোষ।

অর্থাৎ নিরীহ লোকের প্রতি অবজ্ঞা।

—প্রশান্ত বললে, 'তোমাদের কী হয়েছে জান? *যত দোষ নন্দ ঘোষ*।' ['স্বামী-স্ত্রী সংবাদ' গল্প]

২. মোড়ের কার্তিক।

অর্থাৎ সেজে গুজে যারা রাস্তায় বিরাজ করে।

—'একালের অপদার্থ এক পিতা! সাজ দেখো, যেন *মোড়ের কার্তিক*।' ['ঘরেই জামাই' গল্প]

৩. ইঁট ছুড়লেই পাটকেলটি খেতে হয়।

অর্থাৎ যে রকম করবে তার প্রতিক্রিয়াও সেরকম হবে।

—'সে যুগ আর নেই। এখন *ইঁট ছুঁড়লেই পাটকেল খেতে হবে।*' ['বারুদ' গল্প]

৪. বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল।

অর্থাৎ, একটা সাংঘাতিক জোট বা সমন্বয়।

—গ্রন্থটির নামকরণই 'বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল।' ['বুনো ওল বাঘা তেঁতুল' গল্প]

৫. দিল্লিকা লাড্ডু, যো ভি খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া।

অর্থাৎ ভাল জিনিসের স্বপ্ন, কিন্তু তার পরিণাম খারাপ।

—অভিজ্ঞ মানুষ বলেন, ইয়ে হ্যায় *দিল্লিকা লাড্ডু, যো ভি খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া।* ['তোমার ম্যাও তুমি সামলাও' রম্যরচনা]

৬. বারো মাসে তেরো পার্বণ।

অর্থাৎ সব সময় উৎসব লেগেই থাকে বা অনবরত উৎসব।—ধর্মের দেশ। তাই না? *বারো মাসে তেরো পার্বণের* স্রোত বইছে। ['প্রশ্নোত্তরে' দুর্গোৎসব]

৭. গিভ এণ্ড টেক।

অর্থাৎ দেওয়া ও নেওয়া।

—লাইফ হচ্ছে *'গিভ এণ্ড টেক'* বার্টার সিস্টেম। ['একটি সাক্ষাৎকার']

৮. পুনর্মূষিক ভব।

অর্থাৎ আবার পুরোনো রূপে পৌঁছে যাওয়া।

—তাবপর আবার *পুনর্মূষিক ভব।* ['প্রশ্নোত্তরে দুর্গোৎসব']

৯. সাপ আর বাঘের মুখে চুমু খাওয়া।

অর্থাৎ শত্রু-মিত্র উভয়ের সঙ্গেই বাস করা।

—তাঁরা কর্মচারীদের কাঁচকলা দেখাতে পারেন, আইনের *সাপ আর বাঘের মুখে চুমু খেতে* পারেন। ['বাঙালীর পুচ্ছ নৃত্য'][১০৮]

তারাপদ রায় (১৯৩৬-)

তারাপদ রায়ের অজস্র রম্যরচনার মধ্যে বহু লোক-উপাদান ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকে দুটি প্রবাদের উল্লেখ করা হল:

১. নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, নিত্য রাবণ বধ।

অর্থাৎ নিদারুণ কলহ ও মারামারি-কাটাকাটি ব্যাপার।

—'তাহার বাড়িতে *নিত্য-কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, নিত্যরাবণ বধ*।' ['কিঙ্কর-কিঙ্করী']

২. গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ।

অর্থাৎ ঘোরতর যুদ্ধ, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সমানে সমানে যুদ্ধ।

—'রীতিমতো *গজ কচ্ছপের যুদ্ধ* শুরু হয়ে গেল।' ['কলকাতা তিনহাজার তিনশো']^[১০৯]

দেবেশ রায় (১৯৩৬-)

১. ভাগ্যের হাতে পুতুল।

অর্থাৎ নিজের অদৃষ্ট নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা।

—*'আমরা ভাগ্যের হাতে পুতুল'*। ['তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' উপন্যাস]

২. কুঁতে মল দৈবকী, নামের বেলায় যশোদানন্দন।

অর্থাৎ একজনের কাজ, অন্যের নাম।

—বাহ্ বেশ হাত নাড়িয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথা দুলিয়ে, এক হাত ৩০৫-এক দিকে, আর এক হাত চন্দ্রাবলীর দিকে চড়িয়ে বলে ওঠে, '*কুঁতে মল দৈবকী, নামেব বেলায় যশোদানন্দন*।' ['আঙিনা' উপন্যাস][১১০]

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-)

১. তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা।

অর্থাৎ অতিমাত্রায় রেগে যাওয়া।

—উর্মিলার কথা শুনেই সুমিত্রা *তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন*।' [উত্তরকাণ্ড, 'সর্গত' গল্প]

২. ঠুঁটো জগন্নাথ।

অর্থাৎ অকর্মণ্য।

—খোঁড়া-বউ এত কাজের, আর তুই যেন *ঠুঁটো জগন্নাথ*। ['খোঁড়া-বউ আর কুঁড়ে-বউ' গল্প][১১১]

সমরেশ মজুমদার (১৯৪৩-)

ফোঁড়ন কাটা।

অর্থাৎ কয়েকজনের কথোপকথনের মাঝখানে অপব কোনও ব্যক্তি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত অথচ বিশেষ অর্থপূর্ণ টিপ্পনি বা মন্তব্য করা।

—আর একজন ফোড়ন দিল, আজ ঝগড়া করেছিলে খেয়াল নেই। কিংবা, যে বউটি মোক্ষ বুড়িকে *ফোড়ন কেটেছিল* ভাকে পেল মাধবীলতা। ['কালপুরুষ' উপন্যাস][১১২]

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-)

হাতি পোষা।

অর্থাৎ প্রতিদিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এমন কাজ করা।

—এই সব ইন্ডাস্ট্রি শেষপর্যন্ত *হাতি পোষার* মতো হয়। ['আকাশ জোড়া মেঘ'][১১৩]

আফসার আমেদ (১৯৫৯-)

১. চুলোচুলি।

অর্থাৎ মারামারি।

—আর কাজিপাড়ার দুই সতীনের *চুলোচুলি* আর এক অস্বস্তিকর ঘটনা জিইয়ে রাখা হচ্ছে। ['অলৌকিক দিনরাত' উপন্যাস]

২. মুদ্রাদোষ।

অর্থাৎ বাজে অভ্যাস।

—চা দোকানের পাটায় বসে হারুণ কেন সারাক্ষণ কোমর চুলকোয়, কেন রওশন চাচার কথায় কথায় *মুদ্রাদোষ* 'যাচ্চলে'। ['অলৌকিক দিনরাত' উপন্যাস।][১১৪]

বর্তমানে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা Oral tradition-কে Oral heritage বলতে শুরু করেছেন। সে যাই হোক এই উভয় শব্দগুচ্ছই বাংলা 'ঐতিহ্যে'র দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। এই লোক-ঐতিহ্য হাজার হাজার বছর ধরে একটা জাতির জীবনে নানাভাবে জীবন্ত থাকে। ফলে মানুষের কর্ম ও জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংগীতে-সুরে-অলংকারে-ছন্দে জীবনের গভীরে কিংবা উপরিতলে বিরাজ করতে থাকে। আমরা সমাজজীবনে এই লোক-ঐতিহ্যের স্নিগ্ধ হাওয়াতে লালিত—এ যেন অক্সিজেনের মতো মানুষের জীবনকে সজীব ও সতেজ করে রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে একেই বলেছেন "জনপদের হৃদয়ে কলরব"। জলকণিকা যেমন বাতাসে দীর্ঘদিন সঞ্চরণমান থাকে, তেমনি ঐতিহ্যের কণিকাগুলি সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। সেইজন্য প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত লোক-ঐতিহ্যের বা ধ্রুপদী ঐতিহ্যের বিচ্ছুরণ আমরা লক্ষ করে থাকি। বিখ্যাত মার্কিন লোকসংস্কৃতিবিদ ফ্রান্সিস পটার বলেছেন এটা হল "Living fossil" অর্থাৎ ফসিল বা প্রাচীন হলেও এই ঐতিহ্য প্রাণবন্ত। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় এই ঐতিহ্যই নানারকমস্তরে অর্থাৎ কাব্য-কবিতা-গান- গীতিকা-নাটক কিংবা কথাসাহিত্যে খণ্ড অথবা অখণ্ডভাবে প্রতিফলিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর কাল থেকে আফসার আমেদ পর্যন্ত প্রত্যেকের রচনায় প্রবাদের ভগ্ন-খণ্ড অংশ যেমন বিচ্ছুরিত, তেমনি কোথাও নূতন অর্থও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

১. *'দিনে দুপুরে ডাকাতি'* প্রবাদটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যের 'হিং টিং ছট' কবিতাতে *'দুপুরে ডাকাতি'* বলেছেন অর্থাৎ দিনে কথাটি উহ্য থাকলেও প্রবাদটির অর্থ একই।

২. *'কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে'*—প্রবাদটির ব্যবহার রাজশেখর বসু 'কজ্জলীতে' একটু ঘুরিয়ে বলেছেন—*'লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে'*।

৩. 'রথ দেখা কলা বেচা' প্রবাদটি সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থে একটু ভিন্নভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন—*"জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে পুরীতে"*।

৪. *'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'*—এই প্রবাদটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চতুর্দশ কবিতাবলী, ৯৩নং' কবিতায় সোজাসুজি ব্যবহার না করে একটু ভেঙে বলেছেন—"*এমনকি ঘা দিই খাঁড়ার/মড়ার ওপরে*।"

৫. *'সাত ভাতারীর ষোল কলা নেই ভাতারীর চৌষট্টি'* এই প্রবাদটি আবুল বাশার তাঁর 'অন্য নকসি' গল্পে মূল প্রবাদটিকে প্রসারিত করে ব্যবহার করেছেন—*'সাত ভাতারীর ষোলকলা', কিন্তু 'আছে-কি নেই-ভাতারীর চৌষট্টি'*।

৬. *'পেটে খেলে পিঠে সয়'*—প্রবাদটিকে অন্নদাশঙ্কর রায় 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদর' ছড়াটিতে প্রবাদের অনুষঙ্গ ভেঙে ব্যবহার করেছেন—*'পেটে নয় পিঠে খায়'*।

আধুনিককালে এরূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ভগ্নপ্রবাদের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রবাদের আদিম ভাবানুষঙ্গ গ্রহণ না করে ওই প্রবাদবাক্যের তির্যক প্রয়োগ কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং সাধারণের বোধগম্য হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৮

২. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৫

৩. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭২

৪. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কলকাতা, ১৩৫৩

৫ যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কলকাতা, ১৩১৫

৬ খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কলকাতা, ১৯৪৪

৭ নগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬৯

৮. তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত, নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা, ১৯৪৭

৯. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৯

১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২

১১. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৭

১২. সুকুমার সেন সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ: চৈতন্য চরিতামৃত, কলকাতা, ১৯৬৩

১৩. যোগীলাল হালদার সম্পাদক, রামেশ্বর ভট্টাচার্য: শিবসঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন, কলকাতা, ১৯৫৭

১৪. দীনেশচন্দ্র সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত শিবায়ন, কলকাতা, ১৩৬৩

১৫. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬২

১৬. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬০

১৭ অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ১৯৯২

১৮ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, গোর্খবিজয়, কলকাতা, ১৩৫৬

১৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ভারতচন্দ্রের রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫০

২০. পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামপ্রসাদী সঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৬৫

২১. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩১৪

২২. মযহারুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত, সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, ঢাকা, ১৯৬৯

২৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, আলাওলের পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৩৭৬

২৪. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরামখানের লায়লা মজনু, ঢাকা, ১৯৫৭

২৫ অর্দ্ধেন্দুশেখর রায় সম্পাদিত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলকাতা, ১৯৯৭

২৬. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, গোপাল উড়ের টপ্পা, কলকাতা, ১৩৬৭

২৭. উইলিয়ম কেরি, কথোপকথন, কলকাতা, ১৩৪৯

২৮. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, প্রবোধচন্দ্রিকা, কলকাতা, ১৭৮৪

২৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল, কলকাতা, ১৪০৫

৩০. বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস, কলকাতা, ১৩৮২

৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্শা, কলকাতা, ১৪০৪

৩২. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্নপ্রয়াণ, কলকাতা, ১৯১৪

৩৩. মীর মোশার্‌রফ হোসেন, বিষাদ সিন্ধু, কলকাতা, ১৯৯৮

৩৪. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৪

৩৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭০

৩৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৩৭২

৩৭ দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৮

৩৮. রামনারায়ণ তর্করত্ন, কুলীনকুলসর্বস্ব, কলকাতা, ১৯৮৭

৩৯. মধুসূদন দত্ত গ্রন্থাবলী, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮

৪০. সুকুমার রায় সমগ্র, কলকাতা, পাত্র'জ পাবলিকেশন, ২০০৫

৪১ দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮

৪২. গিরিশচন্দ্র রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪

৪৩. ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক, কলকাতা, ১৯৯৭

৪৪. অমৃতলাল বসু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৩৯০

৪৫. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৬৬
৪৬. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সমগ্র নাটক, বাসবী রায় সম্পাদিত, ১৯৯৮
৪৭. ঈশ্বর গুপ্ত গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির
৪৮. মধুসূদন দত্ত গ্রন্থাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৮
৪৯. বিহারীলাল রচনাবলী, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩২০
৫০. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৫০
৫১. রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৬১
৫২. নজরুল রচনাবলী, ঢাকা, ১৯৬৬
৫৩. জীবনানন্দ সমগ্র, কলকাতা, ভারবি, ২০০৪
৫৪. অন্নদাশঙ্কর রায়: ছড়া সমগ্র, কলকাতা, ১৯৮৫
৫৫. জসীমউদ্দীন: নক্সীকাঁথার মাঠ, ঢাকা, ১৯৮৬; বাঙ্গালীর হাসির গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৯ এবং সোজন বাদিয়ার ঘাট, ঢাকা, ১৯৮৬
৫৬. বিষ্ণু দে: কবিতা সমগ্র, কলকাতা, ১৯৮৯-৯০
৫৭. বিনয় ঘোষ: কালপেঁচার নক্শা, কলকাতা, ১৯৯৬
৫৮ বিজন ভট্টাচার্য: বঙ্গসাহিত্যে বঙ্গ ব্যঙ্গ: পবিত্র অধিকারী সম্পাদিত, কলকাতা, ২০০৩
৫৯. সলিল চৌধুরী: ঐ
৬০. গৌরকিশোর ঘোষ: বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গ ব্যঙ্গ, পবিত্র অধিকারী, কলকাতা, ২০০৩
৬১. সুকান্ত সমগ্র, কলকাতা, ১৪১২
৬২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: দেখা হবে, ২০০২, কবিতার বদলে কবিতা, কলকাতা, ১৪০৮
৬৩. শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ২০০৫
৬৪. মতি নন্দী: বিজলীবালার মুক্তি, কলকাতা, ২০০২
৬৫. শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা. কলকাতা, ২০০৪
৬৬ শক্তি চট্টোপাধ্যায়: পদ্য সমগ্র ১, কলকাতা, ১৯৯৬
৬৭. জয় গোস্বামী: কবিতা সংগ্রহ, কলকাতা, ২০০৩
৬৮. বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ ১৩৭২
৬৯. সঞ্জীবচন্দ্র রচনাবলী, পালামৌ, কলকাতা, ১৩৫৯
৭০. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণলতা, কলকাতা, ১২৯৬
৭১. রমেশচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯
৭২. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র অধিকারী সম্পাদিত, বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কলকাতা, ২০০৩
৭৩. রাজশেখর বসু. পরশুরাম গল্প সমগ্র, কলকাতা ২০০৩
৭৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা, ১৯৯৫
৭৫. শরৎচন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫
৭৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির
৭৭. অনুরূপা দেবী: মা, কলকাতা, ১৯৫৬
৭৮. তারাশঙ্কর গল্পগুচ্ছ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৫
৭৯. গিরিবালা দেবী: রায়বাড়ী, কলকাতা, ২০০৩
৮০. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আরণ্যক, ১৩৫৮, পথের পাঁচালী, কলকাতা, ১৩৮৭

৮১. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্তঃশীলা, কলকাতা, ১৩৪২
৮২. নরেন্দ্র দেব: মানিকের ফ্যাসাদ (সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সেরা সন্দেশ, ১৩৯১)
৮৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়: স্বর্গাদপি গরীয়সী: বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৫
৮৪. বনফুল: জঙ্গম, কলকাতা, ১৩৫২
৮৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: কাঁচামিঠে, কলকাতা, ১৩৫৬
৮৬. মনোজ বসু গল্পসংগ্রহ, কলকাতা, ১৩৬৪
৮৭. শিবরাম রচনা সমগ্র, কিশোর অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৬
৮৮. অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৪
৮৯. সৈয়দ মুজতবা আলি: দেশে বিদেশে, কলকাতা, ১৩৬০
৯০. প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, নাভানা, কলকাতা, ১৩৫৯
৯১. প্রবোধকুমার সান্যাল: অগ্রগামী, কলকাতা, ১৩৫২
৯২. বাংলাদেশের ছোটগল্প, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯
৯৩ সতীনাথ ভাদুড়ি: জাগরী, কলকাতা, ১৩৮৬
৯৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্র, কলকাতা, গ্রন্থালয়, ১৩৮৪
৯৫. বুদ্ধদেব বসুর রচনা সমগ্র, কলকাতা, ১৯৯৫
৯৬. আশাপূর্ণা দেবী, প্রিয়গল্প, কলকাতা, ১৪০৫
৯৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, গল্প সমগ্র, কলকাতা, দে'জ, ২০০০
৯৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী, কলকাতা, ১৩৮৬
৯৯. তপন রায়চৌধুরী, বাঙালনামা, কলকাতা ২০০৭
১০০. সমরেশ বসু, বিবর, কলকাতা, ১৯৮৫
১০১ মহাশ্বেতা দেবী: বীরে ডাকাত ও ছিরে ডাকাত (সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সেরা সন্দেশ ১৩৯১)
১০২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গল্প সমগ্র, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩
১০৩. শ্রীপান্থ, ঠগী, কলকাতা, ২০০৪
১০৪. শংকর, সাতদশে, জন্ম জয়ন্তী সংগ্রহ কলকাতা, ২০০৩
১০৫ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, ২০০৩
১০৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাছাই গল্প, কলকাতা, ১৯৮৯
১০৭. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়: কাগজের বউ, কলকাতা, ১৪০৪
১০৮. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল, হনুমান টুপি, কলকাতা ২০০৫
১০৯. তারাপদ রায়, ৩৬৫, কলকাতা, ২০০৫
১১০. দেবেশ রায়, কোজাগর, কলকাতা, ২০০২
১১১. নবনীতা দেবসেন, ছোটদের গল্পসমগ্র, প্রথম সম্ভার, কলকাতা, ১৪১১
১১২. সমরেশ মজুমদার, কালপুরুষ, কলকাতা, ১৯৯০
১১৩. হুমায়ুন আহমদ, আকাশ জোড়া মেঘ, কলকাতা, ১৯৮৮
১১৪ আফসার আমেদ, অলৌকিক দিনরাত, কলকাতা, ১৯৯১

আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক প্রবাদের সঙ্গে তুলনা

ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্ট হয়। কারণ একদিকে যেমন ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আছেন, অন্যদিকে তেমনি দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, মুণ্ডারী, মঙ্গোলয়েড প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর সমাবেশে ভারতবর্ষে জনগোষ্ঠীর সমাজ গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি রক্তধারারও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তারই ফলে কোথাও কোথাও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-মহাকাব্য-জাতক গ্রন্থগুলি ভারতবাসীমাত্রেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাতৃস্বরূপ। বর্ণগোষ্ঠীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও অনেকেই এই সার্বজনীন ঐতিহ্যকে নিজেদের সম্পদরূপে গণ্য করেছেন। ফলে এক সাধারণ সাংস্কৃতিক সত্তা সমগ্র ভারতবর্ষেই বিরাজমান। অধিকন্তু ফরাসি নৃবিজ্ঞানী ফ্রাঁ বোয়াস বলেছেন যে লোকমানসিকতা এক সমস্তরের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একইরকমভাবে বিকশিত হয়। সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনও কোনও উপাদানগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্যময়তা সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে এক অখণ্ডসূত্রে সংহত করেছে। এখানে শ্রেণীগত বৈষম্য তেমন কার্যকরী হয়নি। বস্তুতপক্ষে সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রাচীনত্ব মানুষের সাংস্কৃতিক প্রকাশের সাদৃশ্যগত অখণ্ডতা সৃষ্টি করেছে। পুরাকথা-পরীকাহিনী-প্রবাদ-ধাঁধা কিংবা লোকাচারের সাদৃশ্য বিশেষভাবে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইন্দো-ইউরোপিয়ান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাচীনকালে ইন্দো-এরিয়ান জনগোষ্ঠীর যে একটা সম্পর্ক ছিল তা বিভিন্ন উপাদানগত সাদৃশ্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষের আন্তঃপ্রাদেশিক লোকসংস্কৃতিগত সাদৃশ্য যেমন

বৈচিত্র্যমণ্ডিত, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই লোকসংস্কৃতির সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। মূলত দেশ ও কালের সীমায় এক সমগোত্রীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি, জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবন-সংগ্রাম মানুষের দেশান্তরের সাদৃশ্যের একটি পটভূমি রচনা করেছে। এটাকেই বলা চলে সংস্কৃতির বিশ্বজনীনতা। এই Universal বা বিশ্বগতরূপ মানুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিপূরক। সেইজন্য কোথাও কোথাও সাদৃশ্যময়তা যেমন আছে, কোথাও কোথাও বৈচিত্র্যের রূপও আমরা দেখতে পাই। বস্তুতপক্ষে মানুষের সমগোত্রীয়তা সংস্কৃতির সাদৃশ্যের মূল মন্ত্র। তাই বলা যায় সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও মানবজীবনের শাশ্বত রূপটি প্রবাদে ব্যক্ত হয় বলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে তা সহজেই প্রচার লাভ করে বা একই ধরনের প্রবাদ বিভিন্ন দেশে শোনা যায়:

হিন্দি: মাঁ মারে, মাঁ হী তো পুকারে।
বাংলা : মায়ে মারে, মা বলেই কাঁদে।

উক্ত দুটি প্রবাদের মধ্যে দিয়ে মায়ের মায়া-মমতার কথাই বলা হয়েছে। পরিবারে মায়ের স্থান সবার উপরে। মায়ের সন্তান স্নেহের কথা কারও অজানা নয়। সংসারে মায়ের স্থান কীরূপ সে প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে:

পিঠে বল, মিঠে বল, ভাতের বাড়া নেই।
পিসী বল, মাসি বল, মায়ের বাড়া নেই।

কিংবা,

অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।

উপরি-উক্ত হিন্দি প্রবাদটিতে মা সম্পর্কে একই ধরনের মানসিকতা লক্ষ করা যায়।

পরিবারে ভাইয়ের ভূমিকাও কিছু কম নয়। তাই ভাইকে নিয়ে বাংলা ও হিন্দিতে চমৎকার প্রবাদ শোনা যায়:

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই। (বাংলা)

হিন্দিতে ভাই সম্পর্কে বলা হয়েছে:

ভাইসা মিত্ নহী, ভাইসা দুশ্মন নহী। (হিন্দি)

প্রবাদ দুটিতে বলা হয়েছে ভাইয়ের মতো আপন যেমন কেউ নেই, আবার অনেক ক্ষেত্রে ভাইয়ের মতো শত্রুও তেমন হয় না।

পরিবারে বেশি কন্যাসন্তানের আদরেব চেয়ে অনাদরই হয়। তাই অনেক সময় দেখা যায় বেশি কন্যাসন্তান জন্মানো কাম্য হয় না পিতা-মাতার কাছে। কন্যাসন্তান বেশি হলে পিতা-মাতা কর্মফলকেই দোষারোপ করেন এবং মায়ের ভাগ্যদোষের কথা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রকাশিত হতে দেখা যায় প্রবাদে। এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি বাংলা প্রবাদ শোনা যায়। যেমন—

ক. সাত জন্মে পাপ করলি
মেয়ে জন্মে তবে এলি।

খ. মেয়ে হয়ে জন্মালি
সব অভিশাপ নিয়ে এলি।

গ. মেয়ের জন্ম যদি দিলি
আঁতুড় ঘরে কেন মেরে না ফেললি।

ঘ. মরলে আঁতুড় ঘরে, পাপ চুকতো অঙ্কুরে।

ঙ. মেয়ে বড়ো করা, কালনাগিনী গড়া।

প্রবাদে দেখা যাচ্ছে মেয়ের মৃত্যু প্রথমে দুঃখের হলেও পরে সুখেরই হয়। এই একই ধরনের মানসিকতা ওড়িয়া প্রবাদেও লক্ষ করা যায়। যেমন—

ঝিঅ মরণ, পিতা তিউণ, ন মিলে রুণ। (ওড়িয়া)

পরিবারে জামাই অতি আদরের জন। কিন্তু যতদিন মেয়ে বাঁচে ততদিনই জামাইয়ের আদর থাকে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় কয়েকটি প্রবাদ শোনা যায়:

ক. মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর। (বাংলা)

খ. বাহা সরিলে বেদির মুহপুরু। (ওড়িয়া)

গ. লড়কি বাঁচেগী ত দামাদ আয়েগা। (হিন্দি)

ঘ. অক্কাল ইরুক্কি বরাইতান্ মচ্চান্ উরবু। (তামিল)

ঙ. মাগালু ইদ্দারে মারমায়া ইনিগে সম্মানা। (কন্নড়)

বাংলা প্রবাদে শাশুড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বউয়ের সঙ্গে শাশুড়ির তিক্ত সম্পর্ক বাংলা প্রবাদে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। অনেক সময়ই শাশুড়ি বউয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, ফলে নির্যাতিতা বধূর মধ্যে শাশুড়ির মৃত্যুতে শোক প্রকাশের কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। তাই প্রবাদে বধূকে বলতে শোনা যায়:

শাশুড়ি মল সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে, কাঁদব আমি বিকেলে। (বাংলা)

শাশুড়ি সম্পর্কে বধূর একই মানসিকতা লক্ষ করা যায় হিন্দি প্রবাদেও:

সাস মোরা মরে, সসুর মেরা জীও। (হিন্দি)

—শাশুড়ি মরলেও শ্বশুর বাঁচুক অর্থাৎ শ্বশুরের প্রতি কোনও বিদ্বেষ বধূর নেই।

সংসারে ননদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ বধূর বিদ্বেষ বাংলা ও হিন্দি প্রবাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন—

ননদেরও ননদ আছে। (বাংলা)

ননদো কীভী ননদ হোতী হৈ। (হিন্দি)

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ননদের সঙ্গে শাশুড়ির প্রসঙ্গও শোনা যায় প্রবাদে:

শাশুড়ি নেই, ননদ নেই কার বা করি ডর। (বাংলা)

একই ভাবনা হিন্দি প্রবাদেও উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন—

সাস্ না ননদী, আপ্হী আনন্দী। (হিন্দি)

পরিবারে সতিন প্রসঙ্গ এক বিরাট সমস্যা। সতিন সম্পর্কিত প্রবাদগুলির মধ্যে দিয়ে সতিনের প্রতি বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়:

উৎবেড়ালি উৎ খা স্বামী রেখে সতীন খা। (বাংলা)

কিংবা, অশত ফেতে বসত করি

সতীন কেটে আলতা পরি। (বাংলা)

বাংলা প্রবাদে সতিনের মৃত্যুকামনা করলেও স্বামীর মৃত্যুকামনা করা হয়নি। কিন্তু একটি ওড়িয়া প্রবাদে স্বামীর মৃত্যু কামনা করে, সতিনের বৈধব্য কামনা করা হয়েছে:

ঘইতা পছে মরু, সৌতনি পছে রাণ্ড হৌ। (ওড়িয়া)

আবার একটি হিন্দি প্রবাদে সতিনদের মধ্যে বনিবনা না থাকলে শাশুড়ির বদনামের কথা বলা হয়েছে:

সৌতিন মে খটপট সাস বদনাম। (হিন্দি)

গার্হস্থ্য জীবনে গরুর ভূমিকা কিছু কম নয়। গরু সম্পর্কে প্রবাদে বলা হয়েছে:

যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও ভালো। (বাংলা)

দুধারু গাই কী লাত ভী ভলী। (হিন্দি)

যে গাইয়ে দুধ দেয়, হেই গাইয়ে লাত্যাইলেস ভালা।[১] (চাকমা)

সংসারজীবনের বিভিন্ন মানুষ ছাড়াও প্রতিদিনের সংসারে চলতে ফিরতে আরও অনেক প্রবাদ শোনা যায় যা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল:

সংস্কৃত প্রবাদ

সংস্কৃতে প্রবাদ, সদুক্তি, আভাণক, পায়োবাদ, লোকোবাদ নামে পরিচিত।

১. সংস্কৃত : অত্যাদরঃ মাঙ্কনীয়ঃ।
বাংলা : অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

২. সংস্কৃত : শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ।
বাংলা : দুষ্টের সঙ্গে দুর্ব্যবহার প্রয়োজন।

৩. সংস্কৃত : মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।
বাংলা : মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম (ভুল) হয়।

৪. সংস্কৃত : অতি সর্বত্র বর্জয়েত্।
বাংলা : অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

৫. সংস্কৃত : স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।
বাংলা : স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্কর।

৬. সংস্কৃত : কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদম্।[২]
বাংলা : কুবাক্য প্রয়োগ করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়।

৭. সংস্কৃত : উদ্যোগঃ পুরুষ লক্ষণম্।
বাংলা : কর্মই পুরুষের প্রতীক।

৮. সংস্কৃত : কষ্টে ফলে।
বাংলা : কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে।

৯. সংস্কৃত : বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।
বাংলা : বাণিজ্যই লক্ষ্মী।

১০. সংস্কৃত : অয়ম্ অপরো গণ্ডস্যোপরি স্ফোটঃ।
বাংলা : গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

১১. সংস্কৃত : গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্ত।[৩]
বাংলা : গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

১২. সংস্কৃত : স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেষঃ।
বাংলা : প্রিয়জনের দেখার জন্যই মেয়েরা সাজে।

১৩. সংস্কৃত : বিষ কুম্ভম্ পয়োমুখম্।[৪]
বাংলা : মুখে মধু অন্তরে বিষ।

১৪. সংস্কৃত : সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।

অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু ভাল নয়।

১৫. সংস্কৃত : বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

অর্থাৎ অতিরিক্ত আড়ম্বর লঘু ফল।

১৬. সংস্কৃত : অতি ভোজনম্ পরিহরণীয়ম্।

অর্থাৎ অতিরিক্ত ভোজন পরিহার করা উচিত।

[কিছু প্রবাদের সংস্কৃত রূপটিই বাংলায় প্রবর্তিত।]

পালি প্রবাদ

পালিতে প্রবাদকে পবাদো বলা হয়। বৌদ্ধজাতকে অনেক পালি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

১. পালি : অতি খাতং হি পাপকং। (জরুদপান জাতক, ২৫৬)
বাংলা : অতি বা বেশি কিছুই ভালো নয়।

২. পালি : অত্তানম এব পঠমং পতিরূপে নিবসয়ে
অথ অঞ্ঞং অন্সাসেয্য।
(সমুদ্দজাতক, ২৯৬ এবং দন্তপুপ্ফ জাতক, ৪০০)
বাংলা : আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে।

৩. পালি : তদ্দঞ্ঞ চ পাণিং পরিবজ্জয়স্স।
(বিদুর পণ্ডিত জাতক, ৫৪৫)
বাংলা : যার পরে তার খায়, তারই ভিটেয় ঘুঘু চড়ায়।

৪. পালি : অপেতচিত্তং ন সম্ভজেয্য।
(পুটভত্তজাতক, ২২৩ এবং গোধা জাতক, ৩৩৩)
বাংলা : যে দিল অন্তরে ব্যথা তার সঙ্গে কিসের কথা।

৫. পালি : অপ্পোদকে ব মচ্ছানং। (মুগপক্খ জাতক, ৫৩৮)
বাংলা : অল্প জলে পুঁটিমাছ ফর্‌ফর্ করে।

৬. পালি : অসাধুসন্নিবাসো নামো পাপো অনথ করো।
(দধিবাহন জাতক, ১৮৬)
বাংলা : অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

৭. পালি : উদরস্ম' অহং দুতো। (দূতজাতক, ২৬৫)[৫]
বাংলা : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৮. পালি : ন'থ্থি লোকে রহো নাম পাপকম্মং পকুব্বতো।
বাংলা : পাপ বাপকেও ছাড়ে না।

৯. পালি : যাদিসং বপতে বীজং আদিসং হরতে ফলং।
বাংলা : যেমন কর্ম তেমন ফল।

উর্দু প্রবাদ

উর্দুতে প্রবাদকে 'মোহাওড়া' ও 'জম্বুল মিশ্ল' বলা হয়।

১. উর্দু : আপ রুচি খানা পর রুচি পরনা।
বাংলা : নিজের রুচিতে খাও পরের রুচিতে সাজ।

২. উর্দু : বড়ী বহু কো বুলায়ে জো খীর মেঁ নমক ডালে।
বাংলা : বড় বউই সর্বেসর্বা।

৩. উর্দু : চিরাগ তলে অন্ধেরা।
বাংলা : প্রদীপের তলায় অন্ধকার।

৪. উর্দু : ঘরকা বেদি লঙ্কা চাই।
বাংলা : ঘরের শত্রু বিভীষণ।

৫. উর্দু : নাচ না জানে অঙ্গন টেরা।
বাংলা : নাচ না জানলে উঠোন বাঁকা।

৬. উর্দু : দিনমে তারা গিননা।
বাংলা : দিনে তারা গোনা।

৭. উর্দু : আপ টো টোয়ট বাত তে টোয়ট।
বাংলা : আমি নিজেকে যেমন ভালবাসি, বাবাকেও তেমন ভালবাসি।

৮. উর্দু : আপ ভালা জগ ভালা।
বাংলা : নিজে ভাল তো জগৎ ভাল।

৯. উর্দু : জ্যায়সা করোগে ওয়স্যা পায়োগে।
বাংলা : যেমন করবে তেমন পাবে।

১০. উর্দু : জো জিতা ওহি সিকান্দার।
বাংলা : যে জয়ী, সে শক্তিশালী।

১১. উর্দু : আমকে আম গুঠলিও কী দাম।
বাংলা : রথ দেখা কলা বেচা।

হিন্দি প্রবাদ

হিন্দিতে প্রবাদকে মুহাবরা, লোকোক্তি, কহাবত, উপখান, কহনাবত বলা হয় এবং প্রবচনকে কহাবতেঁ বলা হয়।

১. হিন্দি : আগে হাথ পিছে পাত।
বাংলা : হৃত দরিদ্রের জীবন।

২. হিন্দি : আপ ভলা তো জগ ভলা।
বাংলা : নিজে ভাল তো জগৎ ভাল।

৩. হিন্দি : ভলা কা ভলা।
বাংলা : নিজে ভাল তো সব ভাল।

৪. হিন্দি : দুধ পুত কিসমৎ সে।
বাংলা : দুধ এবং শিশু অদৃষ্টনির্ভর।

৫. হিন্দি : মুঁহ মে রাম, বগল মে ছুরি।
বাংলা : মুখে মধু, ভেতরে ছুরি।

৬. হিন্দি : এক হাথ সে তালি নহী বজতী।
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

৭. হিন্দি : মুঁহ সে মীঠা, দিল সে তীতা (বিষ অর্থে)।
বাংলা : মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

৮. হিন্দি : খেতি কাইলিন জিয়ে লে, বেইলে বিকাই বিয়েলা।
বাংলা : চাষ করা বাঁচার জন্য, কিন্তু বীজের জন্য বলদ বিক্রি হয়ে যায়।

৯. হিন্দি : একে বিটিয়া বা আভে বহুরিয়া দেভানজি কাহাভে।
বাংলা : এক কন্যার তিন পরিচয় (বাপের ঘরে কন্যা, শ্বশুরের ঘরে বউ, শ্বশুরবাড়িতে ঘরণী)।

১০. হিন্দি : পরাধীন সপনেহু সুখ নাহী।
বাংলা : যে নির্ভরশীল সে সুখ জানে না।

ভোজপুরি প্রবাদ

ভোজপুরিতে প্রবাদকে বলে লোকোক্তি, কহাবত।

১. ভোজপুরি : আব্রে কি ভ্যায়নে বিয়াল সাগ্রো গাঁও মাটিয়ে লে ধাইল।
বাংলা : গরীবকে শোষণ করে অসহায় করে দেওয়া।

২. ভোজপুরি : আইলে গেইলে গর হালুকাইলে, পাইলে কাউল হালুক।
বাংলা : অতিপরিশ্রম করা ও পরিণামে ব্যর্থ হওয়া।

৩. ভোজপুরি : আপন দেকে বুরবাক বনকে।
বাংলা · তোমার সব কিছু দিয়ে তুমি বোকা বনেছ।

৪. ভোজপুরি : আপনা কি জুড়ে না, অক্কা কি দানি।
বাংলা : সমস্ত কিছু হারিয়ে বিরাট দাতা।

৫. ভোজপুরি : মধুরে আঁচে রোটি মিঠা।
বাংলা : অল্প আঁচে রুটি মিঠা।

৬. ভোজপুরি : তিনদিন কে ছোকরা হামে শিখাওয়াত বাত।
বাংলা : তিনদিনের বাচ্চা আমাকে শেখাচ্ছ কথা বলতে।

৭. ভোজপুরি : উনিশ বিশ তো ভৈলে চাহে।
বাংলা : প্রকৃতিতে দুটো জিনিস একরকম নয়।

৮. ভোজপুরী : সামাচুক ফির কা পচতানি।
বাংলা : যে সুযোগ হারিয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ কীসের?

৯. ভোজপুরি : চোর কা অঙ্গারি মিঠা।
বাংলা : চোরের কাছ কয়লাও মিঠে।

ওড়িয়া প্রবাদ

ওড়িয়াতে প্রবাদকে রুঢ়ি প্রয়োগ (Rudhi Proyog) বলে।

১. ওড়িয়া : পাণি পিইব ছানি পয়সা নেব গণি।
বাংলা : যা করবে ভেবে চিন্তে করবে।

২. ওড়িয়া : ধীর পাণি পাথর কাটি।
বাংলা : যারা ধীর স্থির তারাই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়।

৩. ওড়িয়া : মূল জীব সরি দেবঙ্ক সঙ্গে কিম্‌পা করি।
বাংলা : উচ্ছেদ করলে সব কিছু নিরাময় হয়।

৪. ওড়িয়া : সুন্দর তৃপ্তির অবসাদ নাহি যেতে দেখু থিলে নোয়া দিসু খাই।
বাংলা : সুন্দর বস্তু চির আনন্দের হয়।

৫. ওড়িয়া : দূর পাহাড় সুন্দর।
বাংলা : যেটা দেখতে পাচ্ছি না সেটা সবচেয়ে সবুজ এবং সুন্দর।

৬. ওড়িয়া : চক চক করিলা সোনা নহি।
বাংলা : চক চক করলেই সোনা হয় না।

৭. ওড়িয়া : গা কনিয়া সিংহানী নাকি।
বাংলা : ঘরের জিনিসের মূল্য নেই।

৮. ওড়িয়া : খাই শুইলে বড়ই আয়ু
খাই চালিলে বড়ই বায়ু
খাই বসিলে বড়ই পেট
খাই খাইলে যমের ভেট।

বাংলা : খেয়ে শুলে আয়ু বাড়বে
খেয়ে হাঁটলে বায়ু বাড়বে।
খেয়ে বসলে পেট বাড়বে
খাই খাই করলে মারা যাবে।

৯. ওড়িয়া : বসি খাইলে নই বালি সরে।
বাংলা : বসে খেলে সব শেষ।

১০. ওড়িয়া : বাটরে দেখিলি কমার,
লুহা পজেই দে আমার।
বাংলা : কাজের জন্য বেরোলে যার কাজ তাকে পথে দেখলে কাজ সেরে নেওয়া।

১১. ওড়িয়া : দীপ তলে অন্ধার।
বাংলা : আলোর নীচেই আঁধার।

১২. ওড়িয়া : হাথ অলসে নিস বঙ্কা।
বাংলা : অকর্মণ্য ব্যক্তি কেবল বসেই থাকে।

১৩. ওড়িয়া : সুঅ মুহরে পতর।
বাংলা : মানুষ ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল।

১৪. ওড়িয়া : যা পুঅকু সাপ কামুড়ে, তা মা পান দৌড়িকু ডরে।
বাংলা : দড়িকে দেখে মা-সতর্ক হওয়া।

১৫. ওড়িয়া : কাহি রাজা রামচন্দ্র, কাহি রামিয়া ভণ্ডারি।
বাংলা : এক নাম হলেও ব্যক্তি এক নয়।

১৬. ওড়িয়া : এ ঘর মাউসি সে ঘর পিউসী।
বাংলা : এদিকের কথা ওদিকে বলা।

১৭. ওড়িয়া : গা পরি মল ধোবা তু ঠারু।
বাংলা . পরিচ্ছন্নতা ধোপাই জানে।

১৮. ওড়িয়া : তুলসি দুই পত্রর রু বাসে, বিছু আতি দুই পত্ররু পুণ্ডাই।
বাংলা : সকালই বলে দেয় সারাদিন কেমন কাটবে।

১৯. ওড়িয়া : বড়কু উত্তর নাহি, স্বর্গকু নিসুনি নাহি।
বাংলা : ধনী ব্যক্তির কিছু বলা স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙার মত অসম্ভব ব্যাপার।

২০. ওড়িয়া : যে দেশ যাই সে ফল খাই।
বাংলা : যস্মিন দেশে যদাচার।

২১. ওড়িয়া : দেশকে ফাঙ্ক নইকে বাঙ্ক।
বাংলা : সব দেশ সমান নয়।

২২. ওড়িয়া : তিন্নি তুণ্ডলরে ছেনি কুকুর।
বাংলা : লোকের কথায় বিশ্বাস করা।

২৩. ওড়িয়া : পাথরে শুয়ে, কানরে কুহে,
তা কথা কি অন্যথা হবে।
বাংলা : ফিস ফিস কথার সত্যতা বিচার।

২৪. ওড়িয়া : চালুনি কহে ছুচনচি কি, তো পছরে গোটিয়ে কনা।
বাংলা : চালুনি বলে ছুঁচকে তোর পিছনে কেন ছ্যাঁদা।

অর্থাৎ যার অনেক দোষ আছে সে অপরের দোষ দেখে বেড়ায়।

২৫. ওড়িয়া : গোটে হাতে তালি বাজে নাহি।
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

২৬. ওড়িয়া : বিষ কম্ভব পয়োমুখম্।
বাংলা : মুখে মধু অন্তরে বিষ।

২৭. ওড়িয়া : বাহা সরিলে বেদির মুহপুরু।
বাংলা : মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

অসমিয়া প্রবাদ

অসমের 'যোজনা ফক্‌রা' প্রবাদ-প্রবচনের সাদৃশ্যধর্মী। অসমে ডাকের বচনই প্রবাদ হিসেবে পরিচিত। তবে কৃষিবিষয়ক ডাকের বচনই বেশি প্রচলিত। অসমিয়া প্রবাদে ব্যঙ্গ রসিকতা, নীতিকথা আছে। অসমিয়া প্রবাদের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল :

১. অসমিয়া : ৰজা নাই পাটত
ধৰি কিলায় বাটত।
বাংলা : পেটে বিদ্যা নেই
কিন্তু বাইরে খুব দেমাক।

২. অসমিয়া : গ্যাত নাই ছাল-বাকলি
মদ খাই তিন টেকেলি ॥
বাংলা : শরীর পুষ্ট নয়
কিন্তু তিনবেলা মদ চাই।

৩. অসমিয়া : মেলত থাকি নকয় উচিত
পাপে পায় কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
বাংলা : যে সকলের সামনে উচিত কথা বলে না, সেই পাপী।

৪. অসমিয়া : তেলীৰ মুৰত তেল।
বাংলা : তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৫. অসমিয়া : বুক ফাটে,
মুখ নুফুটে।
বাংলা : বুক ফাটে,
মুখ ফোটে না।

৬. অসমিয়া : সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ি সীতা কার বাপ
বাংলা : বোকার মত প্রশ্ন করা অজ্ঞতার লক্ষণ।

৭. অসমিয়া : ভীষ্মৰ প্রতিজ্ঞা।
বাংলা : কঠিন প্রতিজ্ঞা বা অটল সঙ্কল্প।

৮. অসমিয়া : দানে দুর্গতি খণ্ডায়।
বাংলা : দান করলে দুঃখ নাশ হয়।

৯. অসমিয়া : আপুনি আপোনাৰ শত্রু।
বাংলা : মানুষ নিজের দোষেই নিজের শত্রু হয়।

১০. অসমিয়া : লক্ষীৰ বৰপুত্র।
বাংলা : ধনীব্যক্তি।

তামিল প্রবাদ

তামিল ভাষায় প্রবাদকে 'ভাষানম্' বলে।

১. তামিল: পণ্ম এণ্ড্রালু, পিণমুম্ রায় তিরক্কুম।
বাংলা: টাকার কথা শুনলে মড়াও হাঁ করে।

২. তামিল: অহল ইরুন্দাল্ নিহাল উররু, কিট্টবন্দাল্ মুট্টপ্প হাই
বাংলা: দূরে থাকলে গলাগলি, কাছে থাকলে চুলোচুলি।

৩ তামিল: পাম্বুক-প্-পাল্ বার্ত্তালুম্
অদুর রিষন্দান্ কক্কুম্।
বাংলা: সাপকে দুধ খাওয়ালে
সে উগরে বিষই ঢালে।

৪. তামিল: মল্লান্দু পডুত্তু-ক্-কোণ্ডু
মার্বিল্ উর্মিল্ন্দু কোণ্ডার্পোল্।
বাংলা: চিত হয়ে শুয়ে থুথু দিলে নিজের গায়েই পড়ে।

৫. তামিল: পেট্ট তায় মুদেরী,
পুছন্দ তারম্ শ্রীদেবি।
বাংলা: গর্ভধারিণী অলক্ষ্মী,
নতুন বৌ মালক্ষ্মী।

৬. তামিল: অহত্তিন্-দ্-দেয়র্মে তুণাই।
বাংলা: অগতির গতি ভগবান।

৭. তামিল: অগ্রহারত্তিল্ পিরন্দালুম্ অডক্কম্ শুজুকাড়ু তান্।
বাংলা: শ্মশানই শেষ আশ্রয়।

৮. তামিল: ইল্লরমে লল্লরম।
বাংলা: সংসারই সেরা ধর্ম।

৯. তামিল: উদট্রিলে উরবু, নেঞ্জিলে পহাই।
বাংলা: মুখে মধু হৃদে বিষ।

১০. তামিল: অহম্বারম্ পেরুম্বারম্।
বাংলা: অহংকার পতনের কারণ।

১১. তামিল: অণিয়েল্লাম্ আডয়িন্ পিন্।*
বাংলা: কাপড় আগে অলংকার পরে।

তেলুগু প্রবাদ

তেলুগুতে প্রবাদকে 'সমীটা' বলা হয়।

১. তেলুগু : গতে তল্লী, এড্ডে তল্লী।
বাংলা : যার ঘরে ধান আছে তার খুব দেমাক।

২. তেলুগু : নাগলি উন্ন উরু আকনি চেরদু।
বাংলা : কৃষিই জীবনের উপায়।

৩. তেলুগু : বান লুণ্টে পন্টলু,
লে কুণ্টে মন্টলু।
বাংলা : যেমন বৃষ্টি হয়,
তেমন ফসল হয়।

কন্নড় প্রবাদ

কন্নড় প্রবাদকে 'গাডের্গলু' বলা হয়। (গদায়ের্গলু)

১. কন্নড় : আক্কা সত্তরে আমাবাসে নির্লাদু,
আন্নাসত্তরে হুন্নামে নিললাদু।

হন্নুমে বড়ুয়া তানাকা আমাবাসে নিললাদু,
আমাবাসে বড়ুয়া তানাকা হুন্নামে নিললাদু ॥

বাংলা : অমাবস্যা-পূর্ণিমা কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

২. কন্নড় : আরাসনা কান্তা হা গায়িতু, বিট্টিমাডিচা হা গায়িতু।
বাংলা : এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

৩. কন্নড় : এডাভিডা কালু এডাউদু হেচ্চু।
বাংলা : দুর্ভাগ্য একলা আসে না।

৪. কন্নড় : আতি আসে গাতি কেড়ু।
বাংলা : আশাভঙ্গ হওয়া।

৫. কন্নড় : কুনিয়ালিকে তিলিয়া দিদ্দারে আঙ্গারা ওরে।
বাংলা : নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।

৬. কন্নড় : কুম্বা আরনিগে ওরুসা দন্যে গে নিমিসা।
বাংলা : মাটির পাত্র গড়া যেমন কঠিন, ভাঙা তেমন সহজ।

৭. কন্নড় : আডিগে মাত্তালিকে টিলিয়া দাওয়ালু।
বাংলা : রান্না করতে না জানলে উনুনের (আগুনের) দোষ।

৮. কন্নড় : শিট্টু তানাগে কেড়ু সামাধান পাররিগে কেরু।
বাংলা : ক্রোধ পরম শত্রু।

৯. কন্নড় : সুম্‌মা নিড্‌ডারে ওড়াম বাট্টা।
বাংলা : চুপ করে থাকা সবার জন্য ভাল।

১০. কন্নড় : হলে নিরু ওলেড়ু মশলে কেট্টা ড়ু।
বাংলা : পুকুরের জল ভাল, কুমির ভাল নয়।

১১. কন্নড় : কুনিয়ালিকে তিলিয়া দিদ্দারে আঙ্গারা ওরে
আডিগে মাত্তালিকে টিলিয়া দাওয়ালু ওলে এল্লু দুরিদানু
এলে ইয়ালারাডা এত্তু মিনিয়া মেলে বিত্তু।
বাংলা : অকর্মণ্য লোক সব কিছুর সঙ্গেই ঝগড়া করে।

১২. কন্নড় : নুদি গিনথা নাদেইয়া মেল্লু।
বাংলা : শব্দের চেয়ে কাজ কথা বলে বেশি।

১৩. কন্নড় : হোলে যুভুখেলা হোন্নালা।
বাংলা : চকচক করলেই সোনা হয় না।

১৪. কন্নড় : সমভাষনায়ে গালেলা ভাদাভে আত্তি কেটাহু।
বাংলা : তর্কাতর্কি বিবাদের মূল।

১৫. কন্নড় : জীভানা আলপাকালিকা,
কাল্লেয়ি ধিরাগাকাল্লুকা।
বাংলা : জীবন স্বল্পস্থায়ী,
কিন্তু জ্ঞান অনন্ত।

১৬. কন্নড় : নিগাভাহোয়া সৌনদারযা ভিরুভুডায়ে মাক্‌মালা হ্রদয়া ডাল্লি।
বাংলা : অন্তরের সৌন্দর্যই জীবনের শুদ্ধতা।

১৭. কন্নড় : সোন্দর আভেয়ি শক্তি, মুগলঙ্গে আদারা কাথি।
বাংলা : সৌন্দর্যই শক্তি, হাসি তার অস্ত্র।

১৮. কন্নড় : অনুমানভেয়ি জ্ঞানোয়া মূলা।
বাংলা : সন্দেহ জ্ঞানের উৎস।

১৯. কন্নড় : শ্রেষ্ঠ ভাদুদাকেয়ি আপায়েক্ষি, আত্তি কেটাডাকেয়ি সিদ্ধাভাগিরি।
বাংলা : শ্রেষ্ঠ আশা করলে খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

২০. কন্নড় : হাক্কি জান্নু আদারা ওভিনি এনোয়া মানুক্ষা নান্নু আভানা মাথিনিনডা গুরু থি সুথা থাবেয়ি।
বাংলা : পাখি বোঝা যায় গানে,
মানুষ চেনা যায় কথনে।

২১. কন্নড় : মিঞ্চি হোডা কারিয়াকেয়ি চিনটিসি ফাল ভিল্লা।
বাংলা : গতস্য শোচনা নাস্তি।

২২. কন্নড় : উত্তমা সাওহানেয়ি এনথেনড়ু নাশাভাগুভুড়িল্লু।
বাংলা : ভাল কাজ কখনও হারায় না।

২৩. কন্নড় : নাল্লেয়ি ইনবুধু হাল্লু।
বাংলা : আগামী সুদিন কখনও আসে না।

২৪. কন্নড় : কাল্লিকায়েয়ি বের্রু কাহিয়াগিধারু বিদুভা হাল্লু সিহি।
বাংলা : জ্ঞানের উৎস করুণ, কিন্তু ফল মধুর।

২৫. কন্নড় : অনুভব ভিল্লাদা কালিকায়েয়ি জিনথা কালিয়াদাযে পাদেধা অনুভব মেল্লু।
বাংলা : জ্ঞান বিনা অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা বিনা জ্ঞানের চেয়ে ভাল।

২৬. কন্নড় : স্নেহিথা নিল্লাডা জীভান সায়ু ভাগা পাকাদাইয়ারু এল্লা ভামথায়ে।
বাংলা : বন্ধুবিহীন জীবন যেন সাক্ষীবিহীন মৃত্যু।

মালয়ালম প্রবাদ

মালয়ালম প্রবাদকে বলা হয় 'পালাজোলে'।

১. মালয়ালম : অধিক ময়লে অম্রুতম বিষম্।
বাংলা : অতিরিক্ত কিছু ভাল নয় অর্থাৎ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

২. মালয়ালম : আদি আস্সা গাতি কেদু।
বাংলা : সব কিছু আশা করলে সব কিছু হারানো।

৩. মালয়ালম : ছোটেয়ালা ছিলুম ছোডাই ভারে।
বাংলা . পুরানো অভ্যাস কখনও মরে না।

৪. মালয়ালম : আকোরে নিনাল একোরে পাছা,
একোরে নিনাল আকোরে পাছা।
বাংলা : যা দেখিনি তার চেয়ে যা পেয়েছি তা-ই সুন্দর।

৫. মালয়ালম : আগুভারে ইরানাল অরুমবারে ইরিক্যানাম্।
বাংলা : পরিশ্রম করো ও অপেক্ষা করতে শেখো।

৬. মালয়ালম : মিনুদ্দেলাম্ পোন্নাললা।
বাংলা : চক্চক্ করলেই সোনা হয় না।

৭. মালয়ালম : মানসুন্দেগিল মারগাম উন্দা।
বাংলা : ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় না।

৮. মালয়ালম : অকাক্কান্নু টুরাপ্পিক্কান, অসন বাল্যাট্টিলেট্ট নম্।
বাংলা : গুরুই চক্ষুদাতা।

৯. মালয়ালম : ভাল্লভানু পুল্লুময়ুধাম।
বাংলা : বিচক্ষণের হাতের ঘাস খড়্গের মতো।

১০. মালয়ালম : অকাল্যেউল্লা বন্ধুভিনেক্কাল, অটট্টুল্লা সাট্টু নাল্লু।
বাংলা : কাছের শত্রু দূরের বন্ধুর চেয়ে ভাল।

১১. মালয়ালম: বিদ্যায়িল নিন্নুম ভিনায়ম্।
বাংলা : বিদ্যা বিনয় দান করে।

১২. মালয়ালম : মার‍্যাদাক্কারনুম মার‍্যাদাক্কারনুম মুন্নু ভাজি
মার‍্যাদাক্কারনুম টেম্মাটিক্কুম রন্টু ভাজি
টেম্মাটিক্কুম টেম্মাটিকুম অরুভাজি।
বাংলা : দুজন ভদ্রলোকের মিলন হলে তিনটি পথের দিশা হয়, একজন দস্যু আর এক দস্যুর মিলনে একটি পথের সন্ধান হয়।

মারাঠি প্রবাদ

মারাঠিতে প্রবাদকে 'মহন' ও 'আণা' বলা হয়।

১. মারাঠি : কিতিহি কেলতরী পারসালা পানে তিনচ।
বাংলা : যতই কারও জন্য করো, যে যেরকম সে সেরকমই থাকবে।

২. মারাঠি : ভাজলা পাপাড় মোরতা ইয়েতনাহি।
বাংলা : কিছুই করতে না পারা।

৩. মারাঠি : আন্ধারয়াত কানা রাজা।
বাংলা : অন্ধের চেয়ে এক চোখ কানা লোকই বেশি ভাল।

৪. মারাঠি : নাচতা এয়িনা আঙ্গনা ভোকরা।
বাংলা : নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।

৫. মারাঠি : দিসতে তসনস্ত মহ্নুন যোগ ফাসতো।
বাংলা : যে রকম দেখতে লাগে সেরকম না হওয়ায় ফাসে বেশি।

৬. মারাঠি : অতি সাহানা ত্যাচা বায়েন রিকামা।
বাংলা : অতি চালাকেরা বোকা হয় অর্থাৎ অতি চালাকের গলায় দড়ি।

৭. মারাঠি : একা হাতানে টালি বাজত নাহী।
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

৮. মারাঠি : ধর্মাকি গয়া কাস্তা খায়া।
বাংলা : দানের গরু কাঁটা খায়।

৯. মারাঠি : দীস্ মাধে ইয়ে রাদে।
বাংলা : মৃতদেহ দেখলেই চোখে জল আসে।

১০. মারাঠি : ডোগুা ভাদেলা।
বাংলা :. ধনী আরও ধনী হতে চায়।

১১. মারাঠি : মানা রাজা মানা প্রজা।
বাংলা : মনই রাজা মনই প্রজা।

১২. মারাঠি : অঙ্গনাভারুনা ঘারকি কলা।
বাংলা : উঠান দেখেই ঘর বোঝা যায়।
(যেমন মুখ দেখে মানুষ চেনা যায়।)

পঞ্জাবি প্রবাদ

পঞ্জাবিতে প্রবাদকে 'কহাবত' বলে।

১. পঞ্জাবি : পঞ্জাব দে জওয়ান তে শের দি সান্‌তন ইক ব্রেবার।
বাংলা : পঞ্জাবের যুবক সিংহের বাচ্চা।

২. পঞ্জাবি : কাচ্চি সোনে দি পাচ্চাহি।
বাংলা : নদীতীরের জমি যেন সোনার খনি।

৩. পঞ্জাবি : জো গর্জে সো ভসদা নাহিন।
বাংলা : যত গর্জে তত বর্ষে না।

৪. পঞ্জাবি : গোল্লা হোকে কামাক্‌,
রাজা হোকে খায়ে।
বাংলা : যে দাসের মত কাজ করে
সে রাজার মতো খায়।

৫. পঞ্জাবি : জিতনি গোড়ি ইতনি দোদি।
বাংলা : যত চাষ তত ফল।

৬. পঞ্জাবি : পা পাকে পিছন ওয়া, স্যোন চাহে তে দোহর লাহা।
বাংলা : খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়ে, বসে খাটায় অর্ধেক পায়ে।

৭. পঞ্জাবি : শাখনা ভাণ্ডা বহুন খারখে।
বাংলা : শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি।

৮. পঞ্জাবি : ইক্‌ গন্দি মান্থহি সারে জাই নু গন্দা কর দি হাই।
বাংলা : দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

৯. পঞ্জাবি : আগ বিনা ধুন কিথে।
বাংলা : আগুন বিনা ধোঁয়া বৃথা।

১০. পঞ্জাবি : দূর দে ধোল সুহাভেনে।
বাংলা : দূরের শব্দ মধুর হয়।

গুজরাতি প্রবাদ

গুজরাতি প্রবাদকে ‘কহেওয়ত’ বলে।

১. গুজরাতি : জেবু বাবো তেধু লণো।
বাংলা : যেমন কর্ম তেমন ফল।

২. গুজরাতি : ডুবতো মানস তণখলুঁ পবাড়ে।
বাংলা : ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়।

৩. গুজরাতি : দুনগারা দুরথী রলিয়ামণা।
বাংলা : দূরের পাহাড় সুন্দর দেখায়।

৪. গুজরাতি : দুধনো দাঝেলো ছাশ ফুঁকীনে পীবে।
বাংলা : ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

৫. গুজরাতি : কমলো হোয় তেনে পীলুঁ দেখায়।
বাংলা : জন্ডিস রোগী সব কিছু হলদে দেখে।

৬. গুজরাতি : জেবা সাথে তেবা।
বাংলা : ঢিল ছুড়লে পাটকেলটি খেতে হয়।

৭. গুজরাতি : আঙলী আপো তে পহোঁচো পবাড়ে।
বাংলা : এক ইঞ্চি জমি দিলে এক গজ নিতে চায়।

৮. গুজরাতি : ধীরজনাঁ ফল মীঠং।
বাংলা : সবুরে মেওয়া ফলে।

৯. গুজরাতি : হবা মাঁ কিল্লা বাঁধবা।
বাংলা : আকাশ কুসুম কল্পনা করা।

১০. গুজরাতি : মন হোয় তো মালবে জবায়।
বাংলা : ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

১১. গুজরাতি : গরজ সরী (মটী) এট্‌লে বৈদ বেরী।
বাংলা : বিপদ কাটলে ঈশ্বরের নাম করে না।

১২. গুজরাতি : এক হাতে তালী ন পড়ে।
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

১৩. গুজরাতি : ঝাঝী সুরালী বস্তর বেঠে।
বাংলা : অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

১৪. গুজরাতি : খীলা চণো বাগে ঘণো।
বাংলা : শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি।

১৫. গুজরাতি : খালে ডুচা অনে দরবাজা মোকলে।
বাংলা : এক পয়সার জন্য কার্পণ্য, কিন্তু অন্যদিকে বহু টাকা খরচ হয়।

১৬. গুজরাতি : অতি লোভ সে পাপনুঁ মুল।
বাংলা : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

১৭. গুজরাতি : চীনমাঁ চা বেচবা জবুঁ।
বাংলা : তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

১৮. গুজরাতি : চোর চোরে মাসিয়াই ভাই।
বাংলা : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

রাজস্থানি প্রবাদ

রাজস্থানি প্রবাদকে বলা হয় 'ওখানী' এবং 'কহাবত'।

১. রাজস্থানি : জোবনিয়া তুঁ ভলাঁ হী জাজ্যো
তুমও জাজ্যো টহরকা।
বাংলা : যৌবন ক্ষণস্থায়ী,
কিন্তু রূপ চিরস্থায়ী।

২. রাজস্থানি : কালী কয়াঁ হী ঠীঁকে অর গোরী কয়াঁ হী ঠীঁকে।
বাংলা : সুন্দরের জয় সর্বত্র।

৩. রাজস্থানি : ভরী জবানী পইসো পল্লৈ,
রাম চলাবৈ তো সীধো চল্লৈ।

বাংলা : অল্প বয়সে টাকা হাতে পড়লে
মাথা ঠিক রাখা কঠিন।

৪. রাজস্থানি : বহু কন্নাঙ্গু চোর মরাঁরৈ চোর বহুরা ভাঈ।
বাংলা : বউকে দিয়ে শালাকে মারা।

৫. রাজস্থানি : এক কে ডাণ্ড সে সৌ কে সাভাই ভাল।
বাংলা : স্বল্প লাভে পুঁজি বাড়ে।

৬. রাজস্থানি : সমর পার‍্যো সো লুম।
বাংলা : সম্বর হ্রদে যা পড়ুক সবই লবণ।

৭. রাজস্থানি : বামন হাথি চার‍্যোন ভি মঙ্গ।
বাংলা : বামন হাতি চড়লেও ভিক্ষা করে।

৮. রাজস্থানি : গাঁও কো দান, গঙ্গা কি অসনন্।
বাংলা : গ্রহণের দান গঙ্গার স্নান।

৯. রাজস্থানি : আম্মার রাচ্যো, মেহ মচ্যো।
বাংলা : সিঁদুরে মেঘ বৃষ্টির লক্ষণ।

কাশ্মীরি প্রবাদ

কাশ্মীরি ভাষাকে 'কোসের' বলা হয়। কাশ্মীরিতে প্রবাদকে 'কাহাওয়াত' (কহাবত) বলে।

১. কাশ্মীরি : Chheli Chheli zun z ñlum.
বাংলা : দুষ্টের মতিগতি বোঝা মুশকিল।

২. কাশ্মীরি : Dána dushman chhui nádán metharah sandih khutak ján.
বাংলা : মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বিজ্ঞ শত্রু ভাল।

৩. কাশ্মীরি : Gabih buthih rúmah-hún.
বাংলা : ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে।

৪. কাশ্মীরি : Namedánam chuí rahat-i-jánam.
বাংলা : অজ্ঞতাই শান্তি।

৫. কাশ্মীরি : Shekhek bahi kálah sahih, pagah nahın.
বাংলা : চঞ্চলমতি মানুষ।

৬. কাশ্মীরি : Sheth gav zih braeth gav.
বাংলা : ষাট বছর হলে বোকা হয়।

৭. কাশ্মীরি : Sunur nai Sunah tsúr karih táh káts gatshés.
বাংলা : স্বর্ণকাব মায়ের গয়নার সোনাও চুরি করে।

৮. কাশ্মীরি : Shistrash Sueti chhul sistar phatán.
বাংলা : শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

কোঙ্কনী প্রবাদ

১. কোঙ্কনী : কাণ্ডুল্যা বগর ফোর ন্ হয় নী মারল্যা বগর ঘোর ন্ হয়।
বাংলা : ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে।

২. কোঙ্কনী : অণ্ণা পৈলেং পীট সুব্বায় পৈলেং মীট।
বাংলা : দূরের জিনিস মরীচিকা।

৩. কোঙ্কনী : জাবয়াঙ্ক দিল্লেলেঁ, রেবেন্তু মুত্তিলেঁ সম।
বাংলা : জামাই সব সময় হাত পাতে।

৪. কোঙ্কনী : ঘরাত ঘ্যালারি পিকনা, আঙ্গন্তি র্হেল্যারি বিকনা।
বাংলা : মাকাল ফলে কোনও কাজ হয় না।

সিন্ধি প্রবাদ

১. সিন্ধি : Honey ın his mouth and a knife in his heart.
বাংলা : মুখে মধু ভেতরে (অন্তরে) ছুরি।

২. সিন্ধি : One hand can not clap.
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

পার্সি প্রবাদ

১. পার্সি : অকুইলান পেয়ারাভি আই্ তনুকত ন কুন্নান্ড।
বাংলা : বিদ্বানের কোনও পরিচয় লাগে না।

২. পার্সি : বেদায়ব, বে-নাসিব: বা-আদব বা-নাসিব।
বাংলা : বেয়াদপ দুর্ভাগা, সুস্বভাব যার ভাগ্য হাসে তার।

৩. পার্সি : চোশম্-ই-মা রাউশান, দিল-ই-মা খুশ।
বাংলা : চোখের আলো মনের আলো।

৪. পার্সি : দিভানাহ্ বকর-ই খুদ হুশায়র।
বাংলা : জাতে মাতাল তালে ঠিক।

৫. পার্সি : এভাজ মাভাজ গিলা না দরদ।
বাংলা : গতস্য শোচনা নাস্তি (যা গত হয়েছে তার জন্য অনুশোচনা কোরো না।)

চাকমা প্রবাদ

চাকমারা হল পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম উপজাতি। চাকমা ভাষায় প্রবাদকে 'দামরকদা' বলা হয়। চাকমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে চাকমা সমাজে প্রচলিত অজস্র প্রবাদ। কিছু প্রবাদের উদাহরণ তুলে ধরা হল:

১. চাকমা : নাবিত্ দেলে নক্কুনি বাড়ে।
বাংলা : নাপিত দেখলে নখের কোণা বাড়ে।

২. চাকমা : অহ্ লিবে কায্য নাঝা।
বাংলা : অবহেলায় কার্য নষ্ট।

৩. চাকমা : ঘঙদা ভিদিরে কঙদা।
বাংলা : ঘোমটার ভিতরে খেম্‌টা নাচ্।

৪. চাকমা : সাদ্ অঝায় পুআ মরে।
বাংলা : অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৫. চাকমা : সাত বাঙালে এক দেই,
বারে নিলে, পুদে নেই।
বাংলা : সাত কামলার একখানা দা।

৬. চাকমা : এক তুলে ক্ষেদে,
এক তুলে পুদে।
বাংলা : চাষির ক্ষেত আর পুত সম্বল।

৭. চাকমা : দশর লাড়ি একর পোঁঝা।
বাংলা : দশের লাঠি একের বোঝা।

৮. চাকমা : দুঃখ্ খর্ রাইত ন ফুরায়।
বাংলা : দুঃখের রাত্রির শেষ নেই।

৯. চাকমা : এক্ ত্তো যায়,
লেচ্ছান থায়।
বাংলা : দিন যায় কথা থাকে।

১০. চাকমা : চুরঅ নাঙে চুর্ থায়,
বৈঙঅ নাঙে বৈঙ থায়।
বাংলা : শকুনির চোখ সব সময় পাহাড়ের দিকে।'

১১. চাকমা : পর অ কদাত্ কান্ ন দ্য
অল্প খেয়া সজাগে র‍্যা।
বাংলা : পরের কথায় কান দিও না
অল্প খেয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

১২. চাকমা : দূর অ কুদুম ফুল বাস
কায় অ কুদুম চিনদা বাস।
বাংলা : দূরের কুটুম ফুলের বাস,
কাছের কুটুম চিমসে বাস।

১৩. চাকমা : যোগ অ ভাগ্যে ধন
পুরুষ অ ভাগ্যে জন।

বাংলা : স্ত্রীর ভাগ্যে ধন
পুরুষ ভাগ্যে জন।

১৪. চাকমা : পদত পেলুং কামার
দ্য গড়েই দে আমার।
বাংলা : পথে পেলাম কামার
দা গড়ে দে আমার।

১৫. চাকমা : গোজেন যদি কই দে
ঘরত আনি বই দে।
বাংলা : গোজেন যদি ইচ্ছা করেন
ঘরে এসে পৌঁছে দেন।

অর্থাৎ ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

১৬. চাকমা : যে কুকুরের লেজ বেঙা
চুমাত ভরেলেও উজ্‌ন ন অয়।
বাংলা: যে কুকুরের লেজ বাঁকা
হাজার চুমুতেও সোজা হবে না।

১৭. চাকমা : জাদি বিদ্যা জাদিয়ে ন ছাড়ে
মাছে ন ছাড়ে কেই,
মোনালই মুড়েলেও কুত্তা
তবু ন ছাড়ে ছেই।[৮]
বাংলা : জাদি বিদ্যা জাদি ছাড়ে না,
মাছে ছাড়ে না আঁশ,
সোনা দিয়া মুড়লেও কুকুর
ছাড়ে না কখনও ছাই।

আদিবাসী প্রবাদ

ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের মধ্যে প্রবাদ 'দাঁতকথা', 'কথা' নামে পরিচিত। ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল-কুর্মি-কামার-মুচি আদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতিগত বৈশিষ্ট্য, বিচিত্র রীতি ও সংস্কার, আচার-আচরণ প্রবাদে স্থান লাভ করেছে। নীচে এদের প্রবাদের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল:

১. আদিবাসী : বুঢাল না বাউনাল।
বাংলা : তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার।

২. আদিবাসী : ভাদর পিতা বরদ (বলদ) আঘন পিতা মরদ।
বাংলা : যে বলদ ভাদ্রমাসে কাজে লাগে না, যে পুরুষ অগ্রহায়ণ মাসে কাজে লাগে না উভয়ই সমান।

৩. আদিবাসী লদী ধারে চাষ মিছা কর আশ।
বাংলা : নদীর ধারে চাষ করা আর ধানের আশা করা মিথ্যে।

৪. আদিবাসী : সিং সরু নেজ মোটা, এমন গরু কিনিস না বেটা।
বাংলা : যে গরুর শিং সরু লেজটা মোটা তেমন গরু কেনাই বৃথা।

৫. আদিবাসী ঢোল বাজাবি পয়সা লিবি।
বাংলা : ফেল করি মাখ তেল।

৬. আদিবাসী লোধা পাড়ায় লবঙ্গ বিক্রি।
বাংলা : উলু বনে চাষ।

৭. আদিবাসী : আদা আনতে মুড়িই ফাঁক।
বাংলা : নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

৮. আদিবাসী : এক হাতে মাদল বাজে না।
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

৯. আদিবাসী : কান টানলেই মুড় আসে।
বাংলা : কান টানলে মাথা আসে।

১০. আদিবাসী : বারমাসে তের চাষ, কবে কাটাবি গড়ার আস।
বাংলা : বারোমাসে তেরোটি চাষ করেও চাষিদের দুর্দশা ঘোচে না। আউস ধানের প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়।

১১. আদিবাসী : অভাগ্যা বরষার কাল, হরিণা চাটে গাছের ছাল।*
বাংলা : বর্ষায় মানুষের আকাল, হরিণ খাবার না পেয়ে গাছের ছাল চাটে।

সাঁওতালি প্রবাদ

সাঁওতালিতে প্রবাদকে 'মেন কাথা' এবং প্রবচনকে 'ভেনতা কাথা' বলা হয়। নীচে কয়েকটি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া হল:

১. সাঁওতালি : অক লেকাম য়ের্‌আ, অনা লেকাম ইর্‌আ।
বাংলা : যেমন কর্ম তেমন ফল।

২. সাঁওতালি : অল খন দ থুতিগে সরেসা।
বাংলা : লেখার থেকে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ।

৩. সাঁওতালি : একেন ঠিলি দ সাড়েগেয়া।
বাংলা : খেপড়া ঢেঁকির শব্দ বেশি।

৪. সাঁওতালি : কাঁড়া হাপা দ মিৎ ছট্‌গেয় আদ্‌আ।
বাংলা : নেড়া একবারই বেলতলায় যায়।

৫. সাঁওতালি : চেতান রং ছং, ভিতরি ওঁদরভং।
বাংলা : চক চক করলেই সোনা হয় না।

৬. সাঁওতালি : জানুমতে জানুম গে সো হোয়োঃ আ।
বাংলা : কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

৭. সাঁওতালি : ঢিংকি বুঁটাম সেনঃ রেসে লোবোঃ খদেম জমা।
বাংলা : কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

৮. সাঁওতালি : দাকা খান কীহু, টাকা খান বীহু।
বাংলা : ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

৯. সাঁওতালি : মিৎ ধারেতে পিঠা দ বাংইসিনঃ আ।
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

১০. সাঁওতালি: সাহাও খানেম লাহাঃ আ।
বাংলা : যে সহে সে রহে।

১১. সাঁওতালি: সোজ্‌হে কাটুপ্‌তে গতম বাং রাকাবঃ আ, কঁড়বেৎ হোয়োঃ আ।
বাংলা : সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।

১২. সাঁওতালি: হাপা হঁ আলঅ রৌপুদঃ, বিঞ্‌ হঁ আলয় গুজুঃ।[১০]
বাংলা : সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না।

রাজবংশী প্রবাদ

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ভাষা প্রচলিত। রাজবংশী ভাষায় প্রবাদকে 'সিলুক' (siluk) এবং 'কোনোক' (Cōnŏk) বলা হয়।

১. রাজবংশী : কাউয়ার ভাসাত্‌ কোকিলের ছাও, জাত সোভাবে করে আও।
বাংলা : কাকের বাসায় কোকিলের ছা, যার ছা তার রা।

২. রাজবংশী : জাতে না ছারে জাতের পানি, হলদী না ছাড়ে অং
তিন ধোয়া দিলেও তাও না যায় সুক্‌টার গন্‌।
বাংলা : কয়লা ধুলেও যায় না ময়লা।

৩. রাজবংশী : খায় দায় পংখি, বনের ভিতি আংখি।
বাংলা : খাঁচার পাখি আকাশে উড়তে চায়।

৪. রাজবংশী : হাল নাই, হাতিয়ার নাই, লাংটিয়া সেপাই।
বাংলা : ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।

৫. রাজবংশী : ছাওয়া আছে প্যাটত্‌ হোইড্ডা কিনেছে হাটোত্‌।
বাংলা : অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করা।

৬. রাজবংশী : অকম্মা ভাতার সেজার দোসর, সেজাত্ করে খোসোর খোসোর।

বাংলা : অকর্মণ্য স্বামী সব সময়েই ঘুমায়।

৭. রাজবংশী : খরখর নারী, ঝরঝর ঝারি, চোরনফর, পরপর ঘর তাক হাতি দূরত্ সর্।

বাংলা: অসতী নারী, ফুটো কলসি, অসৎ চাকর, ভগ্নপ্রায় বাড়ি পরিত্যাজ্য।

৮. রাজবংশী : ছোট লোকের ছাওয়া যোদি অল্প বিষোই পায়,
চৌইদ্দ হাত পাগুরি পিন্ধি ছেঁয়ার ভিতি চায়।

বাংলা : সম্পদ বা ঐশ্বর্য মানুষকে বড় করে না।

৯. রাজবংশী : কালা বামণ, গোরা হাড়ি, খাটো মোচরমান, বড়ো বজ্জাতের তাড়ি।

বাংলা : কালো বামুন, গোরা হাড়ি, বেঁটে মুসলমান বদমাস হয়।

১০ রাজবংশী : যে দিন মারিবে হরি, কি করিবো ডাং নাড়ি।[১১]

বাংলা : মৃত্যু বড়লোককেও (কাউকে) ক্ষমা করে না।

এবারে বেশ কিছু প্রচলিত প্রবাদের তুলনামূলক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

১. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। (বাংলা)

ক. নাচ না জানে অঙ্গন টেরা। (উর্দু)

খ. নাচ না জানে আঙ্গন টেরা। (হিন্দি)

গ. চালি না জানি বাটর দোষ। (ওড়িয়া)

ঘ. নাচত এয়িনা আঙ্গন ভোকরা। (মারাঠি)

ঙ কুনিয়ালিকে তিনিয়া দিদ্দাকে আঙ্গার ওরে। (কন্নড়)

২. মুখে মধু অন্তরে বিষ। (বাংলা)

ক. বিষ কুম্ভম্ পয়োমুখম্। (সংস্কৃত)

খ. মুখমে মিঠা, দিল সে জহর। (হিন্দি)

গ. বিষ কুম্ভম্ পয়োমুখম্। (ওড়িয়া)

ঘ. উদট্টিলে উরবু, নেঞ্জিলে পহাই। (তামিল)

ঙ. বাই ইল্লাদি সিহি মান্নাভাল্লি কাহি। (কন্নড়)

চ. Honey in his mouth and a knife in heart. (সিন্ধি)

ছ. A dagger in his bosom, and politenes in his mouth. (English)

৩. এক হাতে তালি বাজে না। (বাংলা)

ক. এক হাথ সে তালি নাহিন বাজত। (হিন্দি)

খ. গোটে হাতে তালি বাজে নাহি। (ওড়িয়া)

গ. Can clapping in both hands. (তামিল)

ঘ. If you clap with one hand, will there be any sound? (তেলুগু)

ঙ: ওন্দু কাইয়ালি চাপালে টাট্টা লাগাদু। (কন্নড়)

চ. একা হাতালে টালি বাজত নাহী। (মারাঠি)

ছ. এক হাতে তালী ন পড়ে। (গুজরাতি)

জ. এক হাতে মাদল বাজে না। (ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী প্রবাদ)

ঝ. মিৎ ধারেতে পিঠা দ বাং ইসিনঃ আ। (সাঁওতালি)

ঞ. Doyih attah cheh wazam. (কাশ্মীরি)

ট. One hand cannot clap. (সিন্ধি)

৪. চকচক করলেই সোনা হয় না। (বাংলা)

ক. চকচক করলেই সোনা নহি। (ওড়িয়া)

খ. হোলে যুভুখেলা হোলাল্লা। (কন্নড়)

গ. মিনুন্দেলাম্ পোন্নাললা। (মালয়ালম)

ঘ. চেতান রং ছং, ভিতরি ওঁদরভং। (সাঁওতালি)

৫. সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ। (বাংলা)

সাতকাণ্ড রামায়ণ পঢ়ি সীতা কার বাপ। (অসমিয়া)

৬. শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি। (বাংলা)

ক. শাখনা ভাণ্ডা বহুন খারখে। (পঞ্জাবি)

খ. খালী চণো বাগে ঘণো। (গুজরাতি)

৭. ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। (বাংলা)

দুধনো দাঝেলা ছাশ ফুঁকীনে পীবে। (গুজরাতি)

৮. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। (বাংলা)

ক. ঝাঝী সুরানী বস্তর বেঠে। (গুজরাতি)

খ. সাদ্ অঝায় পুআ মরে। (চাকমা)

৯. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। (বাংলা)

অতি লোভ সে পাপনুঁ মূল। (গুজরাতি)

১০. ঢিল ছুড়লে পাটকেলটি খেতে হয়। (বাংলা)

জেবা সাথে তেবা। (গুজরাতি)

১১. দূরের পাহাড় সুন্দর দেখায়। (বাংলা)

ক. দূর পাহাড় সুন্দর। (ওড়িয়া)

খ. দুনগারা দুরথী রলিয়ামণা। (গুজরাতি)

১২. সূচ বলে চালুনিকে তোর পেছনে কেন ফুটো। (বাংলা)

ক. সূচ কয় চালুনীরে, তোর পিছে কেন ছেঁদা। (বাংলাদেশ)

খ. চালুনি কহে ছুচন কি, তো পছরে গোটিয়ে কনা। (ওড়িয়া)

১৩. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। (বাংলা)

চোর চোর মাসিয়াই ভাই। (গুজরাতি)

১৪. তেলা মাথায় তেল দেওয়া। (বাংলা)

ক. তেলীৰ মুৰত তেল। (অসমিয়া)

খ. চীনমাঁ চা বেচবা জবুঁ। (গুজরাতি)

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রবাদ ছাড়াও কিছু আন্তর্জাতিক প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাদের সমার্থক শব্দ হল: হিব্রুতে Mashal, ল্যাটিনে Provertio, ইংরেজিতে Proverb, গ্রিকে Paroemia, আরবিতে Mathal, স্প্যানিশে Refran এবং তুর্কিতে Alator Sozu.

প্রথমে কয়েকটি ইংরেজি, আমেরিকা, সিন্ধি ও আরবদেশের প্রবাদ এবং পরে একই রীতির প্রবাদ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই যে পাওয়া যায় কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

ইংরেজি প্রবাদ

১. ইংরেজি : To make a sharp knife blunt.
বাংলা : থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া।

২. ইংরেজি : A rolling stone gathers no moss.
বাংলা : যে চলে সে রহে।

৩. ইংরেজি : Half a loaf is better than none.
বাংলা : নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

৪. ইংরেজি : Haste makes waste.
বাংলা : চঞ্চলতা নষ্টের মূল।

৫. ইংরেজি : It takes two make a quarrel.
বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

৬. ইংরেজি : Misfortunes never come single.
বাংলা : দুরদৃষ্ট একলা আসে না।

৭. ইংরেজি : Money is power.
বাংলা : অর্থই শক্তি।

৮. ইংরেজি : Money is the root of all evil.
বাংলা : অর্থই অনর্থের মূল।

৯. ইংরেজি : A hand before and leaf behind.
বাংলা : হতদরিদ্রের জীবন।

১০. ইংরেজি : Good mind good find.
বাংলা : আপনি ভাল তো জগৎ ভাল।

১১. ইংরেজি : Good yields good.
বাংলা : আপনি ভাল তো সব ভাল।

১২. ইংরেজি : Milk and children depend on faith.
বাংলা : দুধ এবং শিশু অদৃষ্টনির্ভর।

১৩. ইংরেজি : A dagger in his bosom and politenes in his mouth.
বাংলা : মুখে মধু ভেতরে ছুরি।

১৪. ইংরেজি : To sharp knife blunt.
বাংলা : থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া।

১৫. ইংরেজি : All that glitters is not gold.
বাংলা : চক চক করলেই সোনা হয় না।

১৬. ইংরেজি : Too much of anything is bad.
বাংলা : অতিরিক্ত কিছু ভাল নয়।

১৭. ইংরেজি : Too many cooks spoil the broth.
বাংলা : অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

১৮. ইংরেজি : Too much familiarity breeds contempt.
বাংলা : অতি ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়।

১৯. ইংরেজি : Empty vessels sound much.
বাংলা : খালি কলসির আওয়াজ বেশি।

২০. ইংরেজি : What use in a cow that gives plenty of milk, if she kicks pail over.
বাংলা : যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও ভাল।

২১. ইংরেজি : Penny wise pound foolish.
বাংলা : বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।

আমেরিকান প্রবাদ

১ আমেরিকান : As dumb as an oyster.
বাংলা : শামুকের মতো নির্বাক।

২. আমেরিকান : Pation is the greatest of virtue in a wood's man.
বাংলা : ধৈর্যই পরম শক্তি।

৩. আমেরিকান . Dog will not eat dog.
বাংলা : কাকের মাংস কাক খায় না।

আরবি প্রবাদ

ক. আরবি : Yazda all aqlu bada farar issariq.
খ. বাংলা : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক রূপ

একই রীতির প্রবাদ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই যে পাওয়া যায় কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

১. বাংলা : নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল।

ক. ইংরেজি : Sometihng is better than nothing.
খ. Hindi : এক ভী মামা ন হোনে সে কানা মামা তো আচ্ছা হৈ।
গ. German : Lieber etwas als nichts.
ঘ. Latin : Eggs now are better than chicken tomorow.
ঙ. Persia : A sparrow in the hand is better than a crane in the air.
চ. Italy : A bird in the cage is worth a bird a large.

২. বাংলা : তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

ক. ইংরেজি : To carry coal to Newcastle.
খ. Hindi : সোনে পর সুহাগা চড়ানা।
গ. Welsh : To pour water into Severn.
ঘ. Asiatic : To carry blades to Damascus.
ঙ. Greek : To carry apples to Aleinous.
চ. America : To carry leaves to the wood.
ছ. Persia : To carry peppers to Hindustan.
জ. Welse : Sending salt to the saltpit.
ঝ. America : To pour water into Mississipi.[১২]

৩. বাংলা : দেওয়ালেরও কান আছে।

ক. ইংরেজি : Walls have ears.
খ. Hindi : দেওয়ালকে ভী কান্ হোতা হৈ।
গ. Latin : Nihil mihi intria parietes meos tutum.
ইংরেজি : Walls have ears.

ঘ. German : Die Waude haben ohren.

ঙ. Hungarian: A falnak füle van.

ইংরেজি : Walls have ears.

চ. Chinese : Er shu yu yuán.

ইংরেজি : Ears belong to wall.

ছ. Korean : Isoguwon.

ইংরেজি : Even the walls have ears.

জ. Japanese : Kabi ni mini (ari)

ইংরেজি : Walls have ears.

৪. বাংলা : ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

ক. ইংরেজি : A bird once wounded is affraid of a bow.

খ. Hindi : দুধ কা জলা ছাছ ভী ফুঁক কর পীতা হৈ।

গ. Chinese : Jin shu-shinjo.

ইংরেজি : A bird once wounded is affraid of a bow.

ঘ. Korean : Sanggungchijo kyõng kingmokira.

ইংরেজি : A bird hurt by an arrow is frightened even by a crooked twig.

ঙ. Japanese : Shokyu no tori wa kyohatsu ni otsu.

ইংরেজি : A bird wounded by an arrow will fall from a bang.

৫. বাংলা : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

ক. ইংরেজি : Set a thief to catch a thief.

খ. Hindi . চোর চোর মৌসেরে ভাই।

গ. Chinese : Wù yi lèî jû

ইংরেজি : Like attracts like.

ঘ. Japanese : Rui wa tomo wo (motte) atsumary/yobu.

ইংরেজি : Like collects/calls like.

ঙ. Korean : Yuryusangjong.

ইংরেজি : Like attracts like.

৬. বাংলা : সব সময়েরই শেষ আছে।

ক. ইংরেজি : Every flow has its ebb.
খ. Hindi : হার সময়কা অন্ত হোতা হৈ।
গ. German : Jede Flut hat ihre Ebbe.
ইংরেজি : Every flow has its ebb.
ঘ. Hungarian Minden husvetnak van bojtje.
ইংরেজি : Every easter has its fast.

৭. বাংলা : একটা কুকুর চেঁচালে সহস্র কুকুর চেঁচায়।

ক. ইংরেজি : If a dog barks at a shadow, a hundred (ten thousand) dogs will bark loudly.
খ. Hindi : এক কুত্তা ভুকনে সে সব কুত্তে ভুকতে হৈ।
গ. Latin : Unius dementia dementes efficit multos.
ইংরেজি : One fool makes many (or a hundred).
ঘ. German : Ein narr macht hunder/viel narren.
ইংরেজি : One fool makes many.
ঙ. Hungarian : Egy bolond szazat csinal.
ইংরেজি : One fool makes hundred.
চ. Chinese · Yi quan fei xing bai feisheng.
ইংরেজি : One dog barks at a shadow, a hundred dogs barks loudly.
ছ. Korean · Ilgyonpyehyong paekkyonp' hesong.
ইংরেজি : One dog barks at a shadow, a hundred dogs bark at a high voice.
জ. Japanese : Ikken katachi/kageni hoyureba hyakken koe ni hoyu.
ইংরেজি : One dog barks at an appearance/shadow, a hundred dogs at a high voice.

৮. বাংলা : মুখে মধু হৃদে বিষ।

ক. ইংরেজি : A honey tongue, a heart of gall.
খ. Hindi : মুঁহ সে মীঠা, দিল সে জহর।
গ. Latin : Mel in ore, fel in corde.
ইংরেজি : A honey tongue, a heart of gall
ঘ. German : Honig im munde und Galle im Herzen.
ঙ. Shijisugan : Zi zhi Tõng Jian.
ইংরেজি : Honey in his mouth but a knife/sword in his belly.
চ. Chinese : Kõu mi fu jiàn.
ইংরেজি : Honey [on the] toongue [but] a sward [in the] belly.
ছ. Korean : Kumilpokkom.
ইংরেজি : Honey [in the] mouth [but] a sward [in the] belly.
জ. Japanese : Kuchi ni mitsu ari, hara niken ari.
ইংরেজি : There is honey in the mouth [but a] sword in the belly.
ঝ. Lao : Meu teu sag bpag ten s:n.
ইংরেজি: Honey in the mouth, dagger in the bosom.
ঞ. Thai : Pag prasai hua djai tchüad ko.
ইংরেজি : The mouth speaks the heart cuts the throat.

৯. বাংলা : যেমন মনিব তেমন চাকর

ক. ইংরেজি : Like master, like man.
খ. Hindi : যথা রাজা তথা প্রজা।
গ. Latin : Qualis dominus, toils of servus.
ইংরেজি : Like master, like man.
ঘ. German : Wie der Herr, so's Gescherr.

ইংরেজি : Like master, like servant.

ঙ. Hungarian : Amilyen a szolge, olyan a gazda.

ইংরেজি : Like servant, like master.

১০. বাংলা: উলু বনে মুক্তা ছড়ানো।

ক. ইংরেজি : To cast pearls before swine.

খ. Hindi : অন্ধো কে শহর মে আইনা বেচনা।

গ. German : Man soll die perlen nicht vor die saue werfen.

ইংরেজি : One should not cast pearls before swine.

ঘ. Hungarian : Gyongyot nem szokas disznok ele dobni.

ইংরেজি : It is not customary to cast pearls before swine.

ঙ. Vietnamese: Dản gãy tai trâu.

ইংরেজি : One plays the guiter to the buffalo.

ছ. Burmese : Playing a harp before a buffalo.

১১. বাংলা : সময় এবং কালের স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না

ক. ইংরেজি : Time and tide wait for no man.

খ. Hindi : ওয়াক্ত কিসি কা ইন্তিজার নেহী করতা।

গ. German : Die Zeit warter auf niemand.

ইংরেজি : Time waits for nobody.

ঘ. Hungarian : Az idõ jár, senkire sem vár.

ইংরেজি : Time passes, waits for nobody.

ঙ. Shijitsugan : Tao Jián Za Shi Tõsen.

ইংরেজি : Years and months do not wait for man.

চ. Chinese : Sui yuè bú dai raen.

ইংরেজি : Years and months do not wait for man.

ছ. Korean · Sewõrún saramul kidoriji annunda.

ইংরেজি : Years and months do not wait for man.

জ. Japanese : Saigetsu hito wo matazi.

ইংরেজি : Years and months do not wait for man.

১২. বাংলা : এক হাতে তালি নহী বজতী।

ক. ইংরেজি: One hand stirs without the other.

খ. Hindi : এক হাত সে তালি নহী বজতী।

Kurdish : Deste t'eng t'ene deng je nae.

ইংরেজি : One cannot clap with one hand.

গ. Persian : Yek dast bi-sada ast.

ইংরেজি : One hand is without sound.

ঘ. Tajik : Az iak dast sado namebaroiad.

ইংরেজি : One cannot clap with one palm.

ঙ. Uzbek : Birkuldam tovush chikmaidi.

ইংরেজি : One hand claps, no sound.

চ. Pashto : Moving one hand makes no sound.

ছ. Armenian : One cannot clap with one hand.

জ. Osetian : With one hand one cannot clap.

ঝ. Mongolian : Water far off can't help if the throat is dry, two palms do not sound if they do not meet.

ঞ. Chinese : Gu zhang nan ming.

ইংরেজি : A single with one hand makes no noise.

ট. Korean : Kojang nanmyong.

ইংরেজি : One palm can hardly sound.

ঠ. Japanese : Kosho narashi gatashi.

ইংরেজি : One hand can hardly clap.

ড. Lao : Dto:b meu kang diaw bohda:ng.

ইংরেজি : Clapping with one hand makes no noise.

ঢ. Thai : Dtob mu kang diaw mai dang.

ইংরেজি : Clapping with one hand, no sound.

ণ. Malay : Bertepok sa-belah tangar, t'a kan perbunyi.

ইংরেজি : Clapping with one hand will not make any noise.

ত. মারাঠি : এক হাতানে টালি বাজত নাহী।

ইংরেজি : You cannot clap with one hand.

থ. Kashmiri : Doyih athah cheh tsr wazan.

ইংরেজি : Clapping is with both hands.

দ. Sindhi : One hand cannot clap.

ধ. গুজরাতি : এক হাতে তালী ন পড়ে।

১৩. বাংলা : আকাশ-কুসুম

ক. ইংরেজি : To build castle in the air.

খ. Hindi : হাওয়া মে ফুল বাঁধনা

গ. Latin : Subtracto monumento in aere aedficare.

ইংরেজি : To build castle in the air.

ঘ. German : Luftschosser bauen.

ইংরেজি : To make castle in the air.

ঙ. Hungarian : Legvarakat epit.

ইংরেজি : To make castle in the air.

১৪. বাংলা : এক ঢিলে দুই পাখি।

ক. ইংরেজি : To kill two birds with one stone.

খ. Hindi : এক পঁথ দো কাজ

গ. German : Zwei Fliegen mit einer Klappe

ইংরেজি : To kill the flies with one flap.

ঘ. Chinese : Yi shi er niao.

ইংরেজি : One stone— two birds.

ঙ. Thai : Ying thi diaw dai nok sing tua.

ইংরেজি : To shoot two birds with one shot.[১০]

প্রত্যেক ভাষাতেই এমন অজস্র প্রবাদ আছে যা অন্যান্য ভাষাতেও পাওয়া যায়। একই কথা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মনে আসা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বণিকেরা যে পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি সংস্কৃতিরও আদান প্রদান করে আসছেন, সেই সূত্রে এক দেশের প্রবাদ আর-এক দেশে

ছড়িয়ে গেছে। এমনকী কখনও কখনও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে এক জাতি আর-এক দেশে উপনিবেশ তৈরি করলে পরস্পরের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র হয়। এর ফলে এক দেশের প্রবাদ অন্য দেশের জীবনচর্চার প্রবেশ করে। এ ছাড়া বৈবাহিক সূত্রে, কর্মক্ষেত্রে এক দেশ থেকে অন্য প্রদেশে বদলির কারণে একই অঞ্চলের প্রবাদ অন্য অঞ্চলে চলে আসাও অসম্ভব নয়। আবার কিছু প্রবাদ সংস্কৃত থেকে নানান ভাষায় সরাসরি ঢুকে পড়েছে বলে এই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

তাই বলা যায় যে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ ও অভিবাসনের ফলে সংস্কৃতির ও দেশান্তর ঘটত। ফলে এক দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্য দেশে নানাভাবে সঞ্চালিত হত। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া বহু প্রাচীনকাল থেকেই ঘটে আসছে। যেমন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কিংবা এশিয়ামাইনরের সঙ্গে ভারতবর্ষের ও চিনের সম্পর্ক একদিন গড়ে উঠেছিল। এমনকী প্রতিবেশী চিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিক অভিবাসন সূত্রেই ঘটেছিল। এই প্রক্রিয়া মধ্যযুগে অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, বর্তমানকালে রাষ্ট্র সীমানার সার্বভৌমত্বের কারণে এই চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অথচ কিছু কিছু উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে প্রসারিত। এই প্রসারণকেই নৃবিজ্ঞানীরা বলেছেন Cultural contact বা Acculturation পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে সমধর্মী চিন্তা মহৎমানুষদের মধ্যে দেখা যায়, এ তো চিরন্তন সত্য। তাই একথা বলা খুবই সঙ্গত যে 'সহস্র বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ। জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য, জয়শ্রী· বাংলার প্রবাদে নারীমন, ১৯৯১, পৃ. ৯২

২. দে, অমলকুমার: সংস্কৃত প্রবাদ-প্রবচন, ২০০০, পৃ. ৪০

৩ ঐ, পৃ ২৯

৪. ঐ, পৃ. ২১

৫. দাশ, আশা: জাতকেব পটভূমিকায় বাংলা লোকসাহিত্য, ১৯৯৫ (১নং থেকে ৭নং) পৃ. ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫

৬ কৃষ্ণমূর্তি, সুব্রমনিয়ন ও দে, শ্যামাপ্রসাদ, নির্বাচিত তামিল প্রবাদ, ১৯৯৮, পৃ. ৫, ৬, ২৮, ৩১. ৯৮-৯৯

৭. চৌধুরী দুলাল: চাকমা প্রবাদ, ১৯৮০, ১নং ১০নং প্রবাদ, পৃ ২, ৫. ৬, ৮, ৪৯, ৫২, ৬২, ৬৪, ২৮, ৫০

৮. সাত্তার, আবদুস: অরণ্য জনপদে, ১৯৭৫, পৃ. ১১৩-১১৪ (১১নং থেকে ১৭ নং পর্যন্ত)

৯ মাহাত, বিনয়: লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ. ৩১১-৩১৪ এবং ৩২০

১০. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ: সানতালি মেন কাথা আর ভেনতা কাথা, ১৯৯১, পৃ. ২-৬

১১. Sanyal, Charuchandra . The Rajbansis of North Bengal, 1965, p 179-180, 182-183, 186-187

১২ সিদ্দিকী, আশরাফ: লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৫, পৃ ৩১

১৩. Paczolay Gyula: European, Far-Eastern and some Asian Proverbs 1994, p 20, 22, 30, 33, 42-43, 48, 65, 75, 83-85, 110-111

উত্তরকথা

বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বর্গের (ধাঁধা, ছড়া, গীতি-গীতিকা, কথা, ব্রত, মন্ত্র প্রভৃতি) মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি প্রবাদ-প্রবচনগুলিই সর্বদেশে সর্বকালে সবচেয়ে বেশি জীবনঘনিষ্ঠ বলে শুধু বাঙালি নয় পৃথিবীর সব জাতির মানুষের কাছেই লোকপ্রিয়। মানুষের মুখে ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব। মানবসভ্যতা থাকলে প্রবাদও থাকবে—কেননা তা বাক্‌ধর্মী শিল্প। বিশেষজ্ঞের কথায় আমরা এও জানতে পেরেছি ফোকলোরের যত উপাদান আছে তার মধ্যে প্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য সর্বাধিক। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন?

প্রবাদ ঐতিহ্য-আশ্রিত সামাজিক অনুশাসনের জনগণোক্তি এবং মানুষকে সঠিকপথে চালনা করার ন্যায়দণ্ড-স্বরূপ। সহজ-সরল, রমণীয়. বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ এই বাক্য-রত্নগুলি মানব-জীবনপথে চলার সঙ্গী বলে সভ্যতার ইতিহাসে একই সঙ্গে তা প্রাচীন ও আধুনিক। আর প্রবচন হল জনশ্রুতিমূলক সূক্তি ভাষণ; প্রবাদের শিথিল রূপ। মানুষের ভাবজগৎ ও কর্মজগতের এমন কোনও বিষয় নেই যা প্রবাদ-প্রবচনে অনুপস্থিত। বক্তব্য উপস্থাপনে যথোপযুক্ত প্রবাদ শুধু মোক্ষম অস্ত্র নয় বচন-শিল্পেও শক্তিশালী জাদুবিশেষ। আর এই কারণেই চর্যাগীতির প্রাচীন কবি সরহপা থেকে নতুন সহস্রাব্দের উত্তর-আধুনিক কবি শ্রীজাত পর্যন্ত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ছড়াছড়ি। মুখের ভাষার লৌকিক প্রবাদই সেজেগুজে সাহিত্যে স্থান করে নেয় জীবনঘনিষ্ঠতার গুণে এবং অবলুপ্তি থেকে রক্ষা পায়।

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় দশহাজার বাংলা প্রবাদের (আঞ্চলিক প্রবাদ বাদে) অনুপুঙ্খ পর্যালোচনায় দেখা গেছে জাতির জীবনের কী নেই সেখানে।

চাষ-বাস থেকে ভূতভবিষ্যৎ, আবহাওয়া থেকে পরিবেশরক্ষা, বাস্তুতত্ত্ব থেকে লোকশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য থেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সম্প্রীতি থেকে প্রতিবাদী চেতনা, রাজা-জমিদার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ থেকে হাড়ি-বাগদি, ডোম-চাঁড়াল, সতিনপ্রথা থেকে বধূনির্যাতন, পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে বাঙালি-রমণীর বিচিত্রকথা, বাজারি অর্থনীতি থেকে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট—সবই আছে। আছে বাঙালির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অত্যাচার-উৎপীড়ন, সোহাগ-বঞ্চনা, শোষণ-শাসন, অবহেলা রাগ-দ্বেষ— এক কথায় 'গ্রামে গাঁথা' বঙ্গদেশের 'জনপদে হৃদয়ের কলরব।'

প্রত্যেক জাতির জীবনচর্যার প্রতিফলন ঘটে তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। বাঙালি জাতিসত্তাও তার ব্যতিক্রম নয়। লোকসাহিত্যের অন্যতম বর্গ প্রবাদ-প্রবচনগুলি সেদিক থেকে বাঙালির সামগ্রিক জীবনচর্যার চলমান চিত্রের অভিজ্ঞান। গ্রাম্যসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টি-রহস্য আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "জনপদে যেমন চাষাবাদ এবং খেয়া চলিতেছে—সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠন কার্যও চলিতেছে, তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্য সূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে।"[১] বাংলা প্রবাদ বাঙালির 'বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড' জীবনের সেই নিত্যকালের সাহিত্য।

ঔপনিবেশিক পরাধীনতার কালে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বও উপলব্ধি করেছিলেন, 'দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা।'[২] আর স্বদেশের ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিবরণ প্রভৃতির মধ্যেই যেহেতু চিরদিন দেশের প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়ে আসছে, তাই তার অন্বেষণ ও চর্চা করতে হবে প্রথমে। একাজ এতদিন পর্যন্ত বিশেষভাবে বিদেশি পণ্ডিতদের হাত ধরেই অগ্রসর হয়েছে। অন্তত বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহের ক্ষেত্রে কথাটি বেশি করে প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির মাতৃভাষা তথা দেশীয় পুরাতন সাহিত্য ও লোক-উপাদানের প্রতি অবহেলার গ্লানিকর ইতিহাসের কথা সর্বজনবিদিত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কালে (১৩১৩) যখন স্বদেশীয়ানার মেজাজ

উত্তুঙ্গ, তখনও রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন, "দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কত বড়ো একটা গালি তাহা আমরা অনুভব করিনা।"[৩] পরবর্তী কালেও ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি প্রবাদ-প্রবচনের মতো লোকসাহিত্যের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এমন নয়। ড. সুশীলকুমার দে ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, "আধুনিক ভদ্র সমাজে ও ভদ্র সাহিত্যে বাংলা প্রবাদগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিন্দিত না হইলেও পরোক্ষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।"[৪] এই উপেক্ষার কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেছেন তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এর মধ্যে শিষ্টাচার বহির্ভূত ন্যাকামি, গ্রাম্যতাদোষ এবং অশ্লীলতার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অথচ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের এইসব সনাতন ঐতিহ্য, উপকরণের কোনও কিছুই ফেলনা নয় বলে জোরালো মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে এইসব সাহিত্যে 'সমস্তদেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি মিলিত হয়"[৫] বলে তার মধ্যে স্বদেশের সার্বিক রূপটি উপলব্ধি করতে পারা যায়। প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের এক একটি বর্গের মধ্যে প্রকরণগত অমিল থাকলেও মর্মগত প্রভেদ তেমন নেই। এগুলির মধ্যেই জাতির প্রাণস্পন্দন যেমন ধ্বনিত হয়েছে তেমনি সেগুলি গড়েও উঠেছে দেশজ লৌকিক শব্দাবলীর আধারে। সুতরাং এই ধরনের সাহিত্যকে যাঁরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদ বর্তমান প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন: "অবহেলার অধিকার তোমার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। 'গ্রাম্যভাষা' বলিয়া অবজ্ঞার অধিকার তোমার নাই। Slang 'অপভাষা' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চনের অধিকার তোমার নাই। যদি সেরূপ অবহেলা কর, বা অবজ্ঞা কর, তুমি দয়ার পাত্র, তদপেক্ষা তীব্র বিশেষণ ব্যবহার করিব না।"[৬]

বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংকলন ও আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক হলেও বাংলা প্রবাদ সম্পর্কে তাঁকে খুব বেশি উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি, সম্ভবত তাঁর আগে অনেকেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন বলে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহে প্রবাদ-প্রবচনগুলির গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে যখন 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংগ্রহ করছেন সে সময় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষৎ

পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার একটি সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে। অন্যান্য সাহিত্য-উপকরণের সঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহের গুরুত্ব স্বীকার করে তিনি লেখেন, "সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশা করি যাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনায় সহায়তা করে।... বাঙ্গালা রূপকথা (Folk Lore), প্রবচন (Proverb),... ছড়া (Nursery Rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের এই আবেদন সমকালে অনেককে উৎসাহিত করেছিল। তিনি নিজে যেমন ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহে এবং তার আলোচনা-পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি মেয়েলী ব্রত এবং রূপকথা সংগ্রহ ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উৎসাহিত করেছিলেন যথাক্রমে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারকে। হয়তো 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বানেই সাড়া দিয়ে নতুন করে প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তিন খণ্ডের 'প্রবাদ পদ্মিনী' প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। ইতিমধ্যে দুই রবীন্দ্র-সুহৃদ প্রবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আলোচনায় এগিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' (১৩০৫) পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি। এর একবছর আগে ওই একই পত্রিকায় জনপ্রিয় প্রবাদগুলি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লেখেন দীনেন্দ্রকুমার রায় (প্রবাদ প্রসঙ্গ, ভারতী, আষাঢ় ১৩০৪)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমায় এইভাবেই প্রবাদ-প্রবচন তথা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে উনিশ শতকের এই শেষলগ্নটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই এত কথার অবতারণা।

দুই

পল্লী-প্রাণ বাঙালির সর্বায়ত জীবন-চর্যার সনাতন ঐতিহ্যের অন্বেষণ সূত্রেই একসময় বিদেশিদের হাত ধরে এবং পরবর্তীকালে অন্তরের তাড়নায় ও আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে প্রবাদগুলির সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল। সমগ্র উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে চলেছে সেই সংগ্রহের কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে চাই সেগুলির আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক মূল্যমান নির্ণয় এবং আপামর বাঙালির ভাব ও কর্মজগতে প্রবাদগুলির সম্ভাবনাময় গুরুত্বকে পুটিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে সে কাজ অল্প-স্বল্প হলেও সামগ্রিকভাবে বাংলা প্রবাদের স্বরূপ নির্ধারণ ও বৈচিত্র্যের বহুমাত্রিক রূপটি উদঘাটন করার প্রচেষ্টা তেমনভাবে লক্ষ করা যায়নি।

সনাতন বাঙালি-সমাজের সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে। শিক্ষিত আধুনিক মার্জিত রুচির নাগরিক মানুষের দরবারে তার গুরুত্বটুকু সংক্ষেপে নিবেদন করতে চাই এবার। দেখতে এবং দেখাতে চাই 'প্রাচীন জীবন-ঐতিহ্য'-বিচ্ছিন্ন ভোগবাদী শহুরে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, এমনকী সমাজ সভ্যতায় বেঁচে থাকতে পারার মাপ-কাঠিতে আপাত 'তুচ্ছ' প্রবাদগুলির গুরুত্ব কত অপরিসীম; কেননা সেগুলি অখণ্ড বাঙালি জাতির প্রাণের সম্পদ।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির স্বার্থপুষ্ট অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চাপে কৃষি-নির্ভর বঙ্গদেশে চাষ-বাস এবং ফসল উৎপাদনে দেখা দিয়েছে নানাবিধ সংকট। বহুশত বৎসরের প্রাচীন ডাক ও খনার বচন এবং অজস্র প্রবাদমালায় এদেশের কৃষিকার্য ও গবাদিপশু পালন সম্পর্কিত বহু নিয়ম-কানুন, পরামর্শ বিদ্যমান। কালের মাপকাঠিতে গ্রামীণ বাঙালির কাছে বহু পরীক্ষিত সেইসব কৃষি-পদ্ধতি এবং ঋতুপর্যায় অনুযায়ী আবহাওয়া সম্পর্কিত নির্দেশাবলী একালের কৃষি-বিজ্ঞানের দরবারে পুনর্বিবেচিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। 'আখ, আদা পুঁই/ এই তিন চৈতে রুই'। অর্থাৎ চৈত্রমাসেই এই তিনটি রোপণ করার আদর্শ সময়। কৃষি-বিজ্ঞানী বিচার করে দেখবেন এই প্রবাদ-নির্দেশের যৌক্তিকতা। প্রবাদে কৃষিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পেশা বলা হয়েছে জীবন ধারণের প্রথম উপায় বলে। কৃষিজমির অবস্থান, বীজবপন, সেচ, সারের গুরুত্ব, ফসলকাটার

সময়, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি সম্পর্কে সতর্কীকরণ কী নেই প্রবাদের মধ্যে। বাস্তুতত্ত্ব, এমনকী গৃহনির্মাণ সম্পর্কে পরামর্শগুলিও স্থাপত্যবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার বিষয় হতে পারে।

আধুনিককালে পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সমগ্র বিশ্বজুড়ে আন্দোলন চলছে। মানবসভ্যতার অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্তেই বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হতে চলেছে ভোগবাদী জীবনে অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার ফলে। অথচ কতশত বছর পূর্বেই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করেছে প্রবাদ। সামাজিক বনসৃজন, মানবসমাজে অরণ্যের গুরুত্ব, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ও দূষণরোধে পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের অবদান সবই আছে প্রবাদে। 'শকুনের নজর ভাগাড়ের দিকে' কিংবা 'পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে' প্রভৃতি প্রবাদের অন্তরঙ্গ তির্যক অর্থ অপেক্ষা আভিধানিক অর্থটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। খনা কবেই না বলে গেছেন—'বন থাকলে বৃষ্টি হবে।' বেঁচে থাকতে গেলে অরণ্যকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তায়। জনস্বাস্থ্য নিয়েও আধুনিক মানুষের ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। এই নিয়েও কত সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান, এন. জি. ও-দের হুড়োহুড়ি। শহুরে মানুষের মর্নিং-ওয়াক তো প্রায় স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে গেছে। অথচ সনাতনকালের প্রবাদ গেঁয়ো যোগীর মতো ভিক্ষা পায় না। যখন বলা হয় 'আলো হাওয়া বেঁধো না/রোগ ভোগ সেধো না' কিংবা 'বেড়াও যদি ভোরের বেলা/ থাকবে না আর রোগের জ্বালা', তখনই বুঝতে পারা যায় প্রবাদমালা প্রাচীন হয়েও কেন আধুনিক।

প্রবাদগুলি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর কাছে গবেষণার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে। রাজা মহীপাল, নাটোরের রামকৃষ্ণ রায়, রানি ভবানী, বারো-ভুঁইয়া, চাঁদ রায়-কেদার রায়, অযোধ্যার চতুর্থ নবাব দানবীর আসফ্উদ্দৌলা প্রমুখকে নিয়ে যেসব প্রচলিত প্রবাদ তা অবশ্যই পুষ্ট করতে পারে আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাসকে। 'Subaltern Studies' আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষার জগতে আজকাল বেশ গুরুত্ব পায়। নৃবিজ্ঞানী যেমন আকৃষ্ট হতে পারেন নিম্নবর্গের (Subaltern) মানুষদের সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদগুলি সম্পর্কে, তেমনি Women Studies-এর বিপুল উপকরণ আছে বাংলা প্রবাদমালায়। বাঙালি-রমণীর কলকাকলিতে পরিপূর্ণ এইসব প্রবাদে এদেশে নারীর সামাজিক অবস্থানটি

শুধু বস্তুনিষ্ঠ নয়, যথাযথভাবে উপস্থাপিত। আধুনিককালের অন্যতম সামাজিক ব্যাধি কন্যা ভ্রূণ হত্যা। বিষয়টি এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে সরকার বাধ্য হয়েছেন আইন প্রণয়ন করতে। অথচ প্রবাদকে যদি যথাসময়ে গুরুত্ব দেওয়া হত তবে বিষয়টি নিয়ে বহুপূর্বেই সতর্ক হতে পারতাম আমরা। বঙ্গদেশে অনেককাল আগে থেকেই শিশুপুত্র 'সম্পদ' ও কন্যাসন্তান 'আপদ' হিসাবে বিবেচিত হত। 'সাত জন্মে পাপ করলি/ মেয়ে জন্মে তবে এলি' কিংবা 'ছেলে বিয়োলে স্বর্গবাস/ মেয়ে বিয়োলে নরকবাস' প্রভৃতি প্রবাদ থেকেই এবিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। আমরা জানি দেশ-কালের প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন ও পুনর্নির্মাণেই আধুনিকতার মর্জি বদল হয়। সেদিক থেকে প্রবাদমালার মধ্যেই সমাজবিজ্ঞানী খুঁজে পেতে পারেন যাবতীয় অসংগতির বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। 'যার জন্য বনবাসী/ সেই দেয় গলায় ফাঁসি' কিংবা 'ভাত দেয় না ভাতারে/ ভাত দেয় গতরে' ইত্যাদি প্রবাদে নারীর সামাজিক অবস্থান ও সংকট চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত।

আধুনিক কালে 'Women's rights' বা 'Women's lib' নিয়ে আন্দোলনের শেষ নেই। প্রাচীন বাংলা প্রবাদগুলিতে আধুনিক নারীচেতনাবাদীরা যথেষ্ট উপকরণ খুঁজে পেতে পারেন। পণপ্রথা ('পণছাড়া বিয়ে/ কি হবে সে মেয়ে নিয়ে'), কন্যা বিক্রয় ('কালো মেয়ে কি থাকবে ঘরে/ সব বিকোবে বাজার দরে'), বধূনির্যাতন ('গরুর মত বৌকে না মারলে/ হয় না সিধে কোনোকালে'), বধূহত্যা ('একবরে মাগ নাড়ে চাড়ে/ দোজবরে মাগ পুড়িয়ে মারে'), নারী বিদ্বেষ ('পুড়বে নারী উড়বে ছাই'), নারীশিক্ষায় বাধাদান ('লেখা পড়া শিখলে/ বিধবা হবে অকালে'), এমনকী নারী জাগরণের বিরুদ্ধেও কথা বলা হয়েছে প্রবাদে।

বৃত্তি-বিভাজিত সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যের বিচিত্র সংকট প্রবাদগুলিতে এমনভাবে উপস্থাপিত যার থেকে সমাজবিজ্ঞানী সহজেই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন। এদেশের শ্রমজীবী মানুষ 'সমাজের পিলসুজ' হয়েও সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত বঞ্চিত ও শোষিত। সামন্ততান্ত্রিক শক্তির অত্যাচার ('কাঙালি মেরে কাছারি গরম'), কৃষকের হতাশা ('চাষার দুঃখ এগারো মাস'), খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ বেদনা ('খেটে খাওয়া যাদের বরাত/কাটবে না তাদের দুখের রাত') যেমন

প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনি আছে বাজারি অর্থনীতি ('কড়িতে বাঘের দুধ মিলে') কিংবা বাণিজ্যিক বিনিময় ভাবনার ('গিভ এ্যান্ড টেক') জ্যান্ত ছবিও। শেষোক্ত ইংরেজি খণ্ডবাক্যটি এদেশে সাম্প্রতিককালে বহুপ্রচলিত হয়ে প্রবাদ রূপ লাভ করেছে। 'দিবে আর নিবে/ মিলাবে মিলিবে'র সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতাকেই ধারণ করে আছে প্রবাদটি। প্রবাদ নগর-কলকাতার প্রকৃত চরিত্রটিকেও চিহ্নিত করেছে সঠিক পন্থায়—'মিথ্যা কথার কিবা কেতা/আজব শহর কলকাতা।'

কেবল সমালোচনা অসংগতি ত্রুটি বিচ্যুতি নির্দেশ নয়, একালের অবক্ষয়িত সমাজে প্রবাদগুলি পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করতে পারে সমাজ-অনুশাসনের মতো। 'আপনার মুখ আপনি দেখো' কিংবা 'আপনি রাখিলে রহে আপনার মান' চমৎকার লোকশিক্ষার উপযোগী। সবচেয়ে বড় কথা ধর্মগত-জাতিগত-প্রদেশগত এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার কালে গোটা দেশ যখন ত্রিশঙ্কু, দিশাহারা, প্রবাদ তখন পথ দেখাতে পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। 'রাম রহিম কালী/ ভেদ করলেই মলি' কিংবা 'কালী কালী বনমালী/ শেখ পরাণে জয়ধর আলি' প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচন যাবতীয় ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে সাম্প্রদায়িক ঐক্যকেই ধারণ করে আছে। ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের প্রেরণায় প্রবাদগুলির গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে।

শান্তিনিকেতনের সান্ধ্য ক্লাসে লোকসাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহা যে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাজটি কেহ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মূলগত সামঞ্জস্য অনেকটা ধরা যাইবে।"[৮] রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব শিরোধার্য করে ছড়ার বদলে প্রাদেশিক প্রবাদ-প্রবচনগুলির তুলনামূলক আলোচনায় দেখা গেছে ভারতবর্ষের মানুষেরা ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও জীবনচর্যার মূলগত সামঞ্জস্যে তারা একটি বৃহৎ দেশের মানুষ। ভারতবর্ষের সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন্ আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের সাহিত্য (Indian Literature) একটাই কেবল তা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত।' সুতরাং প্রাদেশিকতার ভেদসংঘাতে সমগ্র দেশ যখন শতধাদীর্ণ তখন প্রবাদ-ছড়া প্রভৃতি *লোকসাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে সেই বিরোধ-বিচ্ছেদ কিছুটা হলেও*

প্রশমিত হতে পারে সামঞ্জস্যের ঐক্যে। আন্তঃপ্রাদেশিক এমন একটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

বাংলা প্রবাদ	:	নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
উর্দু প্রবাদ	:	নাচতে না জানে অঙ্গন টেরা।
ওড়িয়া প্রবাদ	:	চালি না জানি বাটর দোষ।
হিন্দি প্রবাদ	:	নাচ না জানে আঙ্গন টেরা।
মারাঠি প্রবাদ	:	নাচত এয়িনা আঙ্গন ভোকরা।
কন্নড় প্রবাদ	:	কুনিয়ালিকে তিনিয়া দিদ্দাকে আঙ্গার ওরে।

যথাস্থানে প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অন্যপক্ষে সমগ্র বিশ্বের মানুষ যে এক অখণ্ড সূত্রে বাঁধা আন্তর্জাতিক প্রবাদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বৈষম্যভরা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির মানবিক বিশ্বায়ন আমাদের কাম্য। আর তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে প্রবাদের মতো মানবজীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য-উপকরণগুলির মাধ্যমে 'বিশ্বমানব' ভাবনার প্রেক্ষাপটে।

বাংলা প্রবাদগুলি সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতায় আটপৌরে বাক্‌ভঙ্গিতে চলতি কথার মাধ্যমে। অথচ বাংলা ভাষার মেরুদণ্ড এই চলতি রীতি এক সময়ে আধুনিক যুগেও অবাঞ্ছিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্‌বাণীই শেষ পর্যন্ত ফলেছে। সংস্কৃতায়িত সাধুভাষা রূপ সুয়োরানি বিদায় নিয়েছে, রাজসিংহাসনে বসেছে এক সময়কার দুয়োরানি চলিত ভাষা। মনে রাখতে হবে বাংলা প্রবাদগুলি এই চল্‌তি বা চলিত ভাষারই প্রাকৃত মায়ের সন্তান। আর বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলা যায় চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এমন কোনও বাঙালি লেখক নেই যাঁর রচনায় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়নি। যথাস্থানে শতাধিক লেখকের সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রবাদের মতো ঐতিহ্যগত উপাদান কোনও জাতির জীবনকে শুধু নয় তার ভাষাকেও সতেজ ও সজীব রাখতে সাহায্য করে—বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা প্রবাদের গুরুত্ব সেখানেই। বাঙালির বাঙালিয়ানাকে যথার্থভাবে খুঁজে পেতে গেলে প্রবাদকে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় নেই। বঙ্গসমাজের এত জীবন্ত অনুপুঙ্খ পরিচয় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

তিন

ইতিহাস আমাদের জানিয়েছে, মানবসভ্যতার ভয়ংকর ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও শক্তির ভারসাম্যে জগতের দ্বিমেরুকরণ কিছুদিনের জন্য হলেও বিশ্ববাসীকে হাঁফ ছাড়ার সুযোগ দিয়েছিল। ছোট-বড় বহুদেশ ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে নতুন করে দেখতে শুরু করেছে স্বদেশ গড়ার স্বপ্ন। দারিদ্র্যপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি চিহ্নিত হয়েছিল তৃতীয়বিশ্ব রূপে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের পর পৃথিবী পুনরায় করতলগত হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির একমেরুকরণে। এবার উপনিবেশের বিস্তার আর দেশ দখল করে নয়, দেশটিকে আপাত স্বাধীন রেখে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাকে শোষণ-শাসন করার বিচিত্র পদ্ধতির প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়ে গেছে ততদিনে। বিভিন্ন চুক্তির ছলা-কলায় গরিব দেশগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে। লুণ্ঠিত হয়ে চলেছে তাদের সম্পদ, শ্রম, এমনকী মেধাও। আর তারই অঙ্গ হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিও এক ধরনের পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ হয়ে বিপন্নতার চূড়ান্ত সীমায় আছে দাঁড়িয়ে। এই নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ (Neo-Colonialism) আজকের বিশ্বমানবের সবচেয়ে বড় শত্রু শুধু নয়, এর বিপদটি আসে এমন চোরা-গোপ্তাভাবে যে ঔপনিবেশিক মানুষ বুঝতেই পারে না তারা উপনিবেশায়নের (Colonization) অধীন। আমাদের দেশও আজ এই নব্য ঔপনিবেশিকতায় আক্রান্ত। অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বটেই—সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি, এমনকী মাতৃভাষাও আজ বিজাতীয় ছোঁয়াচে রোগে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করেছে। নিঃসমাজ নগর কলকাতা নয় শুধু, প্রযুক্তির দৌলতে গণমাধ্যমের চাপে পল্লীগ্রামগুলির সহজ সরল জীবনযাত্রা আজ অপসংস্কৃতি অপভাষা অপসাহিত্যের বিষাক্ত দূষণে জর্জরিত। রূপকথা নয়, উদ্ভট কমিকস্ আর হ্যারিপটারের শোরগোল, সেকস্-ভায়োলেন্সের ভোগবাদী মার্কিনী চলচ্চিত্র, সকাল থেকেই রেডিয়োর এফ. এম. চ্যানেলে অনবরত ভেসে আসা ইংরেজি-হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত জগাখিচুড়ি ভাষা, ভ্যালেনটাইন্স-ডের ধুম-ধাড়াক্কা, ফাস্টফুডের রমরমা, ধন-তেরাস-এ সোনা কেনার হুড়োহুড়িতে বাঙালি আজ

নেশায় মজে আছে। তার বারো মাসের তেরো পার্বণ দাঁড়িয়েছে শুধু কথার কথায়, সাহিত্য বলতে বাজারি উপন্যাস। মানবসম্পদ দূষণের এই সংকটমুহূর্তে বাঙালি জাতিসত্তা, বাংলা ভাষার আজ ত্রিশঙ্কু অবস্থা। আত্মবিচ্ছিন্নতার দীনতায় সমগ্র জাতি কোণঠাসা। দেশের নগরগুলি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যবিচ্যুত সংকীর্ণ একদল ঘুণ-পোকাদষ্ট, সমাজহীন মানুষের গড়ের মাঠ। নতুন সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে উপেক্ষিত হয়ে চলেছে নিজস্ব সংস্কৃতি, হারিয়ে যেতে বসেছে মুখের ভাষা, জাতির স্বরূপত্ব (Identity)। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বরাজনীতির মহান ব্যক্তিরাও আজ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। ফিদেল কাস্ত্রো এই সংকট ও সংকট-উত্তরণের নিদান দিতে গিয়ে বলেছেন :

"... is that of the aggression to our national identities, the ruthless aggression to our cultures, as never before in history, the trend towards a universal monoculture. How can anyone conceive such world? It is not a world order that combines the wealth and culture of many countries, but a world order that, by definition, destroys culture, a globalization that inevitably destroys culture.

"What is one's homeland, if not one's own culture? What is national identity if not the country's own culture? Can there be a greater spiritual wealth than one's own culture, created during eons by mankind? Can our customs be simply swept away, ruthlessly swept away? We have to be aware of that, because the battles of ideas and concepts will be a great battle." [৯]

সভ্যতার এই সংকট থেকে বাঙালি জাতিসত্তার উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে বিলুপ্তির হাত থেকে দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। নিয়মিত তার চর্চার মাধ্যমে বহির্মুখী বাঙালি মানসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে তার আত্ম-আবিষ্কারের স্বভূমিতে। তার জন্য চাই সর্বাঙ্গীণ বাঙালি চেতনার জাগরণ, ঐক্যের বন্ধনে সমগ্র জাতিকে বেঁধে ফেলার ঐকান্তিক প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলা দেশ দেবভূমি নয়, এদেশ মানবের দেশ। বাঙালি মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে।"[১০] বাংলা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত প্রবাদ-প্রবচনগুলি এদেশেব মানুষের সেই বিচিত্র কথার রত্নভাণ্ডার।

পল্লী-প্রিয় বাঙালির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে তার মানব তথা লোকচেতনার মধ্যে। আর সেখানেই প্রতিদিনের নিত্য কার্যের সূত্রে প্রবাদগুলির গঠনক্রিয়া চলেছে,—তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে সমগ্র দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস; এই আধুনিক যুগেও। প্রবাদের জীবনীশক্তি অসাধারণ বলেই তা আজও সজীব ও সচল। আর এই সঞ্জীবনী মূল্যেই যে-কোনও কালেই তা মানবমনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দাবি রাখে।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক মানসিকতার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোলায়িত রবীন্দ্রনাথ অতি প্রচলিত একটি প্রবাদ নিয়ে কৌতুকরসের অবতারণা করেছেন 'হাস্য কৌতুক' (১৯০৭)-এর 'পেটে ও পিঠে' (১২৯২) নামক নাট্যচূর্ণে। 'পেটে খেলে পিঠে সয়' প্রবাদটিকে লঘুকাহিনির মাধ্যমে সম্প্রসারিত করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'পিঠে খেলে পেটে সয় না'। প্রবাদটিকে নিজের সাহিত্যে ব্যবহার করতে গিয়ে কৌতুকরসের অতিরিক্ত আর কোনও ভাবনাই তাঁর কাছ থেকে আমরা পাই না।

আবার এই একই প্রবাদ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নব্য ঔপনিবেশিকতার কালে ব্যবহৃত হল বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় লিখিত গানে—'পেটে খেলে পিঠে সয়/ এতো কভু মিছে নয়।' সমকালের বক্তব্য তির্যক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে—গানটিও ছবির বক্তব্য বিষয়েব সঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

আরও পরবর্তীকালে উত্তর-আধুনিক গীতিকার তীক্ষ্ণ-মননবুদ্ধির সাহায্যে প্রবাদের ব্যবহার করেন যথাযোগ্য, কালিক-অভিঘাতে। আমরা জানি 'টাক থাকলে টাকা হয়' প্রবাদটি অর্থের দিক থেকে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট,—অনেকটা কাকতালীয় ব্যাপার। টাকওয়ালা মানুষ মাত্রেই অর্থবান হবেন এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু এই প্রবাদই বুদ্ধিদীপ্ত পুনর্নির্মাণে নতুন সহস্রাব্দের ভোগবাদী জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও হাহুতাশকে ব্যক্ত করেছে কৌতুক-রঙ্গের আধারে। জীবনমুখী গানে চমৎকারভাবে প্রযুক্ত হয়েছে সেটি: টাক দিলি মা আকার দিলি না।' টাক + আকা = টাকা; আবার টাকা-আকার =টাক। অর্থাৎ 'টাক দিলি মা টাকা দিলি না' সহজভাবে না লিখে উত্তর-আধুনিক গীতিকার সংলাপে 'টাক'-এর 'আকার'হীনতার কথাই বললেন। বাংলা প্রবাদ এইভাবেই আত্তীকৃত হয়েছে চলমান জীবনে, নতুন নতুন তাৎপর্যে—ঔপনিবেশিক, নব্য ঔপনিবেশিকতার কালে, এমনকী

উত্তর-আধুনিক জীবনেও। এই কারণেই প্রবাদকে বলা হয় মানবসভ্যতার চিরকালীন সম্পদ।

বাঙালির জীবন-চেতনার সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে আধুনিক জীবনের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মিলিয়ে নিয়ে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করাই আমাদের লক্ষ্য এবং সেই সূত্রেই বলতে চাই ঐতিহ্যের নবায়ন হবে, বিলুপ্তি ঘটবে না কখনওই। তা হলে সেই জাতির মৃত্যু অনিবার্য। প্রবাদগুলির মধ্যে এক অখণ্ড স্বাদেশিক বোধকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছি আমরা; সে আবিষ্কার বস্তুত বাঙালির আত্মাআবিষ্কার। প্রবাদ-প্রবচনের মতো দেশীয় সাহিত্য-উপাদান সঞ্জীবনী সুধা হয়ে এই উত্তর-আধুনিক কালের জীবনসংকটে যথামূল্যে গৃহীত হবে আশাকরি।

তথ্যসূত্র

১. গ্রাম্যসাহিত্য, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সং), খণ্ড ১৩, পৃ. ৭১৭

২ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ · সাহিত্য পরিষদ, দ্র 'সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সং), খণ্ড ১৩, পৃ. ৮৮৬

৩. সাহিত্য সম্মিলন, ঐ, পৃ. ৮৭৬

৪ দে, সুশীলকুমার · বাংলা প্রবাদ (১৪০৮ সং), 'ভূমিকা', পৃ. ২৫

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য সৃষ্টি, রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সং), খণ্ড ১৩, পৃ. ৭৮৮

৬. বাঙ্গলা ব্যাকরণ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৮, পৃ.২২

৭ সাধনা, পৌষ ১৩০১, পৃ. ১৯০-৯১

৮. আশ্রম সংবাদ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, চৈত্র ১৩২৮, পৃ ৩৯

৯. Castro Fidel Neoliberal Globalization and the Global Economic Crisis, NBA Private Limited, 1999, p. 124

১০ সেন, ক্ষিতিমোহন · বাংলার সাধনা, দ্র. 'নিবেদন', পৃ. ১২

ক্ষেত্রসমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে গিয়ে গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে যেসব প্রবাদ সংগ্রহ করেছি সেই সংগ্রহ থেকে কিছু এখানে পরিবেশিত হল। যাঁদের কাছ থেকে প্রবাদগুলি সংগ্রহ করেছি তাঁদের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করলাম।

পশ্চিমবঙ্গ

চব্বিশ পরগণা (উত্তর)

গ্রাম সন্দেশখালী, থানা সন্দেশখালী, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা, তথ্যদাতার নাম অনিমা দাস, বয়স ৫০, পেশা শিক্ষকতা, সংবাদদাতার নাম অরুণকুমার পাল, তারিখ ১০ ১২.২০০৪, সময় বেলা ২টো।

১. অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলায়।

২. জোর যার মুল্লুক তার।

৩. টাকা নেবে গুনে
পথ চলবে জেনে।

৪. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

৫. তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।

৬. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

৭. বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

৮. বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

৯. শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।

১০. হিসেবের কড়ি যমেও ছোঁয় না।

চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ)

গ্রাম কুমিরমারী, থানা গোসাবা, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, তথ্যদাতার নাম পদ্মা দাসী, স্বামীর নাম ˚নকুল নস্কর, বয়স ৫৮ বছর, পেশা গৃহকর্ম। সংবাদদাতার নাম অজিত মণ্ডল, তারিখ ২১.১.২০০৩, সময় দুপুর ১টা।

১. কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে।

২. বামন গেল ঘর
নাঙল (লাঙল) তুলে ধর।

৩. কালে কালে কত কি হবে
পুলি-পিঠার লেজ গজাবে।

৪. আগাছার গাছ বেশি
আকামের কথা বেশি।

৫. শশা বেচুনি বেচত শশা
তার হয়েছে সুখের দশা।

৬. যদি দেখ মাকন্দ ধোপা
বাড়াও না এক পা বাপা।

৭. মোটেই মা রান্ধে না, তপ্ত আর পান্তা।

৮. উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

৯. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

১০. আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

হাওড়া

গ্রাম বাঁকুড়দা, থানা বাগনান, জেলা হাওড়া, তথ্যদাতার নাম সুরেন করণ, বয়স ৫০ বছর, পেশা চাষবাস, সংবাদদাতার নাম মঙ্গলাচরণ পাল, তারিখ ৫.৭.২০০২, সময় দুপুর ১টা।

১. কুড়িতে বুড়ি
মরলে মুড়ি।

২. কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ
না মারলিই মহাপাপ।

৩. বিয়ে করবে ফেতনী
গরু কিনবে ঝাঁপনী।

৪ অতি বড় সুন্দরী না পায় বর
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

৫. এগুলেও আঁটকুড়ো
পেছুলেও নির্বংশ।

৬. মুখ বজ বজ মুড়ি ভক্ষণ
তবে জানবে তেলির লক্ষণ।

৭. কায়েতের মড়া ভাসে
কাক বলে কোন ছলে হাসে।

৮. বেদের ছেলের ভাত নলের ডগায়।

৯. তেলি, পোঁদ পুঁছুলে গেলি
ছ'সের মুড়ি খেলি।

১০. বাগ-বাগদী হোড়েল জাত
পোষ মানেনে অর্ধেক রাত।
যদিও বা পোষ মানে
পড়ে পড়ে ঘরের বাতা গোনে।

হুগলি

গ্রাম বলরামপুর, থানা গোঘাট, জেলা হুগলি, তথ্যদাতার নাম বিভূতি রায়, বয়স ৭৮ বছর, পেশা শিক্ষকতা, এবং গনা বেনে ৭৮ বছর বয়স, পেশা কৃষক, সংবাদদাতার নাম অশোককুমার কুণ্ডু, সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৫.৪.২০০২, সময় সকাল ১০টা।

১. আইবুড়োর রগে পা
বার খেয়ে মরগে যা।

২. এক মাগীর এক চিন্তা
বুড়ো মাগীর ভাতারের চিন্তা।

৩. ভেনে-কেটে পা ফেলো
ফুঁ দিয়ে গালে ভোরো।

৪ দুখ্খু দুখ্খু বারো মাস
তাল পাকলেই দুখখু নাশ।

৫. শমে-দমে ছোটে পান
গাঁটে বাতে (বাটে) কাটে গান।

৬. বলবুদ্ধির ভরসা
চল্লিশ পেরুলেই ফারচা।

৭. তেনার হাল নাই
উনার বলদ নাই।

৮. পেট খসালে পাপ
পেটে ধরলে শাপ।

৯. বাগদীর লাঠি
মুসলর্মানের পাটি।

১০. সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

বর্ধমান

গ্রাম নিশ্চিন্তিপুর, থানা কালনা, জেলা বর্ধমান, তথ্যদাতার নাম মহামায়া রায়, বয়স ৭২ বছর, পেশা গৃহকর্ম, সংবাদদাতার নাম মোহনলাল দে, তারিখ ৭.৯.২০০৩, সময়—বেলা ১টা।

১. অল্প শোকে কাতর
অধিক শোকে পাথর।

২. আম, আমড়া, কাজড়া ধান
এই তিনে বর্ধমান।

৩. উঠলো বাই তো কটক যাই।

৪. কানা গরু বামুনকে দান
বামুন বলে পরিত্রাণ।

৫. কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই।

৬. ছুঁচ চুরি করতে কুড়ুল হারায়।

৭. জাইতও গ্যাল প্যাটও ভরল না।

৮. চুন্নিমাগীর বড় গলা।

৯. মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

১০. যেমনি কুকুর, তেমনি মুগুর।

বীরভূম

গ্রাম কলেশ্বর, থানা বোলপুর, জেলা বীরভূম, তথ্যদাতার নাম নিত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, বয়স ৫২ বছর, পেশা শিক্ষকতা, সংবাদদাতার নাম অনিলকুমার রায়, তারিখ ৮.১০.২০০৩, সময় বেলা ১টা।

১. আকাটা নায়ের সামনা বেশি।

২. ইলাহী কাণ্ডকারখানা।

৩. এক আঁচড়েই বোঝা যায়।

৪ কালে কালে কতই হল
ডেঁউ পিঁপড়ের ল্যাজ গজালো।

৫. ষাঁড়ের শত্তুর বাঘে মারে।

৬. স্বভাব যায় না মলে
ইজ্জত যায় না ধুলে।

৭ অর্থই অনর্থের মূল।

৮. হরি ঘোষের গোয়াল।

৯. উচিত কথায় মানুষ হয় রুষ্ট
দেবতা হয় সন্তুষ্ট।

১০ এক কড়ার মুরোদ নাই
ভাত মারবার গোঁসাই।

মেদিনীপুর

গ্রাম লালগড়, থানা লালগড়, জেলা মেদিনীপুর, তথ্যদাতার নাম শ্যামল মাইতি, বয়স ৫৫ বছর, পেশা শিক্ষকতা, সংবাদদাতার নাম সুকুমার রায়, তারিখ ৪.৬.২০০৪, সময় বেলা ২টো।

১. ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি।

২. সাধলে জামাই কাঁঠাল খান না
শেষে ভূতি নিয়ে টানতেও ছাড়ে না।

৩. নাচতে না জানলেই উঠোনের দোষ।

৪ একে ত মা মনসা তাতে ধূপের ধোঁয়া।

৫. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

৬. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

৭. ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

৮. কড়ি থাকলে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়
না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও নয়।

৯. এক কান দিয়ে শোনে
আর এক কান দিয়ে বের করে।

১০. অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্চড়্ করে।

বাঁকুড়া

গ্রাম সোনামুখী, থানা সোনামুখী, জেলা বাঁকুড়া. তথ্যদাতার নাম শাশ্বতী মণ্ডল, বয়স ৪৫ বছর, পেশা শিক্ষকতা, সংবাদদাতার নাম সুবীরকুমার মণ্ডল, তারিখ ১২.৭.২০০৫, সময় বেলা ৩টে।

১. বামুন বাদল বান
দইখ্না পেলেই যান।

২. গদা পঁদের মাছি,
আমি লড়িও নাই, চড়িও নাই,
দিব্যি বসে আছি।

৩. রূপ যৌবন আড়াই দিন
চামের চখে মানুষ চিন।

৪ বোষ্টম হতে তিলক কাটে
মোচ্ছব দিতে পঁদ ফাটে।

৫. বাঁজা কি বুঝবেক পসব যাতনা।

৬. পেটে ভাত নাই পায়ে আলতা।

৭. কন বউকে বলব ভাল
ভাত বসিয়ে হাগতে গেল।

৮. মা খায় ভাচা ভেনে,
বেটা খায় এলাচ কিনে।

৯. মাছের মধ্যে রুই
শাগের মধ্যে পুঁই।

১০. রাজায় করে পাপ
প্রজা পায় তাপ।

পুরুলিয়া

গ্রাম তোড়িয়া, থানা মানবাজার, জেলা পুরুলিয়া, তথ্যদাতার নাম গোপাল মাইতি, বয়স ৪৮ বছর, পেশা গৃহকর্ম, সংবাদদাতার নাম শান্তি সিংহ, তারিখ ৮.৫.২০০৪, সময় সকাল ১০-৩০ মি.।

১. মা খায় ভাচা ভেনে,
বেটা খায় এলাচ কিনে।

২. রাজায় করে পাপ
প্রজা পায় তাপ।

৩. দিয়ে থুয়ে করে মান
সেই হল যজমান।

৪ পদ্দার মায়ের সনাও মারে।

৫. বামুন, গণক, কেউয়া।
—তিন পরের খাউয়া।

৬. আমি তেমন মেয়ে নই
জলের ভিতর আগুন দিয়ে
ভাজতে পারি খই।

৭. ছাঁচার জল মড়কচাকে যায়।

৮. মাগা! ভাত তায় বাসি না পান্ত।

৯. কথায় কথায় ফফর দালালি।

নদিয়া

গ্রাম আনন্দপল্লী, থানা করিমপুর, জেলা নদিয়া, তথ্যদাতার নাম স্বপ্না ভট্টাচার্য, বয়স ৫৭, পেশা গৃহকর্ম, সংবাদদাতার নাম চণ্ডীচরণ দে, তারিখ ২৫.৪ ২০০৪, সময় বেলা ১২টা।

১. আলো চাল আর কাঁচা তেঁতুল।

২. আগে তিতা, পাছে মিঠা।

৩. ইষ্ট যেই কেষ্ট সেই
দুয়ে কিছু ভেদ নেই।

৪ উড়ে এসে জুড়ে বসা।

৫ এক যাত্রায় পৃথক ফল।

৬. কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনো।

৭. কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

৮. চেনা বামুনের পৈতা লাগে না।

৯. জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

১০. বেল পাকলে কাকের কী?

মুর্শিদাবাদ

গ্রাম নবগ্রাম, থানা লালবাগ, জেলা মুর্শিদাবাদ, তথ্যদাতার নাম পারুল ঘোষ, স্বামীর নাম নচিকেতা ঘোষ, বয়স ৫০ বছর, পেশা গৃহকর্ম, সংবাদদাতার নাম জনেন্দ্রনাথ পাল, তারিখ ২২.৮.২০০৫, সময় সকাল ১০টা।

১. এক হাতে তালি বাজে না।

২. এক কিল দিয়ে শ' কিল খায়।

৩. ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

৪ আছে গরু না বয় হাল
তার দুঃখ চিরকাল।

৫. আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ,
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ।

৬. এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

৭. কত ধানে কত চাল।

৮. জহুরী না হলে জহর চিনতে পারে না।

৯. ছোট মুখে বড় কথা।
শোনালে করে মাথা ব্যথা।

১০. গলায় কাঁটা ফুটলে বিড়ালের পায়ে পড়া।

মালদহ

গ্রাম রতুয়া, থানা বড়ুয়া, জেলা মালদহ, তথ্যদাতার নাম বিষ্ণুচরণ মাঝি, বয়স ৬০ বছর, পেশা কৃষিকর্ম, সংবাদদাতার নাম রনেন বিশ্বাস, তারিখ ২০.৩.২০০৫, সময় সকাল ১১.৩০ মি.।

১. ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে, বড় সরাটি আছে
নাচ কোঁদ কেন বউ, হাতের ওজন আছে।

২. ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।

৩. বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

৪ পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

৫. ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

৬ দাসীর কথা বাসি হইলেই মিষ্টি লাগে।

৭. দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না।

৮. জীবন, যৌবন গেলে আর ফেরে না।

৯. রতনেই রতন চেনে।

১০. হাতের ফাঁক দিয়ে জলও গলে না।

উত্তরবঙ্গ (জলপাইগুড়ি-কোচবিহার)

গ্রাম জল্পেশ, থানা শিলিগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি, তথ্যদাতার নাম স্মৃতি গঙ্গোপাধ্যায়, বয়স ৫৬, পেশা গৃহকর্ম, সংবাদদাতার নাম সুমন রায়, তারিখ ৮.৫.২০০৪, সময় বেলা ১টা।

১. গরম ভাতে না খাই আদা,
আর সিপাইয়ক না কই দাদা।

২. পতিহীন যৌবন
সাজ গোজ অকারণ।

৩. লইজ্জা বড় বাসি
ভিজা-গামছা মুখত দিয়া
ফাকার ফুকুর হাসি।

৪ পর কি আপন হয়
আর শিমিলায় (শিমুলে) কি চন্দন হয়।

৫. আগ ধাআ বান্ধে আলি
তার খায় নোল-বোয়ালি।

৬. দুই নায়ে দিয়া পাও
এলা করিস মাও মাও।

৭. কইনার মাও ডাক নাই
আপনে আপনে বাক নাই।

৮. ঘাটাত দেখিলে কড়ে মন
বাড়ি আসিলে হয় ঠন ঠন।

৯. মুখে তিল মুচুক হাসি
সেই নারী পরপুরাষি (নষ্টচরিত্র)।

১০. যে ব্যাটা খাইচে মোর
আঙ্গিনা সামটিয়া (ঝাঁট দিয়া)
সেই ব্যাটা গালি দেয়
মোক আঁটকুড়া বলিয়া।

দার্জিলিং

গ্রাম ছোটদোমগছ, থানা ফাঁসিদেওয়া, জেলা দার্জিলিং, তথ্যদাতার নাম পরমিলা সিংহ, বয়স ২৫ বছর, পেশা চা-বাগানের শ্রমিক, সংবাদদাতার নাম শঙ্কর রায়, সাক্ষাৎকারের তারিখ ৩.৩.২০০৫, সময় দুপুর ১২টা।

১. বাউ তুই সতত থাক
আধার রাতি মিলিবে ভাত।
—অর্থাৎ সৎলোকের ভাতের অভাব হয় না।

২. যার কথা এক, স্বর্গে মর্ত্যে ঠেক্।
—অর্থাৎ যার কথার দাম আছে তার স্বর্গে ঠাঁই হয়।

৩. নাচিবা না পালে উঠনি বাঁকা।

—অর্থাৎ নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।

৪ ঘর পোড়া গরু, দিনত চমকায়।

—অর্থাৎ যে গরুর ঘর কোনও কারণবশত পুড়ে গেছে, সেই গরু আকাশে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।

৫. ঘামা মাসি।

—অর্থাৎ একদিকে ভাল, অন্যদিকে খারাপ।

৬. ত্যজি ঠাকুরের ভিক্ষা মাই।

—অর্থাৎ হঠাৎ রেগে গিয়ে ভাল কথা খারাপ ভাবা।

৭. পেটপাখি।

—অর্থাৎ কাউকে দেখে হিংসা করা।

৮. ভগন আছে।

—অর্থাৎ কষ্ট আছে।

৯. বাঁশ বাড়ি গিয়ে বাঁশ কালা।

—অর্থাৎ মুশকিলে পড়া।

১০. আংশং লাগায়ে দেশন।

—অর্থাৎ কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

বাংলাদেশ

ঢাকা

তথ্যদাতার নাম নাজিদ হাসান, বয়স ৫২, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম পাইটি।

১. যে যায় লঙ্কায়
হে অয় রাক্ষস।

২. যাকে দেখতে নারি
তার চলন বাঁকা।

৩. ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

৪. ধেক্কা খাইলে পাক্কা হয়।

৫. ধরারে সরা মন করিছ্ না।

৬. যার নুন খাই
তার গুণ গাই।

৭. রূপে রসে নারী
ঝালে তেলে তরকারি।

৮. স্থানে মান
অস্থানে অপমান।

৯. সতী পায় কুল
অসতী পায় কিল।

১০. সাত পুতের মায় ভিক মাগে
এক পুতের মায় বাদশাহি করে।

নারায়ণগঞ্জ

তথ্যদাতার নাম রওশন আরা, বয়স ৩৫, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম নবীগঞ্জ।

১. গোবরে পদ্মফুল জন্মে না।

২. ঢেহি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

৩. অতি সুন্দরী না পায় বর
অতি গুণবতী না পায় ঘর।

৪. জাতের মেয়ে কালোও ভালো
নদীর জল ঘোলাও ভালো।

৫. এ্যাড়া (ছাড়া/মুক্ত) গরু ভ্যাড়া, (ভেড়া অর্থাৎ এখানে নিরীহ) বান্দা গরু ঘোড়া (অর্থাৎ বন্ধনহীন)।

৬. নিত্যি সুতোয় নুয়া কাটে।

৭. একে মিন মিন (আস্তে আস্তে কথা বলা) দুয়ে পাঠ (পড়াশুনা) তিনে গোলমাল চা'রে হাট (সোরগোল)।

৮. এক কাটে ধারে
আর এক কাটে ভারে।

৯. অতি চালাকের গলায় দড়ি।

১০. চ্যারাকের (প্রদীপের) গোড়ায় অন্ধকার।

মানিকগঞ্জ

তথ্যদাতার নাম মকবুল চৌধুরী, বয়স ৪২, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম সিধুনগর।

১. চোরের নৌকায় সাধুর নিশান।

২. আসল ঘরে মশাল নাই, ঢেঁকির ঘরে বাতি।

৩. সোনা থুইয়া আঁচলে গিঠ।

৪. খাটা মাইনসের নঠা বুদ্ধি।

৫. অকাঠের নায় সুন্দরীর গলই।

৬. ঝাজড় কয় সুঁইরে তোর পাছায় টেরা।

৭. আনবার কৈছি লাঙ্গল, লইয়া আইছে গাই।

৮. যুবতী নারীর হয় আনন্দ বাবায় যদি দেয় বিয়া।
বুড়া বুড়ীর হয় আনন্দ নাতি-নাতনি পাইয়া ॥

৯. ব্যাঙ ব্যাঙ্গির হয় আনন্দ নতুন পানি পাইয়া।
পেটুকের হয় আনন্দ পরের বাড়ি খাইয়া ॥

১০. মাতব্বরের হয় আনন্দ বাড়াইতে মান,
সাধুজনের হয় আনন্দ দান করিতে জ্ঞান।

ফরিদপুর

তথ্যদাতার নাম আবদুল খালেক, বয়স ৫৬, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম চৌমুক।

১. চাঁড়াল বাড়ি কাছিম গেলি খায় না।

২. এক নেড়ি জুটলি
সাত নেড়ির সাথে দেহা হয়।

৩. জানি কাজ পানি,
না-জানি কাজ
আস্‌মান আর জমিন।

৪. মাকড় মাল্লি ধোকড় (কাঁথা-কাপড়) হয় না।

৫. নিজের মাচায় থাকলি
সব চাচার নাগোল পাওয়া যায়।

৬. পরের পিঠে
বেজায় মিঠে।

৭. চাচী বড় মাট (চালাক)
পাছার কাপড় তুলে দেখো
আশিখান দাদ।

৮. থাকতি দেলো না ভাত-কাপড়
মরলি দেবেনে থান-কাপড়।

৯. আমি কান্দি মা'র লা'গে।
মা কান্দে নাঙের লা'গে ॥

১০. ছাগলে বলে আল্লে (লবণছাড়া) খা'লাম
গিরস্থ বলে পরানে ম'লাম।

যশোর

তথ্যদাতার নাম মীনা বেগম, বয়স ৪২, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম হাজারহাটী।

১. খোঁড়ার কুড়ি বুদ্ধি।

২. তেলো মাথায় সগলিই তেল ঢালে।

৩. গরিবির কথা বাসি হ'লি খাটে।

৪. ওঠ্ ছেমড়ি তোর বিয়ে
ধুচ্নি মাথায় দিয়ে।

৫. আমি কান্দি মা'র লা'গে
মা কান্দে নাঙের লা'গে।

৬. বাড়ির ভাতও খা'লাম না
ম্যাজবানীতিও গেলাম না।

৭. খাওয়ার সময় গাই,
বিয়োবার সময় বাছুর।

৮. আষাঢ়ে মা'য়ে না ভাদুরে মা'য়ে।

৯. পুঁটি মাছের পরাণ।

১০. এক মাঘে শীত যায় না।

খুলনা

তথ্যদাতার নাম নুরুল হুদা, বয়স ৫৫, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম ফতেপুর।

১. বাপের বাড়ির মাটি
চুপচুপোয়ে হাঁটি,
শ্বশুর বাড়ির মাটি
দবদবায়ে হাঁটি।

২. মার পেটেব ভাই
মা'র (মেরে) যায় তবু ফিরে চাই।

৩. হাজার টাহা সিথেনে
কান ভাঙানি পোথেনে।

৪. সব কুটুম আমার মাচায় (মাচান— ধান রাখার স্থান)।

৫. কুহরির (কুকুরির) প্যাটে ঘি-ভাত সয় না।

৬. দুধ নষ্ট গো-চ্যানায় (গো-মূত্র)
ছেলে নষ্ট হাটে,
বউ নষ্ট না'য়ের (নাইওর)
মেয়ে নষ্ট ঘাটে।

৭. নিম তিতে, নিশিন্দে তিতে,
তিতে মাকাল ফল,
তাব চেয়ে অধিক তিতে
দুই সতীনের ঘর।

৮. মা'র পেটের ভাই,
কোথায় যেয়ে পাই।

৯. য্যানে (যেখানে) গেলি বাঘের ভয়,
সেহেলি (সেখানে) গেলি রাত হয়।

১০. কথায় কথা বাড়ে,
ভোজনে বাড়ে পেট।

কুষ্টিয়া

তথ্যদাতার নাম রোকসানা বেগম, বয়স ৪০, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম জাগলবা।

১. অতি খাতিরে পেট ডাগর (বড়)।

২. আল্লার নামে ধরছি পারি
জানি না আর বাঁচি মরি।

৩. কাম আপনা, ভাত পরের।

৪. ছোট ছোট কামড়ে,
সব ভাতই হামুরে।

৫. ক্ষেত ছাড়ায় পেতি (অভাব)
পুতে (পুত্র) ছাড়ায় দুর্গতি।

৬. তরকারীর মাইঝে ছই (সিম)
খেসের মাইঝে মই (খালা)।

৭. বেটার কথায় হাতির দাঁত।

৮. যার লাগে যার বাদ
আন্ধার ঘরে চক্ষু পাক।

৯. লোকের মুখেই জয়,
লোকের মুখেই ক্ষয়।

১০. হাতে কর হাতের কাম
মুখে লও আল্লার নাম।

কুমিল্লা

তথ্যদাতার নাম লতা নায়েক, বয়স ৪৩, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম রত্নবতী।

১. শিলে বাটায় ঘষাকষি
মইচের (মরিচের) জীবন শেষ।

২. যার লাগি করলাম চুরি সেই ডাকে চোরা।
খাইট্টা মায়না নাই, বখতই আমার বুরা।

৩. মা না দেয় চাইয়া
পেট না ভরে খাইয়া।

৪. ভোগের কিল বাপেও কিলায়।

৫. বুঝের দুষমনও ভাল,
বে-বুঝের দস্তও ভাল না।

৬. তিন তিরিশার নাথ
বুইড়া গরুর দাঁত।

৭ জয়ের কালে ক্ষয় নাই
মরার কালে ঔষধ নাই।

৮. ছোটলোকের বিষ হাতে,
বড়লোকের বিষ দাঁতে।

৯. এই যে শেখ ফকিরের কারখানা
বাড়ে সব কমে না।

১০. আল্লার নামে ধরছি পারি
জানি না আর বাঁচি মরি।

ময়মনসিংহ

তথ্যদাতার নাম পারুল বিশ্বাস, বয়স ৪৪, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম ঘাঘরা।

১. আগেও না, পতও ছাড়ে না।

২. কানার মনে মনেই জানা।

৩. কপালে আছে আর (হার), কি করবো চাচা শাহিদার।

৪. চুরের মনে পুলিশ পুলিশ।

৫. জরে (ঝড়ে) বগা মরে, ফহিরের কেরামতি বাড়ে।

৬. ডেহি স্বর্গে গেলেও ধান বানে (ভানে)।

৭. টেহা করে কাম, মিছা মর্দের নাম।

৮. ঠেলাত পরলে বাগেও দান খায়।

৯. মাহর মরলে দুহর অয়।

১০. যার মুরগী হে খায় আগাগোড়া,
পাড়া পড়াশিয়ে খায় রান।

কিশোরগঞ্জ

তথ্যদাতার নাম মহম্মদ সাইদুর, বয়স ৬[illegible], পেশা গবেষক, গ্রাম বগাদিয়া।

১. অতি চালাকের গলায় দড়ি।

২. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
চুনোপুঁটির পরাণ যায়।

৩. মন চাঙ্গা, কাটে গঙ্গা।

৪. কানার রাতই বা কি,
আর দিনই বা কি?

৫. ফল ফল নারিকেল ফল,
সুন্দরী নারী আর গঙ্গার জল।

৬. ধম্মের কল বাতাসে নড়ে।

৭. ভাগের ভুই ভাগে দিয়ে যাওয়া-আসা সার।

৮. নিজে বাঁচলি বাবার নাম।

৯. গরিবির কথা বাসি হলি খাটে।

১০. মনে যা' কয়
পোনে (বাস্তবে) তা' হয়।

জামালপুর

তথ্যদাতার নাম রেহানা সুলতানা, বয়স ৩৮, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম পাকুটিয়া।

১. পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ।

২ শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি
দুইদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

৩. যার কাজ তারে সাজে
আর সব আজে বাজে।

৪. কালি কলম মন, লেখে তিনজন।

৫. উঠ ছেড়ি তোর বিয়ে,
হলুদ মেন্দী দিয়ে।

৬. ঘাটে পাইলাম কামার,
দাও বানাই দেও আমার।

৭. হাতি ভ্যাদে (গর্তে) পড়লে
চামচিকাও লাথি মারে।

৮. যেমন বুনো ওল
তেমনি বাঘা তেঁতুল।

৯. আকাশ-কোদলা, বাঁধগে আল
আজ হবে না, হবে কাল।

১০. গরীবেব বাড়ি হাতির পারা।

পাবনা

তথ্যদাতার নাম সোনা বেগম, বয়স ৩৫, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম হেমায়েতপুর।

১. ধজে (ধ্বজ) মানুয, গজে কলা।

২. হাতির নিমিঝিমি (ধীরপদক্ষেপ)
ঘোড়ার দৌড়।

৩. ঝাল জব্দ শিলি (শিলে)
বউ জব্দ কিলি (কিলে)।

৪. দো-দেল বান্দা কলমা চোর,
না পায় স্বর্গ, না পায় গোর।

৫. মন চাঙ্গা (সতেজ), কাটে গঙ্গা।

৬. শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

৭. যার মা-কে খেয়েছে কুম্বির
তার ঢেঁহি দেখলি ভয় করে।

৮. ডান হাতখান দিলি
বাম হাতখান পাওয়া যায়।

৯. সৎসঙ্গে স্বর্গবাস,
অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

১০. দুধির স্বাদ ঘোলে মেটে না।

সিরাজগঞ্জ

তথ্যদাতার নাম সিরাজুল ইসলাম, বয়স ৪৮, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম ঘোষগাতি।

১. সাদা কাপড়ে কাদা লাগে বেশি।

২. লেপ্‌লি পুছ্‌লি ঘর,
কামালি কুমালি বর।

৩. পরের ভাতে কাপড় নষ্ট,
পরের তেলে মাথা নষ্ট।

৪. মানীর মান আল্লা রাহে।

৫. লাভে লোহা বয়,
বিনি লাভে তুলোও বয় না।

৬. সকাল বেলার বিষ্টি
মুচির বাবার শ্রাদ্ধ—
হয় জয় বন্দে না।

৭. আপন চেয়ে পর ভালো,
পর চেয়ে জঙ্গল ভালো।

৮. শরীরের নাম মহাশয়,
যা' সহাও তাই সয়।

৯. ধম্মের কল বাতাসে নড়ে।

১০. মা'-র গুণে ছা (অর্থাৎ বাচ্চা বা মেয়ে)
বাপের গুণে বেটা।

রাজশাহী

তথ্যদাতার নাম সৈফুদ্দিন চৌধুরী, বয়স ৫০, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম ঘোড়াঘাট।

১. যম জামাই জমিদার
তিন নয় আপনার।

২. বোকার ফসল পোকায় খায়।

৩. অধিক লোভে তাঁতি নষ্ট।

৪. সব বাঘের নড়ানড়ি
বুড়ো বাঘের গলায় দড়ি।

৫. ভালোর ভালো মন্দেব তিন দাদা।

৬. রসিকে রসিক চিনে
ভোমরে চিনে মধু
আজন্মের বেন্না চিনে
জাল মাছ আর কদু।

৭. যার নৌকা তারই প্যাইট,
ঠাকুর যাবে শিবজাঠ।

৮ ঠেলাঠেলির ঘর
খোদায় রক্ষা কর।

৯. নাচতে না জানলে উঠান বেঁকা।

১০. চোরের বাড়িতে দালান উঠে না।

সুনামগঞ্জ

তথ্যদাতার নাম তপন বারিক, বয়স ৩৮, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম ধানাইদহ।

১. পান-পানি-নারী—এই তিনে জৈন্তাপুরী।

২. মায়ে ঝি, গাইয়ে ঘি
বাপে বেটা, গাছে গোটা।

৩. খাল নাই কুত্তা
বাঘ রাজনাম।

৪. বাড়ির মাঝে কড়ই
মেঘনে দুরই।

৫. গোয়া নষ্ট পোয়া বায়
পুরি নষ্ট করল মায়,
পোয়া নষ্ট,
আড়িপড়ির বাড়ি যায়।

৬. আগে খাট্টা পিছে ডাইল
বিয়া করছতে যা-গি কানি আইল।

৭. ছাতকি চুন, জৈন্তাপুরি পান
ছিরিমঙ্গলের চা-পাতা, হাছন রাজার গান।

৮. ঢাখা দক্কিন্ ঢাখা উত্তর
দ্বিয়োটা ছিলটর ভিত্তর।

৯. কুয়ায় থাকি আইল উমান্যা বেটা
হে পাইল মাউগের বাটা।
আর আমি যে চাচার ঘরে ভাই
আমার লাগি মাউগ নাই।

১০. আইলে খুশি, মৈলে বাসি।

গোপালগঞ্জ

তথ্যদাতার নাম লছমন মোল্লা, বয়স ৫৮, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম তাজপুর।

১. ঘুঘু দ্যাখছো ঘুঘুর ফাঁদ দেখো নাই।

২. যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়শির ঘুম নাই।

৩. দা'য়ে ধার নাই, আছাড়ীতে জুত আছে।

৪. মানুষ মারা গেলে থাকে শুধু কথা,
কাপড় ছিঁড়ে গেলে থাকে শুধু কাঁথা।

৫. বোঝার উপর শাগের আঁটি।

৬. লেবু অনেক চিপড়ালে তিতা হয়ে যায়।

৭. উড়ে আসলো শ্যাখ, তার ধর্মেচিহ্নান দ্যাখ।

৮. ভাত ছাড় তেবু সাথ ছাইড় না।

৯. দারোগার চেয়ে দারোগার মাঝির চোট বেশি।

১০. ধর্মের জন্য দীনতা, প্রকাশ করে নম্রতা।

লালমনির হাট

তথ্যদাতার নাম আবদুল করিম, বয়স ৪৭, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম খালপাড়া।

১ আছে গরু না বয় হাল
তার দুঃখ সারাকাল।

২. যাঁয় যায় গয়া
তায় কি বেড়ায় কয়া।

৩. যতদূর নামবু, ততদূর ভিজবু।

৪. ফুটানীর মামা, তলোত নেংটি উপরাত জামা।

৫. কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে।

৬. উঠপার না পায় বুড়ি, দাঁতের করমরি।

৭. সারা মুখে দই, ভাত কয় কই কই?

৮. আগা না ভাবিনু, পাছ না ভাবিনু, বড়র সঙ্গে করিনু মেলা,
আদরও না পানু, ঠোঁটও কেলটানু, বসিয়া কাঁন্দোং এলা।

৯. বাপুই তোর গুণ, আন্দা শাগত (শাক) দেসি নুন।

১০. দেরে বেঁধ থ্যাক না জ্বাল, দূরের মাগাই যাউক সকাল।

নীলফামারী

তথ্যদাতার নাম জ্যোতিপ্রকাশ সাহা, বয়স ৪৮, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম বড়বাজার।

১. ছাওয়া চিনে বাপ,
মনে চিনে পাপ।

২. যাঞ করে পরের আশ
নিত্য থাকে তাঞ উপবাস।

৩. দানে না দুর্গতি খণ্ডে
ছিনালে না খণ্ডে পাপ।

৪. আকালত না খায় কি,
ঝগড়াত না কয় কি।

৫. সাপে খায় লেখলে বাগে খাই দেখলে।

৬. মুডে মায় রান্দে না,
তপ্ত আর পান্তা।

৭. নাপিত দেখতে কুনির নৌখ বারে।

৮. টেহা অইলে বাপের চৌক পাওয়া যায়।

৯. থাকতে কাচি, আরাইলে দাও।

১০. এমনিই নাচুন্যা বুড়ি আরো পাইছে ঢুলের বারি।

জয়পুরহাট

তথ্যদাতার নাম জলিল আহমদ, বয়স ৫৪, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম খিলগাঁ।

১. কতই দেকপ (দেখবো) কতই আর
বিলার (বিড়ালের) গলায় চন্দ্রহার।

২. দেকা (দেখতে) না পারলে হাটন বেঁকা।

৩. যেই চেহারা
তার নাও (নাম) খুচে (রাখছে) পিয়ারা।

৪. হেসে হেসে বলে কথা,
কপাল ছেলে ধরে মাথা।

৫. লাকের (নাকের) উপর দিয়ে লাও (নৌকা) গেছেরে।

৬. কাকা কতা (কথা) কোসনে (বলিস না)
চত (চৈত্র) মাসত (মাসে) বান (বন্যা)।

৭. না পারা বলদের আঁতর (অন্তর) বড়।

৮. বাপ দাদাত নাই গাই (গাভি)
চালুন (ভাণ্ড) লিয়ে (নিয়ে) দুবা (দোহন) যাই।

৯. জামায়ের তোংকে (জন্য) মারে হাঁস
সারা বাড়ি খায় মাস (মাংস)।

১০. নামে গগন (আকাশ) ফাটে (ফেটে যায়)
হাড়ি পাতিল কুত্তায়ে (কুকুর) চাটে।

ঝালকাঠি

তথ্যদাতার নাম ফকিরুদ্দীন শাহ্‌, বয়স ৫২, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম মহাস্থান।

১. পায় না পচা পুঁটি
খাইতে চায় ঘি রুটি।

২. মা চায় আঁৎ পানে
বউ চায় ভাত পানে।

৩. বউ ভাল বটে
ঠোক্‌না খাইয়া বাটনা বাটে।

৪. গিন্নির হাতে রাঙা পলা
বৌয়ের হাতে সোনার বালা।

৫. যার ঘরে নাই ঢেঁকি মোষল
সেই বউ ঝি'র নাইকো কুমাল।

৬. ঘরে নাই ঘটিবাটি
বউর কপালে সিঁথিপাটি।

৭. মার চাইয়া পোড়ে মাসী
ঝাল খাইয়া মরে পাড়াপড়শি।

৮. আচারে রাঁধে বিচারে খায়
শাশুড়ি বউয়ের কাম না ফুরায়।

৯. উনা কাম দুনা করে
তেল কিন্যা ছালা ভলে।

১০. বাপ দাদার নাম নাই
চানমল্লের বেয়াই।

চুয়াডাঙ্গা

তথ্যদাতার নাম নবী শেখ, বয়স ৪৮, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম জাগলবা।

১. যার বিয়ে তার খবর নাই
পাড়া-পড়শির ঘুম নেই।

২. মা পায় না খাতা সেলাই করার সুতো।
ছেলের পায়ে চোদ্দ সিকির জুতো।

৩. নেই কাজ তো খৈ ভাজ।

৪. বারো মণ ঘিও জুটবে না, রাধা জুটবে না।

৫. কি কথা বলবো সই
পান্তা ভাতে টক দই।

৬. জ্বরে আর কি করে, পিলেতে দফা সারে।

৭. বেটে নাগারী মাঁচার খুঁটি
খায় দায় সরপুটি।

৮. পায় না পচা পুঁটি, খেতে চায় গোশতরুটি।

৯. ভাত দেয়ার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই।

১০ ধান ভানতে বললে বৌ আড়ামোড়া ছাড়ে
ঘাটে যেতে বললে যেন তেজি ঘোড়া ছোটে।

বরিশাল

তথ্যদাতার নাম মিহির দত্ত, বয়স ৫৮, পেশা সাংবাদিকতা, গ্রাম উলানিয়া।

১. মোড়ে মায় রান্দে না, তপ্ত আর পান্তা।

২. মায়ের পরনে ছাবির ত্যানা, পোলায় করে বাবুয়ানা।

৩. যদি কতা কই, বাইঙ্গা পড়ে দৈ।

৪. ঘর নাই দুয়ার দিয়া হোয়।

৫. ঠ্যাডা তক্কো।

৬. দুইদিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় পস্যাদী।

৭. ছ্যাপ চলে না, দুধ রোজ।

৮. রাজা বাড়ি কেরতোন, কেডি নামে পেরথোম।

৯. পয়সা দিয়া খামু দই, গোয়ালনী আমার কিসের সই।

১০. য্যাগো বাড়ি এতো সিডা, ফ্যান দিয়া খায় হেরা পিডা।

নোয়াখালী

তথ্যদাতার নাম রতন বক্সী, বয়স ৪৫, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম কাবিলপুর।

১. হোলা (ছেলে) নষ্ট আঁড়ে (হাটে)
মাইয়া নষ্ট ঘাঁড়ে (ঘাটে)।

২ বড়ের কতা লড়ে না
গজের দাঁত হড়ে না।

৩. মায় কয়না মার পুত
মইয়ে কয় বইন হুত।

৪. বাপ আনমান বেডা
গাছ্ আনমান গোড়া
মা আনমান ঝি
গাই আনমান ঘি।

৫. মার বইন খালা, মাত্তানো বালা,
বাপের বইন লূ, কুত্তার বইন রু।

৬. ঘরের কতা বার কইল্যে তারে কয় হর,
চৈত মাসে খেঁতা গাদ্দিলে তারে কয় জ্বর।

৭. দেইকতো হারে না মারে,
হোলা দি বোলায় তারে।

৮. রান্ধি বাড়ি যেবা নারী—পুরুষের আগে খায়।
ভরা কলসির জল তার তরাসে শুকায়।

৯. মঙ্গলে উষা বুধে পা—যথা ইচ্ছা তথা যা।

১০. সাপ-শালা-জমিদার—তিন নয় আপনার।

ভোলা

তথ্যদাতার নাম রীনা বেগম, বয়স ২৮, পেশা সূচিশিল্প, গ্রাম বেল্কা।

১. যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় নয় জন।

২. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

৩. গুরু নিন্দায় অধোগতি।

৪. চালুনি বলে সুঁচকে তোর পিছনে কেন ছেদা।

৫. সবুরে মেওয়া ফলে।

৬. ধান-সুপারী-গোলা—এই তিনে ভোলা।

৭. বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও তবে।

৮. মানুষ অভ্যাসের দাস।

৯. হালের চাইতে হাডে বেশি
ফোত্‌রা ঢেঁহির বাদ্য বেশি।

সিলেট

তথ্যদাতার নাম নিয়ামত হোসেন, বয়স ৫৭, পেশা কৃষিকাজ, গ্রাম বৃন্দাবনপুর।

১. আইজ খায় না রাগে
কাইল হক্কলের আগে।

২. কুল গেল কলঙ্ক রইল।

৩. ধন, জন, জোয়ানী
কচু পাতার পানি।

৪. ধর্মের জয়
অধর্মের ক্ষয়।

৫. না হালের না বীচের।

৬. ধনে না হয়
বচনে দরিদ্র নয়।

৭. ধরি মাছ না ছুই পানি।

৮. ধন দৌলত চুনের ফুটা।
যায় ধন থাকে খুটা।

৯. নষ্ট নষ্ট দুই
চাল ছাইয়া যে ধরে ঠুঁই।

১০. যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

ফেনী

তথ্যদাতার নাম রুমি বেগম, বয়স ৩৭, পেশা গৃহকর্ম, গ্রাম তাজপুর।

১. চোরের বাড়িতে দালান ওঠে না।

২. চোরে চোরে আলি
এক চোরে বিয়া করে
আরেক চোরের হালি।

৩. ঠেলাঠেলির ঘর
খোদায় রক্ষা কর।

৪. বাঙ্গালের পেটে ঘি হজম হয় না।

৫. কুত্তার লেইঙ্গা বার বছর
চুঙ্গাতে ভরি রাইখলেও, সোজা অয় না।

৬. এক গাছের ছাল, আরেক গাছে লাগে না।

৭. আগের আল যেমনে যায়
হিছের আলও হেমনে যায়।

৮. নাইচতে না জাঁইনলে উডান বেঁয়া।

৯. দেশে আইছে মীরজাফর
ঘর দুয়ার বেক হামাল কব।

১০. হৈরায় কয়
বৈরাইও গায়ে মাগি খায়।

চট্টগ্রাম

তথ্যদাতার নাম রোহিত বড়ুয়া, বয়স ৪৭, পেশা শিক্ষকতা, গ্রাম পটিয়া।

১. বান্দীর কামে যশ নাই
পান্তা ভাতে কস নাই।

২. বাপ-মা পায় না ভাত
আম্‌রা ফুল হুংবায় (শুঁকবার) জাত।

৩. বার আংগুল কাঁক্‌ডুলের তের আংগুল গুডা।

৪. বাপ দাদার নাম নাই
চান মলেলর বেহাই।

৫. ঠগ বাছলে দুন্যাই উজাড়।

৬. অতি আদরে বাওয়াস
অনাদরে সর্বনাশ।

৭. আত্তির লেদা দেইখ্যা খাড়াশের (খরগোশ) কুঁথানি।

৮. কুয়ার বেঙ্ সায়রের খবর জানে না।

৯. ক্ষেত পাখালে (জল নষ্ট করলে) সয়।
পেট পাখালে সয় না।

১০. ঘব-জামাই বান্দীর পুত
হিথান (শিয়র) থুইয়া পৈথানে (পদস্থান) পুত।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত প্রবাদমূলক বাক্যাংশ

বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা, মেয়েলী ব্রতকথা, বাউলগান ইত্যাদি লোকসংগীত সংগ্রহে তাঁর ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। প্রত্যক্ষত প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ না করলেও বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে তাব প্রয়োগপ্রযুক্তি সমুদ্রবিশেষ। জীবনের প্রান্তসীমায় 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) লেখার সময় বাংলা বাগ্‌ধারা এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির গুরুত্ব অনুভব করে সেগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত কিছু প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এখানে সংকলিত—

১. গা জ্বালা করে
২. পিত্তি জ্বলে যায়
৩. বুক জুড়িয়ে যাও
৪. তুলো ধুনে দেওয়া
৫. পাড়ায় পাড়ায় ঢী ঢী করা (দুর্নাম)
৬. বুদ্ধির ঢেঁকি
৭. ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির
৮. ঘেন্নাপিত্তি
৯. গায়ে ফুঁ দেওয়া
১০. নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো
১১. চেঁচিয়ে মাৎ
১২. শুকনো কাট খোট্টা
১৩. আষ্টে পিষ্টে বাঁধন

১৪. পাঁচ ভূতে লুটেছে
১৫. ভূতের কের্তন
১৬. হাড় জ্বালাতন
১৭ হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি
১৮. তেলে বেগুনে জ্বলে
১৯. দা কুমড়ো
২০. আদায় কাঁচ কলা
২১. ভাসুর ভাদ্র বৌ
২২. ভিটেয় ঘুঘু চরানো
২৩. ভিটে মাটি উচ্ছন্ন
২৪. ছাতি ফেটে যাওয়া
২৫. সাত পাঁচ ভেবে
২৬. মাটির মানুষ
২৭. হেসে অজ্ঞান
২৮. হাস্‌তে ২ পেট ফাটা
২৯. কানে তালা ধরানো
৩০. একূল ওকূল দুকূল যাওয়া
৩১. সাতেও নেই
পাঁচেও নেই।
৩২. মাথায় মাথায় ভাবনা
৩৩. হেস্ত নেস্ত করা।

১. রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সংগ্রহের প্রতিলিপি

96 **MARCH, 1938**

Fuslee.—Chyt, 1345. Mus.—Mohurrum. 1357.
Samvat.—Chyt. (Budee) 1994. Beng.—Chaitra, 1344.

29 Tuesday [88—277]

Fus.—13 Chyt. *Sam.*—13 Chyt (Budee). *Mus.*—26 Mohurrum.
Beng.—15 Chaitra, *Trayodasi* 1-42 *n.*

২. ক. উইলিয়ম মর্টনের 'দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ।

OR

A COLLECTION OF PROVERBS,

Bengali and Sanscrit,

WITH

THEIR TRANSLATION AND APPLICATION

IN ENGLISH.



BY

THE REV. W. MORTON,

Senior Missionary of the Incorporated Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts.

Calcutta:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

SOLD BY MESSRS. THACKER AND CO. ST. ANDREW'S LIBRARY.

1832.

PREFACE

The Present publication arose from the following circumstances Understanding that Mr. W. H. Pearce, of the Circular Road Press, was in possession of a series of Native Proverbial Sayings, and desirous simply of persuing them, I applied to that gentleman for the loan of his MS. who not only, in the handsomest manner, conferred the kindness solicited, but added, with a liberality that reflects upon him the highest credit, that should I feel disposed to undertake the task of revisal and translation, with a view to publication, his materials were at my diposal. The present work is the result; a work which can scarcely fail to be of service to those who study the Bengali language, whether with a view to convey instruction to the Natives themselves, or to obtain an insight into their characters, habits and modes of thinking.

The original Proverbs were, for the greater part, collected for Mr. Pearce by Natives around him. A few were kindly supplied me by my friend Mr. Reichardt. My task has been, besides correction the very numerous errors in orthography, &c. and embodying with these such additional sayings as my own reading and conversation have furnished me with, to add a translation of the whole, with a notice of the application designed, corrected and enlarged from a Bengali one

attached, in most cases, to the original, and always carefully verified.

The translation aims more at correctness than elegance, which latter quality is scarcely indeed compatible either with the homeliness of most of these aphorisms, or with the literality indispensable to the object in view in presenting them to the European public. Delicacy and propriety too, have sometimes demanded a deviation from the coarseness of the original Proverbs, which nevertheless it was judged will not to withhold, as serving to the immediate design of the publication. I must not, however, be considered responsible for any sentiments expressed, in many cases so directly at variance with the truth of nature, policy or science: my office is not to patronize opinions, but to exhibit them, in order to aid an insight into the structure of the native mind, and in doing so I trust I shall not have been unsuccessfully employed, or have expended without an adequate result of advantage, the labour, by no means inconsiderable, necessarily undergone.

The estimates formed of this collection may be various. Some may deem a large portion of its contents mean; and current among and illiterate people, the style is of course often low and incorrect; yet as the actual expression, in customary language, of the national character and notions, it is only the more valuable. Avarice and cunning, selfishness and apathy, everywhere show themselves; the sordidness of worldly aims, and indifference to higher, are seen to flow naturally from a base idolatry that confers neither elevation of mind nor purity of heart

Hence, however, a greater sympathy with the demoralized condition and superstitious ignorance of a whole people, will probably be excited,—and consequently a more diligent and pitying activity exerted, in endeavouring to introduce amongst them the light of truth, the power of a rational piety, a holy and spiritual religion.

Nor, judging from my own experience, is the advantage small, I apprehend, derivable from this collection, towards understanding many otherwise obscure passages in books, or concise allusions in the conversation of Natives. In this view are added to the Bengali a few Sanscrit proverbs frequently heard from the mouths of the better instructed, or met with in the higher publications

In conclusion, the merit of the suggestion of the present work is due entirely to Mr. Pearce; as well as that of having caused the far larger portion of the collection to be made—the deficiencies in execution, be they what they may, are attributable only to myself It should be observed, however, that isolated sentences like these, and often incomplete in grammatical structure, are peculiarly difficult and frequently susceptible of various renderings, if, therefore, I have occasionally failed to seize the just intention of a Proverb, this circumstance must plead excuse for me with the candid and considerate reader.

I now resign to the judgment of those for whose benefit I have been occupied, the result of an application, the object of which, doubtless, will obtain for my work that measure of indulgence which it may require.

CHINSURA, *july*, 1832 W M

২. গ. 'দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ' (১৮৩২) গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

A

COLLECTION OF PROVERBS, &c.*



1. উঠিত মূলা পাতায় চেনা যায়।

The springing radish is known by its first leaf-sprouts.

Meaning, that as the size of these decides that of the mature radish, so the future eminence or excellence of a man may be determined by the earliest indications of his disposition.

2. বাঘের গোবধ।

'Tis the tiger's preying on the cow.

Intimating, that if evil-disposed men injure others, or practise any villainy, it is but what was to be expected; as the natural ferocity of the tiger impels him to devour the useful cow.

3. ছুঁচো গন্ধে রক্ষা নাই, বোটকা গন্ধ কয়।

He cannot get rid of the stench of the musk-rat, and says every thing smells rank.

A sarcasm on one who, though wretchedly poor, yet when away from home boasts himself wealthy—as one who having in his own abode eaten something affected with the smell of the musk-rat, being invited to another's feast, supposes an ill savour in the best article of food presented him.

D

৩. ক. জেমস্ লঙ্ সংগৃহীত ও নির্বাচিত বিদেশি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রবাদের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ 'প্রবাদমালা' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৯)-এর আখ্যাপত্র

PROVERBS OF EURC AND ASIA.

TRANSLATED

INTO

THE BENGALI LANGUAGE

[illegible]

প্রবাদমালা।



দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্গীয় [illegible] অনুবাদিত

CALCUTTA:

PRINTED BY JAGANMOHANA TARKALANKARA
KAVYAPRAKASHA PRESS 168 CORNWALLIS STREET
FOR THE CALCUTTA SCHOOL BOOK AND VERNA-
CULAR LITERATURE SOCIETY [illegible] GOVERNMENT
PLACE EAST

1869

অনু — রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. খ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ 'প্রবাদমালা' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৯)-এর জেমস্ লঙ্ কৃত 'Preface'

PREFACE.

The following contains a free Translation into Bengali by Babu Ranga Lal Banerjea of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Badaga, Malaylum, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages.

The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit and wisdom of Peasants and women in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.

Calcutta, November 15, 1869. J. LONG

৩. গ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ 'প্রবাদমালা' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৯)-এর প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

প্রবাদমালা।

দ্বিতীয়ভাগ।

জর্ম্মণীয় প্রবাদ।

১। অধিক দিন বাঁচিতে চাহ তো কুকুরের [illegible] পান কর, আর বিড়ালের ন্যায় আহার কর।

২। অনুতাপই অন্তঃকরণের ঔষধ।

৩। আগুন আর জল উত্তম দাস বটে; কিন্তু প্রভু ভাল নহে।

৪। আব্রাহিম [illegible] শান্তি, নিরাপদ্ [illegible]।

৫। আলস্য দরিদ্রতার চাবি।

৬। আলো মাত্রেই সূর্য্য নহে।

৭। আহার যে ভয় করে, অনাহারে সেই মরে।

৮। উকীল আর গাড়ীর চাকায় তেলচর্বির প্রয়োজন।

৯। উৎক্রোশ কখন সাহী সাজে না।

১০। উদর বড় কুমন্ত্রী।

৪. ক. জেমস্ লঙ্ সংগৃহীত 'প্রবাদমালা' (১৮৭২) গ্রন্থের আখ্যাপত্র

[illegible] BENGALI PROVERBS

AND

PROVERBIAL SAYINGS

ILLUSTRATING

NATIVE LIFE AND FEELING

[illegible]

RYOTS AND WOMEN

প্রবাদ মালা।

[illegible]

বিবিধ [illegible] ব্যবহার মূলক

কলিকাতা।

[illegible] যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৬ [illegible] সন ১৮৭২ সাল।

৪. খ. জেমস্ লঙ্-এর 'প্রবাদমালা' (১৮৭২) গ্রন্থের 'Preface'

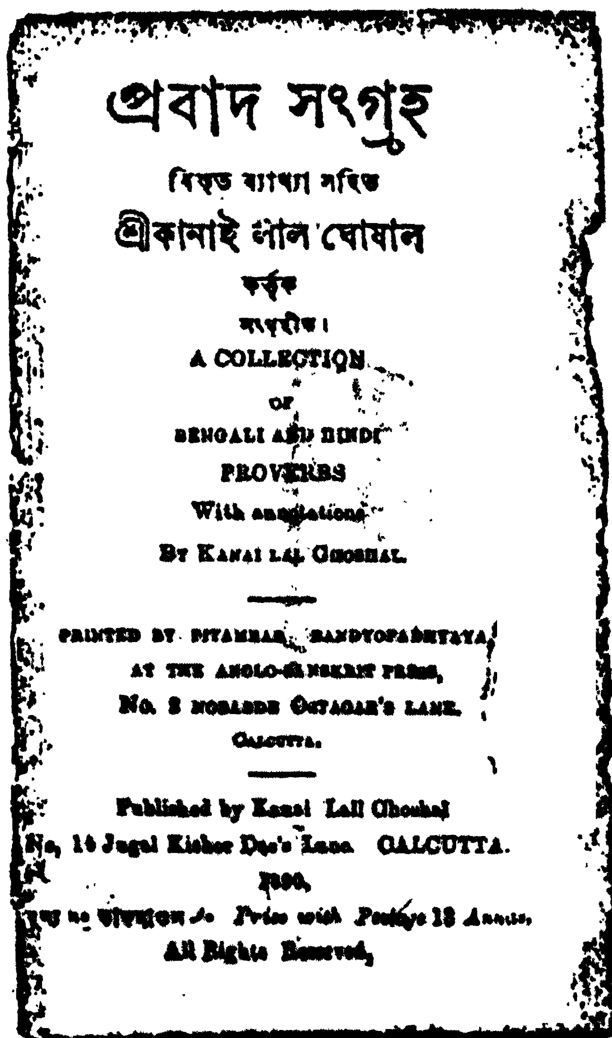
This little work completes the series of Proverbs and Proverbial sayings of Bengal which I have brought out in co-operation with Pandit Nobin Chunder Bunarjyea and other Native Gentlemen to whom I owe a deep debt of obligation for the assistance they rendered.

The series consists of about 6000 proverbs, but there are still many local sayings unpublished, and I hope some Native Gentlemen will continue my work in this direction.

J. LONG.

CALCUTTA 11TH MARCH 1872.

৫. কানাইলাল ঘোষাল কর্তৃক সংগৃহীত 'প্রবাদ সংগ্রহ' (১৮৯০) গ্রন্থের আখ্যাপত্র



প্রবাদ সংগ্রহ

বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত

শ্রীকানাই লাল ঘোষাল

কর্তৃক

সংগৃহীত।

A COLLECTION

OF

BENGALI AND HINDI

PROVERBS

With annotations

By Kanai Lal Ghoshal.

PRINTED BY PITAMBAR BANDYOPADHYAYA

AT THE ANGLO-SANSKRIT PRESS,

No. 8 NOBABDE OSTAGAR'S LANE.

CALCUTTA.

Published by Kanai Lall Ghoshal

No, 16 Jugal Kishor Das's Lane. CALCUTTA.

1890.

[illegible] ৸০ Price with Postage 13 Annas,

All Rights Reserved,

৬. দ্বারকানাথ বসু প্রণীত ‘প্রবাদ-পুস্তক’ (১৮৯৩) গ্রন্থের আখ্যাপত্র

প্রবাদ-পুস্তক

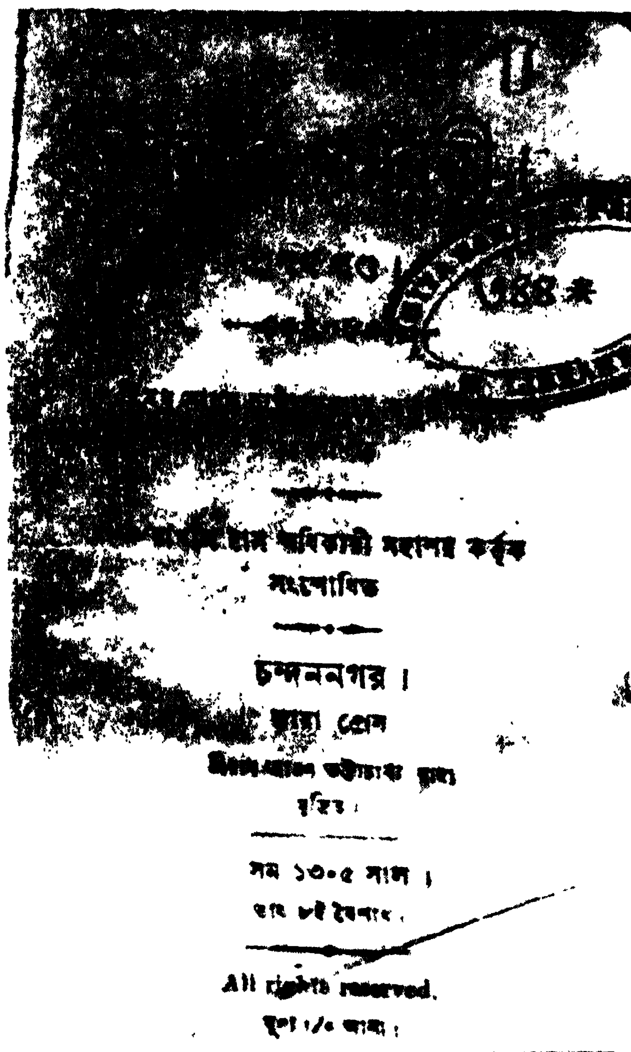
[প্রবাদতত্ত্ব ও প্রবাদমালা]

শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত

কলিকাতা
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র
১৮৯৩



৭. ক. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' (১৩০৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্র



মহাশয় কর্তৃক

সংশোধিত

চন্দননগর।

প্রেস

সন ১৩০৫ সাল।

মূল্য ।/০ আনা।

৭. খ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' (১৩০৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সূচিপত্র

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী

সহায়—

সূচীপত্র

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

৶৹

৭. গ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' (১৩০৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী

সহায়।—

ভূমিকা।

বঙ্গদেশে সাধুভাষা প্রাকৃত ভাষা ও যাবনিক ভাষায় বিবিধ গ্রাম্য ও বিশুদ্ধ প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, বিভিন্ন প্রকার পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিলেও আমি বহু যত্নে যতদূর পারিয়াছি সেই সকল প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া অশ্লীল অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব-কপোল কল্পিত এবং তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নানা উদাহরণ ও গদ্য পদ্যাদি ছন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রচনা দ্বারা পরিপুষ্ট করতঃ সাহিত্য সরোবরে এই প্রবাদ পদ্মিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়াছি। এক একটী প্রবন্ধ ইহার দলপত্র, বিদ্রূপ কটাক্ষ ইহার কণ্টকাবৃত মৃণাল ও রজ, সারগর্ভ হিতোপদেশ ইহার মকরন্দ। এক্ষণে বিচক্ষণ গ্রাহক ভৃঙ্গগণ স্বকীয় করধারা মনোরঞ্জিত হইয়া প্রমোদ মধুপানে তৃপ্ত হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। প্রবাদ পদ্মিনীর বর্ণ ভাবুকগণের মর্ম্মগ্রাহী হইলেও এরূপ প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে দৃষ্টি মাত্রেই সাধারণ পাঠকগণের আনন্দ

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

অনুভূত হইবে, অথচ অতি রঞ্জিত নহে। একশত চারিটী প্রবাদে চারি খণ্ড পুস্তক গঠিত করিয়া আপাততঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি গ্রাহক-দিগের সহানুভূতি পাইলে [illegible] খণ্ড প্রকাশ করিবার আশা রহিল। [illegible]

[illegible]

৭. ঘ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

প্রবাদ পদ্মিনী

প্রথম খণ্ড।

প্রথম সংখ্যা।

([illegible])

[illegible] এ কথার উৎপত্তির কারণ। [illegible] লোকে [illegible] ঘর নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে [illegible] খেলা করে, সেই খেলায় [illegible] পুতুলী আদি তুলিয়া ঘর এবং পর যাহা ধূলায় [illegible] ফেলে, তদ্রূপ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কারখানায় ধুলা খেলা মাত্র। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা রূপ ধূলায় চতুর্দশ ভুবন নির্মাণ করতঃ পুত্তলিকা স্বরূপ সমুহ জীব

৭. ঙ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র

প্রবাদপদ্মিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীমধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত এবং
প্রণীত ও প্রকাশিত



রাখাল দাস অধিকারী মহাশয় কর্তৃক
সংশোধিত



চন্দননগর।

[illegible]

[illegible]

মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

[illegible]

[illegible]

৭. চ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' (১৩০৫) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র

শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী

সহায়া—

সূচীপত্র ।

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৭	[illegible]০	কুতইকো	কুতইক
৫৫		অপ্যায়িত	আপ্যায়িত
৬৭	১	পিঠেশয়	পিঠেসয়
৬৮	১		ঐ
ঐ	৭	ঐ	ঐ
৬৯	২০	দায়এয়েরকায়	দায়এবহইয়া

৭. ছ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত ‘প্রবাদ পদ্মিনী’ (১৩০৯) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র

প্রবাদপদ্মিনী।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীমধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত
প্রণীত ও প্রকাশিত।

৺রাখাল দাস অধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

শ্রাবণ।

মূল্য ৵০ আনা।

৭. জ. মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত ‘প্রবাদ পদ্মিনী’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সূচিপত্র

শ্রীশ্রী৺ভুবনেশ্বরী

সহায়।

সূচীপত্র।

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

[illegible] কর্ত্তে পেলেই :



সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Banerjee, P. N : A Polyglot Book of Proverbs, Kolkata, 1996

Barua, P.C. & others: Encyclopaedia of Indian Proverbs in 9 Vols, New Delhi, 1997

Ben-Amos, Dan : Folklore Context Essay, New Delhi, 1982

Berman, Louis A: Proverb Wit & Wisdom, USA, 1997

Bhargav Standard Illustrated Dictionary, Hindi-English, Varanasi, 2007

Bhargav Standard Illustrated English-Hindi, Varanasi, 2007

Carr, M. W : A Collection of Telegu Proverbs, Delhi, 1889

: Sanskrit Proverbs, Delhi, 1999

Castro, Fidel . Neoliberal Globalization and Global Economic Crisis, NBA., Kolkata, 1995

Chakraborty, Biplab : Style in Bengali Proverbs, Burdwan, W B., 2000

Champion, Selwyn Gurney : Racial Proverbs, London, 1966

Dalton, E. T : Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1982

Davidoff, Henry Collected : A World Treasury of Proverbs, London, 1953

Dundes, Alan : The Study of Folklore. N.J., 1965

: Folklore Matters, University of Tennessee Press. 1989

Fallon, S. M : A Dictionary of Hindustani Proverbs, New Delhi, 1998

Frazer, Sir James George : The Golden Bough, Abridged Edn. N.Y., 1963

Goldstein, Kenneth S : A guide for Field Workers in Folkore, Pennsylvania, 1964

Islam, Mazharul · The Socio-Cultural Study of Folklore, Dhaka, 2000

Jenson, Rev. Herman : A Classified Collection of Tamil Proverbs, New Delhi, 1993

Knowles, J. Hinton : A Dictionary of Kashmiri Proverbs and Saying, New Delhi, 1985

Leach, Maria ed : Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, N.Y., 1984

Manser, Martin H : Proverbs, New Delhi, 2005

Manwaring, A, Collected and Translated : Marathi Proverbs, New Delhi, 1993

Mieder, Wolfang ed: Proverbium, 18 : 2001, The University of Vermant. U.S.A

Mieder, Wolfang and Dundes, Alan : The Wisdom of Many, N.Y., 1981

Poczolay, Gyula : European, Far-Eastern and Some Asian Proverbs, Veszprem, 1994

Rao, Narasinga : A Hand Book of Kannada Proverbs, New Delhi, 1994

Sanyal, Charuchandra : The Rajbansis of North Bengal, Calcutta, 1965

Taylor, Archer . A Dictionary of American Proverbs and Proverbial Phrases, USA, 1958

Willkins, Charles translated : Fables and Proverbs, Calcutta, 1888

অধিকারী, পবিত্র সম্পাদিত : বঙ্গ সাহিত্যের রঙ্গ ব্যঙ্গ, কলকাতা, ২০০৩

আমেদ, আফসার : অলৌকিক দিনরাত, কলকাতা, ১৯৯১

আলম, ওহীদুল সম্পাদিত : চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৩

আসগর, সৈকত সম্পাদিত : মানিকগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৬

আহমদ, ওয়াকিল : বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন, ঢাকা, ১৯৯৪

: লোককলা প্রবন্ধাবলী, ঢাকা, ২০০১

আহমেদ, হুমায়ুন : আকাশ জোড়া মেঘ, ঢাকা, ১৯৮৮

ইজদানী, রওশন : মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১৩৬৪

ইমাম, ইবনে : বিশ্বের প্রবাদ, কলকাতা, ১৩৭২

ইসলাম, মযহারুল : ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ঢাকা ১৯৯৩

: আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর, ঢাকা, ১৯৯৯

ইসলাম, মযহারুল ও হাফিজ, মুহম্মদ আব্দুল সম্পাদিত . দৌলতকাজী সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, ঢাকা, ১৯৬৯

কয়াল, অক্ষয়কুমার সম্পাদিত কৃষ্ণমূর্তি, সুব্রমণিয়ম ও দে, শ্যামাপ্রসাদ : নির্বাচিত তামিল প্রবাদ, কলকাতা, ১৯৯৮

কহাবত কোষ, বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ্, পাটনা, ২০০১

খাতুন, মনোয়ারা : বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে সমাজ, ঢাকা, ২০০১

খালেক, মুহম্মদ আবদুল : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, ঢাকা, ১৯৮৫

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, ২০০৩

গুপ্ত, ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পাদিত : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক, কলকাতা, ১৯৯৭

গুহ, বিমল : আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান, ঢাকা, ২০০১

গোস্বামী, জয় . কবিতা সংগ্রহ ২ খণ্ড, কলকাতা, ২০০৩

ঘোষ, শঙ্খ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ২০০৪

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ : দেখা হবে, কলকাতা, ২০০২

: কবিতার বদলে কবিতা, কলকাতা, ১৪০৮

চক্রবর্তী, বিপ্লব : লোকাভরণ, আধুনিক কবিতার শৈলী, কলকাতা, ২০০১
: প্রবাদ শিল্পী তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য, কলকাতা, ২০০৫
চক্রবর্তী, শিবরাম : রচনা সমগ্র, কিশোর, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৬
চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি সম্পাদিত : রামপ্রসাদী সঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৬৫
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭২
চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত : কৃত্তিবাস, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কলকাতা, ১৩৫৩
চট্টোপাধ্যায়, শক্তি : পদ্য সমগ্র ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৬
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র : রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৯৫
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব : বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল, কলকাতা, ২০০০
: হনুমান টুপি, কলকাতা, ২০০৫
চৌধুরী, তিতাশ : কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৩
চৌধুরী, দুলাল : চাকমা প্রবাদ, কলকাতা, ১৯৮০
জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে, সুকুমার সেন. বাঙলায় নারীর ভাষা, কলকাতা, ১৩৭৫
জসীমউদ্দীন : নক্সী কাঁথার মাঠ, ঢাকা, ১৯৮৬
: সোজন বাদিয়ার ঘাট, ঢাকা, ১৯৮৬
: বাঙ্গালীর হাসির গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৯
টেনা, নুর মহম্মদ সংগৃহীত ও সম্পাদিত : খুলনার লোকসাহিত্য, খুলনা, ১৯৭২
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬১
: লোকসাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৮
দত্ত, কল্যাণী: প্রবাদমালা, কলকাতা, ১৯৯৯
দত্ত, বিজিতকুমার ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত : মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৭
দাশ, আশা : জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোকসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৫
দাস, অনাথনাথ ও রায়, বিশ্বনাথ সম্পাদিত ও সংকলিত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলেভুলানো ছড়া, কলকাতা, ১৪০২
দাস, আশুতোষ সম্পাদিত : দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৭
দাসগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র সম্পাদিত : নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, কলকাতা, ১৯৪৭
দে, অমলকুমার : সংস্কৃত প্রবাদ-প্রবচন, কলকাতা, ২০০০
দে, রঞ্জিত : ত্রিপুরার লোকসাহিত্যে জনজীবন, কলকাতা, ১৯৯৫
দে, সুশীলকুমার : বাংলা প্রবাদ, কলকাতা, ১৪০১
দেবসেন, নবনীতা : ছোটদের গল্পসমগ্র, প্রথম সম্ভার, ১৪১১
দেবী, গিরিবালা : রায়বাড়ী, কলকাতা, ২০০৩
নওয়াজ, আলি: খনার বচন কৃষি ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৩৯৬
নন্দী, মতি : বিজলীবালার মুক্তি ও আর একটি কাহিনী, কলকাতা, ২০০২

নস্কর, ধূর্জটি : সুন্দরবনের লোক-সাহিত্য ও বিচিত্র রচনা, কলকাতা, ১৯৯৯
পাঠান, মোহাম্মদ হানীফ: বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৭৬; ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, ঢাকা, ১৯৮২ ঐ ঐ দ্বিতীয় পর্ব, ঢাকা, ১৯৮৫
পাণ্ডে, তুষারকান্তি সম্পাদিত : চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবিরের দোঁহা : মীরার পদাবলী, কলকাতা, ২০০২
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৩৭৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ : আরণ্যক, কলকাতা, ১৩৫৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত . টেকচাঁদ ঠাকুর : আলালের ঘরের দুলাল, কলকাতা, ১৪০৫
: কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নকশা, কলকাতা, ১৪০৪
. বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ঐ, কলকাতা, ১৩৭২
: ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৪০৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক : রচনাবলী, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৮৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পাদিত : কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ : লৌকিক ঐতিহ্য, লোকায়ত মানস ও আধুনিক বাংলা কাব্য, কলকাতা, ১৩৯৮
: বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান, কলকাতা, ১৯৭৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮
বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত : রামাই পণ্ডিত, শূন্যপুরাণ, কলকাতা, ১৩১৪
বসু, যোগীন্দ্রনাথ সম্পাদিত : কাশীরাম দাসের মহাভারত, কলকাতা, ১৩১৫
বসু দত্ত, শর্মিলা : বাংলায় মেয়েদের ভাষা, কলকাতা, ২০০০
বাংলা একাডেমী সংকলন . বাংলাদেশের ছোটগল্প, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯
বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ : মেন কথা আর ভেনতা কাথা, ১৯৯৩ (Collection of Santal Proverbs & Phrases), কলকাতা, ১৯৮১
: পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, কলকাতা, ১৯৯৩
বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় : প্রবোধ চন্দ্রিকা, কলকাতা, ১৭৮৪
বিশ্বাস, বর্ণজিৎ : লোক ঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ, কলকাতা, ২০০১
ভট্টাচার্য, আশুতোষ . বাংলার লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৩, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৭২
ভট্টাচার্য, আশুতোষ ও সেন, দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র শিবায়ন, কলকাতা, ১৯৬৩
ভট্টাচার্য, জয়শ্রী . বাংলার প্রবাদে নারীমন, কলকাতা, ১৯৯১

ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল : বাঙলা বাগ্‌ধারা ও তার ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন. কলকাতা, ১৯৯৪
ভট্টাচার্য, পি. এস. প্রকাশিত : বৃহৎ খনার বচন, কলকাতা, ১৩১৫
ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গল, কলকাতা, ১৯৪৯
ভট্টাচার্য, সুকান্ত : সুকান্ত সমগ্র, কলকাতা, ১৪১২
ভট্টাচার্য, সুশীল : উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৭০
মজুমদার, মানস : লোকসাহিত্য পাঠ, কলকাতা, ১৯৯১
মণ্ডল, পঞ্চানন সম্পাদিত : গোর্খবিজয়, কলকাতা, ১৩৫৬
মহাপাত্র, পীযূষকান্তি সম্পাদিত · ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬২
মাজী, সুকুমার : উনিশ শতকে বাংলা লোকসাহিত্য চর্চা, কলকাতা, ১৯৯৭
মাহাত. বঙ্কিমচন্দ্র : ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, কলকাতা, ২০০০
মাহাত, বিনয় : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৪
মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত : মালাধর বসু : শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কলকাতা, ১৯৪৪
মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, সেন, সুকুমার, চৌধুরী, বিশ্বপতি ও চক্রবর্তী, শ্যামাপদ সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২
মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদিত : খনার বচন, কলকাতা, ১৩৫১
মিত্র, সুবলচন্দ্র সংকলিত : বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন, কলকাতা, ১৯৯৩
মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন : রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৮
মুহম্মদ, কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত : লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ, ঢাকা, ১৯৬৮
মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ সম্পাদিত . আলাওল : পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৩৭৬
মুখোপাধ্যায়, বেলা : বঙ্কিম সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান, ১৯৮১
মুখোপাধ্যায়. হরিমোহন সম্পাদিত : গোপাল উড়ের টপ্পা, ১৩৬৭
মোর্তাজা, দেওয়ান গোলাম সম্পাদিত : ছিলটে প্রচলিত পই প্রবাদ ডাক-ডিঠান, ঢাকা, ১৯৯৮
রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর : বচন ও প্রবচন, ঢাকা, ১৯৮৫
রায়, অন্নদাশঙ্কর : ছড়া সমগ্র, কলকাতা, ১৯৮৫
রায়, ছন্দা ও নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত : গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য. লোকসংবাদিকতা ও বাংলার লোকসাহিত্য, মানস মজুমদার, ২০০৪
রায়, তারাপদ · রম্যরচনা ৩৬৫, কলকাতা, ২০০৫
রায়, দেবেশ : আঙিনা, কলকাতা, ২০০০
রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত : বড়ু চণ্ডীদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৫
রায়, সত্যজিৎ সম্পাদিত : সেরা সন্দেশ, কলকাতা, ১৩৯১
রায়চৌধুরী, তপন : বাঙালনামা, কলকাতা, ২০০৭
রাহমান, শামসুর : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঢাকা, ২০০৫
লঙ্, জেমস্ : প্রবাদমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৫

শংকর : সাতদশে, কলকাতা, ২০০৩
শর্মা, শশী : অসমর লোকসাহিত্য, অসম, ১৯৯৩
শরীফ, আহমদ সম্পাদিত : দৌলত উজীর বাহরাম খান, লায়লী মজনু, ঢাকা, ১৩৫৭
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ সম্পাদিত : হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, কলকাতা, ১৩৮৮
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ও সেন, দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত : মানিকরাম গাঙ্গুলি : শ্রীধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ১৩১২
শ্রীপান্থ : ঠগী, কলকাতা, ২০০৪
সরকার, পবিত্র : লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৯৭
: লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৯৬
সরকার দীনেন্দ্রকুমার : প্রবাদের উৎস সন্ধানে, কলকাতা ১৯৮৬
সাঁতরা, তারাপদ : হাওড়া জেলার লোক-উৎসব-ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ, কলকাতা ২০০৫
সাত্তার, আবদুস : অরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৭৫
সিদ্দিকী, আশরাফ : লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৫
সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : গল্পসমগ্র, ১ম খণ্ড, ১৩৯৩
সেন, দীননাথ সম্পাদিত : চট্টগ্রামের প্রবচন/বাগধারা, ঢাকা, ১৯৮৪
সেন, দীনেশচন্দ্র, ভট্টাচার্য, আশুতোষ সম্পাদিত : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত শিবায়ন, কলকাতা, ১৩৬৩
সেন, সত্যরঞ্জন : প্রবাদ রত্নাকর, কলকাতা, ১৯৫০
সেন, সুকুমার সম্পাদিত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ: চৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা, ১৯৬৩
সেনগুপ্ত, নগেন্দ্রমোহন সম্পাদিত : বিজয়গুপ্ত: মনসামঙ্গল, কলকাতা, ১৩২২
সেনগুপ্ত, পল্লব : লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯৫
হাফিজ, আবদুল ও চৌধুরী, হারুণ-অর-রশীদ, মোঃ : রবীন্দ্র কাব্যে প্রবচন, ঢাকা, ১৯৯৭
হালদার, যোগীলাল সম্পাদিত : রামেশ্বর, শিবসঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন, কলকাতা, ১৯৫৭
হালিম, সরদার মোহাম্মদ আবদুল . চলনবিলের লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮১

বাংলা পত্র-পত্রিকা

গণকণ্ঠ : লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, মুর্শিদাবাদ, ১৯৮৫
জোয়ার সাহিত্য পত্রিকা : ছড়া বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, মালদহ, ২০০৪
ধান শালিকের দেশ : ২৫বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৭
আকাদেমি পত্রিকা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯০
বাংলা একাডেমী পত্রিকা . বাংলা একাডেমী, ঢাকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮
বামাবোধিনী পত্রিকা . ৩৬শ বর্ষ (১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা), কলকাতা, ১৩১৯
মধুপর্ণী · বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৩৯৬-৯৭

মধুপর্ণী : বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, ১৯৯৬
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা . দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা
মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত : লৌকিক বাংলা, [আলি নওয়াজ, বঙ্কিমকুমার রায়, বি, রামা রাজু: খনা, ডাক, ঘাঘের বচন ও তেলুগু কৃষি প্রবাদ]. ঢাকা, ১৯৭৮
মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা . পক্ষীসংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, জুলাই, ঢাকা, ১৯৮৮-মার্চ ১৯৮৯
লোকসংস্কৃতি গবেষণা : শ্রাবণ-আশ্বিন, কলকাতা, ১৪০২
লৌকিক বাংলা : নব পর্যায় ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭

নির্ঘণ্ট
